প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (Honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়ণের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূরসঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হ'তে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার

উপাচার্য

১২ তম পুনর্মুদ্রণ ঃ জুন, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education
Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ প্রাণীবিদ্যা | সাম্মানিক স্তর

পাঠক্রম ঃ পর্যায়

EZO 03 : 1 & 2

		রচনা	সম্পাদনা
একক	**1**	ড. অরূপ কুমার সিনহা	ড. নির্মাল্য ব্যানার্জী
একক	**2**	ড. অরূপ কুমার সিনহা	ড. নির্মাল্য ব্যানার্জী
একক	**3**	ড. মনীষ মুখার্জী	ড. অরূপ কুমার সিনহা
একক	**4**	ড. মনীষ মুখার্জী	ড. অরূপ কুমার সিনহা
একক	**5**	ড. অরূপ কুমার সিনহা	ড. নির্মাল্য ব্যানার্জী
একক	**6**	ড. মনীষ মুখার্জী	ড. অরূপ কুমার সিনহা
একক	**7**	ড. মনীষ মুখার্জী	ড. অরূপ কুমার সিনহা
একক	**8**	ড. অরূপ কুমার সিনহা	ড. নির্মাল্য ব্যানার্জী
একক	**9**	ড. নারায়ণ ঘোড়াই	ড. নির্মাল্য ব্যানার্জী
একক	**10**	ড. পুলক লাহিড়ী	ড. নির্মাল্য ব্যানার্জী
একক	**11**	ড. নারায়ণ ঘোড়াই	ড. বিশ্বপতি দাশগুপ্ত
একক	**12**	ড. পুলক লাহিড়ী	ড. নির্মাল্য ব্যানার্জী
একক	**13**	ড. নারায়ণ ঘোড়াই	ড. নির্মাল্য ব্যানার্জী
একক	**14**	ড. সুজিত কুমার দাশগুপ্ত	ড. বিশ্বপতি দাশগুপ্ত

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোন অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়

নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EZO 03

পরিস্ফুরণ জীববিদ্যা
এবং আচরণতত্ত্ব

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়
1
পরিস্ফুরণ জীববিদ্যা

একক 1	❑	গ্যামেটোজেনেসিস	9–24
একক 2	❑	নিষেক	25–37
একক 3	❑	ক্লিভেজ বা বিভাজন	38–52
একক 4	❑	মরফোজেনেটিক চলন ও মুরগির গ্যাস্ট্রুলেশন	53–71
একক 5	❑	অরগানাইজার	72–87
একক 6	❑	মুরগির ভ্রূণঝিল্লি	88–95
একক 7	❑	অমরা	96–109
একক 8	❑	মুরগির মস্তিষ্কের পরিস্ফুরণ	110–123

পর্যায়
2
আচরণতত্ত্ব

একক 9	❑	প্রাণী আচরণতত্ত্ব ঃ মুখবন্ধ	125–132
একক 10	❑	স্বতঃপ্রবৃত্ত আচরণ ও শিক্ষিত আচরণ	133–147
একক 11	❑	মাছের খাদ্যগ্রহণ স্বভাব	148–157
একক 12	❑	পরিযান (Migration) ঃ মাছ ও পাখি	158–173
একক 13	❑	মৎস্য ও উভচর প্রাণীদের জনিতৃ যত্ন	174–185
একক 14	❑	পতঙ্গের সামাজিক আচার-আচরণ	186–220

একক 1 □ গ্যামেটোজেনেসিস (Gametogenesis)

গঠন

1.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

1.2 জনন কোষের উৎপত্তি

1.3 জনন কোষের পরিবর্তন

1.4 স্পার্মাটোজেনেসিস্

1.4.1 স্পার্মাটিডের উৎপত্তি

1.4.2 স্পার্মাটিলিওসিস

1.4.3 শুক্রাণুর গঠন

1.4.4 শুক্রাণুর বৈশিষ্ট

1.5 উজেনেসিস

1.5.1 ডিম্বাণুর গঠন

1.5.2 ডিম্বাণুর প্রকারভেদ

1.6 স্পার্মাটোজেনেসিস ও উজেনেসিস—তুলনামূলক আলোচনা

1.7 সারাংশ

1.8 প্রশ্নাবলী

1.9 উত্তরমালা

1.1 প্রস্তাবনা

যে প্রক্রিয়ায় জনন অঙ্গ থেকে জনন কোষের উৎপত্তি হয় তাকে *গ্যামেটোজেনেসিস* বলে। প্রাণীদের ক্ষেত্রে যৌনপ্রজননে দু'টি বিশেষ ধরণের অসম জনন কোষের প্রয়োজন হয়। একটি স্ত্রী জনন অঙ্গ বা ডিম্বাশয় (Ovary) থেকে সৃষ্টি হয় এবং অপরটির উৎপত্তি হয় পুরুষ জনন অঙ্গ বা শুক্রাশয়ে (Testis)। ডিম্বাশয় থেকে সৃষ্ট জনন কোষকে ডিম্বাণু (Egg) বা ওভাম (Ovum) এবং শুক্রাশয় হইতে সৃষ্ট জনন কোষকে শুক্রাণু (Spermatozoon) বলে। শুক্রাণু উৎপাদন প্রক্রিয়াকে *স্পার্মাটোজেনেসিস* এবং ডিম্বাণু উৎপাদনকে *উজেনেসিস্* বলে।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- পরিস্ফূরণ জীববিদ্যা সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন।
- গ্যামোটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় কিভাবে স্ত্রী জননাঙ্গ থেকে ডিম্বাণু ও পুংজননাঙ্গ থেকে শুক্রাণু উৎপন্ন হয় তা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।
- ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর সৃষ্টির সময় কোষাঙ্গাণুর পরিবর্তন এবং গঠনগত ও ক্রিয়াগত তাৎপর্য বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

1.2 জনন কোষের উৎপত্তি

জনন কোষের উৎপত্তি উচ্চতর প্রাণীদের পরিস্ফুরণের প্রারম্ভিক দশা। জনন কোষের প্রকৃত উৎপত্তিস্থল সম্বন্ধে বিভিন্ন ভ্রূণতত্ত্ববিদ্ ভিন্ন ধরণের মতবাদ পোষণ করায় সমস্যাটি জটিল হয়েছে। পরিস্ফুরণের প্রারম্ভিক অবস্থায় জনন কোষের পৃথকীকরণ সংঘটিত হয় এবং অন্যত্র সৃষ্ট জনন কোষ প্রকৃত উৎপত্তিস্থল থেকে স্থানচ্যুত হয়ে জনন অঙ্গের অংশরূপে স্থায়ীভাবে অবস্থান করে। কিভাবে জনন কোষের পরিযান ক্রিয়া সম্পন্ন হয় সে সম্বন্ধে নানান মতবাদ বর্তমান। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রাথমিক জনন কোষ জনন অঙ্গে পৌঁছানোর পর সেখানে অবস্থান করে এবং সক্রিয় ডিম্বাণু বা শুক্রাণুতে পরিবর্তিত হয়।

1.3 জনন কোষের পরিবর্তন

জনন অঙ্গে অবস্থিত প্রাথমিক জনন কোষগুলিকে *প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষ* (Primordial germ cell) বলে। ঐ কোষ নানা পরিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যমে পুর্নগঠিত কার্যকরী জনন-কোষে পরিণত হয়। পরিবর্তন প্রক্রিয়াটি খুবই জটিল এবং তিনটি সুস্পষ্ট দশায় বিভক্ত, যথা —

ক) *সংখ্যাবৃদ্ধি দশা* (Phase of Multiplication)

খ) *বৃদ্ধি দশা* (Phase of Growth)

গ) *পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশা* (Phase of Maturation)

উপরে উল্লিখিত তিনটি দশায় মৌলিক সাদৃশ্য থাকলেও শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ কয়েকটি বৈসাদৃশ্য থাকে। নীচে দশা তিনটির বিস্তারিত আলোচনা করা হল ঃ

1.4 স্পার্মাটোজেনেসিস (Spermatogenesis)

শুক্রাশয়ে অবস্থিত প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষ থেকে যে প্রক্রিয়ায় শুক্রাণু উৎপন্ন হয় তাকে স্পার্মাটোজেনেসিস বলে। এই প্রক্রিয়ায় শুক্রাণুর উৎপত্তিকালে কোষের ক্রোমোসোম সংখ্যার এবং বিভিন্ন কোষ অঙ্গাণুর বিশেষ পরিবর্তন হয়। বর্ণনার সুবিধার জন্য স্পার্মাটোজেনেসিসকে দু'টি সুস্পষ্ট পর্যায়ে বিভক্ত করা হয়, যেমন—

ক) *স্পার্মাটিডের উৎপত্তি* (Formation of Spermatid)

খ) *স্পার্মাটিলিওসিস্* (Spermateleosis) বা *স্পার্মিওজেনেসিস* (Spermiogenesis)

1.4.1 স্পার্মাটিডের উৎপত্তি

স্পার্মাটিডের উৎপত্তিকালে তিনটি দশা পরিলক্ষিত হয়, যথা - *সংখ্যা বৃদ্ধি দশা, বৃদ্ধি দশা* এবং *পূর্ণতা প্রাপ্তি দশা।*

সংখ্যা বৃদ্ধি দশা — শুক্রাশয়ের জার্মিনাল এপিথিলিয়ামের প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষগুলি (Primordial germ cell) দু'বার মাইটোটিক পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়ে *স্পার্মাটোগোনিয়া* (Spermatogonia) উৎপন্ন করে। প্রতিটি প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষ সমবিভাজনের মাধ্যমে দুইটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। সৃষ্ট কোষ দুটিকে *প্রাইমারী স্পার্মাটোগোনিয়া* (Primary Spermatogonia) বলে। প্রতিটি প্রাইমারী স্পার্মাটোগোনিয়া কোষ পুনরায় সমবিভাজিত হয় এবং দুটি *সেকেণ্ডারী স্পার্মাটোগোনিয়া* (Secondary Spermatogonia) সৃষ্টি করে। সুতরাং সংখ্যাবৃদ্ধি দশায় প্রতিটি প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষ পরপর দু'বার মাইটোটিক কোষ বিভাজনের সাহায্যে চারটি সেকেণ্ডারী স্পার্মাটোগোণিয়া সৃষ্টি করে। প্রতিটি প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষের নিউক্লিয়াসে ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যক ক্রোমোসোম (Chromosome) থাকে এবং সৃষ্ট প্রতিটি সেকেণ্ডারী স্পার্মাটোজোনিয়ায় সমসংখ্যক (2n) ক্রোমোসোম বর্তমান (চিত্র নং 1.1)।

বৃদ্ধিদশা — প্রতিটি স্পার্মাটোগোনিয়া কোষ এই দশায় পুষ্টি গ্রহণ করে আয়তনে বড় হয়। মুখ্যত কোষের প্রোটোপ্লাজম সংশ্লেষের দ্বারা কোষ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। এই অবস্থায় কোষকে *প্রাইমারী স্পার্মাটোসাইট* (Primary Spermatocyte) বলে এবং এর নিউক্লিয়াসে ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে।

পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশা — প্রতিটি *প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট* কোষ মিয়োসিস কোষ বিভাজনের সাহায্যে চারটি অপত্য কোষ সৃষ্টি করে। প্রথম মিয়োসিস বিভাজন ফলে প্রতিটি প্রাইমারী স্পার্মাটোসাইট থেকে দু'টি *সেকেণ্ডারী স্পার্মাটোসাইট* (Secondary Spermatocyte) সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট সেকেণ্ডারী স্পার্মাটোসাইটের নিউক্লিয়াসে হ্যাপ্লয়েড (n) সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। প্রতিটি সেকেণ্ডারী স্পার্মাটোসাইট দ্বিতীয় মিয়োটিক বিভাজনের দ্বারা দুইটি সদৃশ হ্যাপ্লয়েড *স্পার্মাটিড* (Spermotid) সৃষ্টি করে। স্পার্মাটিড উৎপত্তির পর পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশা সমাপ্ত হয়।

1.4.2 স্পার্মাটিলিওসিস

পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশায় উৎপন্ন স্পার্মাটিড সক্রিয় পুংজননকোষরূপে কাজ করতে অক্ষম। জটিল ক্রমিক পরিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যমে স্পার্মাটিড সক্রিয় পূর্ণগঠিত শুক্রাণুতে পরিণত হয়। প্রক্রিয়াটিকে স্পার্মাটিলিওসিস বলে।

স্পার্মাটিডের গঠন একটি আদর্শ প্রাণিকোষের মত। স্পার্মাটিডের সাইটোপ্লাজমে গলজি বডি (Golgi body, মাইটোকনড্রিয়া (Mitochondria), সেন্ট্রোসোম (Centrosome) প্রভৃতি থাকে। নিউক্লিয়াসটি আদর্শ কোষের মত, কিন্তু ক্রোমোসোম সংখ্যা হ্যাপ্লয়েড। নিম্নবর্ণিত পরিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যমে স্পার্মাটিড সম্পূর্ণ ভিন্ন আকৃতি বিশিষ্ট পূর্ণগঠিত শুক্রাণুতে পরিণত হয় (চিত্র নং 1.2)।

স্পার্মাটিলিওসিস প্রক্রিয়ার আরম্ভে সেন্ট্রোসোমের সেন্ট্রিওলটি (Centriole) বিভাজিত হয়ে দুটি সেন্ট্রিওলে পরিণত হয়। নিউক্লিয়াসের নিকটবর্তী সেন্ট্রিওলটিকে *প্রক্সিমাল সেন্ট্রিওল* (Proximal Centriole) এবং অপরটিকে *ডিস্টাল সেন্ট্রিওল* (Distal Centriole) বলে। প্রাথমিক অবস্থায় গলজি বডি জালকাকার অঙ্গাণুরূপে স্পার্মাটিডের নিউক্লিয়াসের কাছে সাইটোপ্লাজমে অবস্থান করে। প্রথমত গলজি বডির মধ্যে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার থলির উদ্ভব হয় এবং প্রতিটি থলির অভ্যন্তরে একটি ক্ষুদ্রাকার দানার সৃষ্টি হয়। ক্রমে ক্ষুদ্রাকার থলিগুলি একত্রিত হয়ে একটি বৃহৎ থলিতে পরিণত হয়। থলিটিকে *অ্যাক্রোসোমাল ভেসিকল* (Acrosomal Vesicle) বলে। ভেসিকল্ সৃষ্টির পর দানাগুলি মিলিত হয়ে একটি বড় আকারের *অ্যাক্রোসোমাল গ্র্যানিউল* (Acrosomal granule) গঠন করে (চিত্র নং 1.3)।

অ্যাক্রোসোমাল ভেসিকলটি নিউক্লিয়াসের অগ্রভাগে টুপির মত প্রসারিত হয় এবং নিউক্লিয়াসটি কোষের একপ্রান্তে স্থানান্তরিত হয় (চিত্র নং 1.2)। এই সময় সেন্ট্রিওল দুটি কোষের প্লাজমালেমার কাছাকাছি আসে এবং ডিস্টাল সেন্ট্রিওলটি প্লাজমালেমার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে। সংযোগস্থল থেকে উৎপন্ন একটি সূক্ষ্ম সূত্রের ন্যায় গঠন ক্ষুদ্র ফ্ল্যাজিলার আকারে কোষের বাইরে প্রসারিত হয় এবং শুক্রাণুর লেজের *অ্যাকসিয়াল ফিলামেন্ট* (Axial filament) গঠন করে। পরে সেন্ট্রিওল দুটি নিউক্লিয়াসের পশ্চাৎদিকের খাঁজে নিজেকে যুক্ত করে এবং ডিস্টাল সেন্ট্রিওলটি প্লাজমালেমাসমেত নিউক্লিয়াস আবরণী পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ফলে অ্যাকসিয়াল ফিলামেন্টটি কোষের মধ্যে অবস্থিত মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এটি কোষের বাইরে থাকে। অ্যাকসিয়াল ফিলামেন্ট দু'স্তর প্লাজমালেমা দ্বারা পরিবৃত থাকে। প্রকসিমাল সেন্ট্রিওলের অবস্থান অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু ডিস্টাল সেন্ট্রিওলটি প্লাজমালেমা ভাঁজসমেত কোষের কিনারায় আবার ফিরে আসে। সেন্ট্রিওলদ্বয়ের মধ্যবর্তী অংশটি ক্রমে শুক্রাণুর মধ্যমাংশে পরিণত হয়। মধ্যমাংশে অবস্থিত অ্যাকসিয়াল ফিলামেন্টের চারপাশে মাইটোকন্ড্রিয়াগুলি সন্নিবেশিত হয়ে সর্পিলাকার কুণ্ডলীর আকার ধারণ করে। এইভাবে মাইটোকন্ড্রিয়াল স্পাইরাল (Mitochondrial Spiral) গঠিত হয়। ক্রমবর্ধনের সময় শুক্রাণুটি প্রলম্বিত হয়। এর সাইটোপ্লাজম প্রায় নিঃশেষিত হয় এবং অবশিষ্ট অংশ পরিত্যক্ত হয়। অ্যাকেসিয়াল ফিলামেন্টটি একটি দীর্ঘ ফ্লাজিলা গঠন করে। কোষের বাইরে প্রসারিত হয়। প্রকসিমাল সেন্ট্রিওল থেকে সৃষ্ট সূক্ষ্ম তন্তু অ্যাকসিয়াল ফিলামেন্টটিকে পরিবৃত করে এবং শুক্রাণুর লেজ গঠনে অংশ গ্রহণ করে। এইভাবে নানা পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিণত শুক্রাণুর বিভিন্ন অংশ গঠিত হয় (চিত্র নং 1.3)।

1.4.3 শুক্রাণুর গঠন

শুক্রাণুর আকৃতি বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিভিন্নরূপ হয়। চিত্র নং 1.4 - এ বিভিন্ন প্রাণীদের আকৃতি দেখানো হয়েছে। একটি আদর্শ মেরুদণ্ডী প্রাণীর শুক্রাণুর দেহ তিনটি অংশে ভাগ করা যায়, যথা : (a) মস্তক Head), (b) মধ্যমাংশ (Middle piece) এবং (c) লেজ (Tail)। শুক্রাণুর মস্তক আকৃতি ভিন্ন ভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে ভিন্ন রূপের হয় -

1. গোলাকার — অস্থিময় মাছ,
2. বল্লম-সদৃশ — উভচর প্রাণী
3. সর্পিলাকার — কয়েকটি পাখি
4. বঁড়শির আকার — ইঁদুর এবং
5. চামচের আকার — মানুষ

বৈসাদৃশ্য থাকলেও মেরুদণ্ডীদের শুক্রাণুর মধ্যে গঠনগত সমতা বর্তমান। খরগোসের শুক্রাণুর গঠন আমাদের সম্পূর্ণভাবে জানা আছে। সেইজন্য খরগোসের শুক্রাণুর গঠনকে আদর্শ গঠন ধরে এখানে বর্ণনা করা হল (চিত্র নং-1.5)। 8 -10μm মস্তক সমেত একটি পূর্ণগঠিত শুক্রাণু দৈর্ঘ্য প্রায় (60-70μm (μm = মাইক্রন মিলিমিটার, $1\mu m = {}^{1}/_{1000}$ mm)।

মস্তক ঃ প্রধানতঃ নিউক্লিয়াস ও অ্যাক্রোসোম শুক্রাণুর মস্তক গঠন করে। মস্তকের অধিকাংশ অংশ নিউক্লিয়াস দ্বারা অধিকৃত। নিউক্লিয়াসটি লম্বাটে এবং ঘন ক্রোমাটিন দ্বারা পূর্ণ থাকে। নিউক্লিয়াসের অগ্রভাগে একটি দুই-প্রাচীর বিশিষ্ট থলি অ্যাক্রোসোম টুপির ন্যায় অবস্থান করে। অ্যাক্রোসোম গহ্বরে অ্যাক্রোসোম দানা থাকে। অ্যাক্রোসোম নিউক্লিয়াসের সাথে যুক্ত থাকে এবং এর অগ্রভাগ উত্তল এবং পশ্চাৎভাগটি সমতল। অ্যাক্রোসোম নিষেকের সময় সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে (চিত্র নং 1.5)

মধ্যমাংশ ঃ অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্ট পরিবৃত মাইটোকন্ড্রিয়াল স্পাইরাল ও প্রক্সিমাল সেন্ট্রিওল থেকে উত্থিত নটি সূক্ষ্ম তন্তু দিয়ে মধ্যমাংশটি গঠিত। মধ্যমাংশে অবস্থিত মাইটোকন্ড্রিয়া থেকে প্রাপ্ত শক্তির সাহায্যে শুক্রাণুর গমন ক্রিয়া সম্পন্ন হয়।

লেজ ঃ শুক্রাণুর এই বিশেষ অংশটির সঞ্চালনের ফলে গমন ক্রিয়া সম্ভব হয়। এই অংশটি সূক্ষ্ম সূত্রের চক্র দ্বারা পরিবৃত থাকে। খরগোসের শুক্রাণুর লেজের সূত্রগোষ্ঠীকে অ্যাকসিয়াল ফিলামেন্ট বলে। অ্যাকসিয়াল ফিলামেন্ট প্রকসিমাল সেন্ট্রিওল থেকে লেজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত থাকে। সূত্রগুলির সজ্জারীতি 2+9+9=20। অপেক্ষাকৃত স্থূল নটি সূত্র লেজের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত থাকে না এবং লেজের বিভিন্ন দূরত্বে এদের পরিসমাপ্তি ঘটে। সূত্রগুলি সংকোচনশীল।

1.4.4 শুক্রাণুর বৈশিষ্ট্য

আদর্শ প্রাণিকোষের তুলনায় পূর্ণগঠিত শুক্রাণুর আকৃতিগত গঠন ভিন্নরূপ। শুক্রাণুর দেহের অধিকাংশ অংশ নিউক্লিয়াস দ্বারা অধিকৃত। এর সাইটোপ্লাজম পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত হয়ে গমন ক্রিয়ায় নিযুক্ত। শুক্রাণুতে কোন সঞ্চিত খাদ্য এবং অতিরিক্ত আবরণ থাকে না। ডিম্বাণুকে উত্তেজিত ও কর্মক্ষম করাই শুক্রাণুর প্রধান কাজ। আয়তনে ক্ষুদ্রতর হলেও ডিম্বাণু অপেক্ষা শুক্রাণুর সংখ্যাধিক্য তাৎপর্যপূর্ণ।

অনুশীলনী - 1

(A) উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

1. বহুকোষী জীবের ______________ দশায় ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণ ______________ হয়।
2. গ্যামেটোজেনেসিস প্রক্রিয়ায় তিনটি দশার নাম, যথাক্রমে ______________ দশা, ______________ দশা ও ______________ দশা।
3. প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট কোষের নিউক্লিয়াসে ______________ সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে, কিন্তু সেকেণ্ডারী স্পার্মাটোসাইট কোষের নিউক্লিয়াসে ______________ সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে।
4. শুক্রাণুর মধ্যমাংশে ______________ ফিলামেন্টের চারিপাশে ______________ সন্নিবেশিত হয়ে ______________ স্পাইরাল গঠন করে।

(B) **সঠিক উত্তরটিতে (√) চিহ্ন এবং ভুলটিতে (X) চিহ্ন দিন -**

1. স্পার্মাটিডের নিউক্লিয়াসে ডিপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে।
2. স্পার্মাটিডের গলজি বডি থেকে অ্যাক্রোসোম উৎপন্ন হয়।
3. স্পার্মাটিড সক্রিয় পূর্ণগঠিত পুংজনন কোষরূপে কাজ করে।
4. সকল প্রাণীদের শুক্রাণুর আকৃতি ও গঠন এক প্রকার।

1.5 উজেনেসিস্ (Oogenesis)

যে প্রক্রিয়ায় ডিম্বাশয়ে (Ovary) অবস্থিত প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষ থেকে ডিম্বাণু (Ovum) উৎপন্ন হয় তাকে *উজেনেসিস* বলে। স্পার্মাটোজেনেসিসের মত উজেনেসিস প্রক্রিয়ায় তিনটি দশা দেখা যায়। দশা তিনটি ঃ সংখ্যাবৃদ্ধি দশা, বৃদ্ধি দশা ও পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশা।

সংখ্যাবৃদ্ধি দশা --- প্রতিটি প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষের দু'বার মাইটোটিক বিভাজনের ফলে চারটি অপত্য কোষ উৎপন্ন হয়। প্রথম বিভাজনে সৃষ্ট দুটি কোষকে *প্রাইমারি উগোনিয়া* (Primary Oogonia) বলে এবং দ্বিতীয় বিভাজনে প্রতিটি *প্রাইমারি উগোনিয়াম* (Oogonium) থেকে যে দু'টি কোষ উৎপন্ন হয় তাদের *সেকেণ্ডারী উগোনিয়া* (Secondary Oogonia) বলে। প্রতিটি জার্ম কোষের নিউক্লিয়াসে ডিপ্লয়েড (Diploid) সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে।

বৃদ্ধি দশা — প্রতিটি সেকেণ্ডারী উগোনিয়াম পুষ্টি গ্রহণ করে আয়তনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। বৃদ্ধি দশাটি প্রলম্বিত এবং নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। ওই কোষটিকে *প্রাইমারি উসাইট* (Primary Oocyte) বলে। নিউক্লিয়াসটি ভীষণভাবে স্ফীত হয়ে থলির আকার ধারণ করে, তখন একে *জার্মিনাল ভেসিকল* (Germinal vesicle) বলে। ভেসিকলটি তরল *নিউক্লিয়ার স্যাপ* (Nuclear Sap) দিয়ে পূর্ণ থাকে। এই সময় নিউক্লিয়াসের মধ্যে অবস্থিত ক্রোমোসোমগুলিতে সুস্পষ্ট পরিবর্তন এবং সাইটোপ্লাজমে ডি. এন. এ. নিয়ন্ত্রিত প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় (চিত্র নং 1.6)।

পূর্ণতা প্রাপ্তি দশা — প্রাইমারী উসাইট মিয়োসিস কোষ বিভাজন পদ্ধতিতে বিভাজিত হয়। প্রথম বিভাজনে দু'টি অসম অপত্য কোষ উৎপন্ন হয়। সৃষ্ট কোষ দু'টির মধ্যে বড়টিকে *সেকেণ্ডারী উসাইট* (Secondary Oocyte) এবং ছোটটিকে প্রথম পোলোসাইট (First Polocyte) বলে। সেকেণ্ডারী উসাইট ও প্রথম পোলোসাইটের নিউক্লিয়াসে হ্যাপ্লয়েড (n) সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। দ্বিতীয় বিভাজনের সময় সেকেণ্ডারী উসাইট থেকে আবার দুটি অসমান অপত্য কোষ উৎপন্ন হয় (চিত্র নং 1.6)। সৃষ্ট কোষ দু'টোর মধ্যে বড়টিকে উটিড (Ootid) এবং ছোটটিকে *দ্বিতীয় পোলোসাইট* (Second Polocyte) বলে। প্রথম পোলোসাইট বিভাজিত হয়ে দু'টি সমান মাপের পোলোসাইট সৃষ্টি করে। পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশায় সৃষ্ট চারটি হ্যাপ্লয়েড কোষের মধ্যে কেবলমাত্র উটিড সক্রিয় ডিম্বাণুতে (Ovum) পরিণত হয়। তিনটি পোলোসাইট নিষ্ক্রিয় থাকে এবং পরে বিনষ্ট হয়। ডিম্বাণুতে পরিণত হওয়ার সময় উটিডের সাইটোপ্লাজমে নানান পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রধান পরিবর্তন হল সাইটোপ্লাজমে *কুসুমের* (Yolk) সঞ্চয়। সঞ্চিত কুসুম ভাবী ভ্রূণের পুষ্টি প্রদান করে। ডিম্বাণু পরিবৃত ফলিকল কোষ থেকে কুসুম সংশ্লেষিত হয়।

1.5.1 ডিম্বাণুর গঠন

ডিম্বাণুর আকৃতি ও গঠন বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ। কুসুমের পরিমাণ ও বাইরের আবরণের পার্থক্য উল্লেখ্য। মুখ্যত কুসুমের পরিমাণের উপর ডিম্বাণুর আয়তন নির্ভর করে। প্রতিটি ডিম্বাণু প্লাজমা মেমব্রেণ দ্বারা পরিবৃত থাকে। প্লাজমা মেমব্রেণ দ্বারা আবদ্ধ সাইটোপ্লাজমকে *ভাইটিলাস* (Vitellus) বলে। ভাইটিলাসের মধ্যে অবস্থিত নিউক্লিয়াসটি সুস্পষ্ট এবং অপেক্ষাকৃত আকারে বড়। ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেণ সংলগ্ন সংকীর্ণ সাইটোপ্লাজম স্তরটিকে *কর্টেকস্* (Cortex) বলে। ক্ষেত্র বিশেষে কর্টেক্সে *কর্টিক্যাল গ্রানিউল* (Cortical granules) থাকে। নিষেকের সময় গ্রানিউলগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। সাইটোপ্লাজমের মধ্যে মাইটোকনড্রিয়া, গলজি বডি এবং কুসুম থাকে। উওসাইট অবস্থা থেকেই ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে কুসুম সংশ্লেষিত হয় এবং কুসুম থেকে পরিস্ফুরণরত ভ্রূণ পুষ্টি গ্রহণ করে। ডিম্বাণু কয়েকটি ঝিল্লী দ্বারা পরিবৃত থাকে। ঝিল্লীগুলি বিভিন্ন প্রাণীদের ক্ষেত্রে ভিন্নরূপ।

1.5.2 ডিম্বাণুর প্রকারভেদ

বিভিন্ন প্রাণীদের ডিম্বাণুতে কুসুমের পরিমাণ ভিন্নরূপ। কুসুমের পরিমাণ ও বিস্তারের ভিত্তিতে ডিম্বাণুকে কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়, যথা ---

1. *অ্যালেসিথাল (Alecithal)* -- কুসুমবিহীন ডিম্বাণু। উদাহরণ — অমরাযুক্ত স্তন্যপায়ী।
2. *মাইক্রোলেসিথাল (Microlecithal)* — কুসুমের পরিমাণ খুবই কম। উদাহরণ একনালী প্রাণী।
3. *মেসোলেসিথাল (Mesolecithal)* — পরিমিত কুসুম বর্তমান। উদাহরণ—উভচর প্রাণীদের ডিম্বাণু।
4. *মেগালেসিথাল (Megalecithal)* --- যখন প্রচুর পরিমাণে কুসুম থাকে। উদাহরণ—সরীসৃপ, পাখি ও হংসচঞ্চু। এই ধরণের ডিমে কুসুম একধারে সঞ্চিত থাকে। এই অবস্থানের জন্য ডিমকে টিলোলেসিথাল (Telolecithal) ডিম বলে।

অনুশীলনী - 2

(A) সঠিক উত্তরটিতে (√) চিহ্ন এবং ভুলটিতে (X) চিহ্ন দিন -

1. পোলোসাইট সক্রিয় স্ত্রীজনন কোষরূপে রূপান্তরিত হয় এবং এদের নিউক্লিয়াসে ডিপ্লয়েড সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকে।
2. প্রাইমারি উসাইটের নিউক্লিয়াস স্ফীত হয়ে জার্মিনাল ভেসিকলে পরিণত হয়।
3. উটিড সরাসরি ডিম্বাণুতে পরিণত হয়।
4. প্লাজমা মেমব্রেণ দ্বারা আবদ্ধ ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমকে ভাইটিলাস বলে।

(B) উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

1. প্রাইমারি উসাইট থেকে একটি ______ সেকেণ্ডারী ______ এবং একটি ______ প্রথম ______ সৃষ্টি হয়।

2. ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেণ সংলগ্ন সংকীর্ণ ______ স্তরটিকে কর্টেকস বলে এবং এর ভিতরে ______ গ্রানিউল থাকে।

3. পরিণত ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে ______ কুসুম থেকে ______ ভ্রূণ ______ গ্রহণ করে।

4. একটি প্রাইমারি উসাইট থেকে ______ উটিড ও ______ পোলোসাইট উৎপন্ন হয় এবং এদের ______ সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে।

1.6 স্পার্মাটোজেনেসিস ও উজেনেসিস তুলনামূলক আলোচনা

উভয় প্রক্রিয়ায় প্রথম দশাটি অর্থাৎ সংখ্যাবৃদ্ধি দশাটির মধ্যে সাদৃশ্য থাকলেও পরবর্তী ঘটনাবলীর মধ্যে পার্থক্য বর্তমান। এদের পার্থক্য নীচে দেওয়া হল।

	স্পার্মাটোজেনেসিস	উজেনেসিস
1. বৃদ্ধিদশায়	প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইটের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমে বৃদ্ধি ও সংশ্লেষ প্রক্রিয়া অপেক্ষাকৃত সংক্ষিপ্ত।	প্রাইমারি উওসাইটের নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমে বৃদ্ধি ও সংশ্লেষ প্রক্রিয়া বহুলাংশে বেশী।
	স্পার্মাটোজেনেসিস	উজেনেসিস
2. পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশায়	প্রতিটি প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট থেকে চারটি সমআয়তনযুক্ত স্পার্মাটিড সৃষ্টি হয়। স্পার্মাটিড থেকে শুক্রাণু উৎপন্ন হয়।	প্রতিটি প্রাইমারি-উওসাইট থেকে একটি কার্যক্ষম বৃহৎ উওটিড এবং তিনটি নিষ্ক্রিয় ক্ষুদ্রাকার পোলো-সাইট সৃষ্টি হয়। কেবলমাত্র উওটিড থেকেই ডিম্বাণু উৎপন্ন হয়।
a) নিউক্লিয়াস	ক্ষুদ্রাকার থাকে।	আকার বহুলাংশে বৃদ্ধি পায়।
b) নিউক্লিয়ার রস	পরিমাণে কম থাকে।	পরিমাণ বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়।
c) নিউক্লিয়াসের পূর্ণতা	সাইটোপ্লাজমের বিভেদের পূর্বেই সংগঠিত হয়।	সাইটোপ্লাজমের বিভেদ ও নিউক্লিয়াসের পূর্ণতাপ্রাপ্তি একই সঙ্গে সংঘটিত হয়।
d) সাইটোপ্লাজম	কোন খাদ্য সঞ্চিত থাকে না। বেশীর ভাগই পরিত্যক্ত হয়।	প্রচুর পরিমাণে খাদ্যবস্তু সঞ্চিত থাকে। পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

1.7 সারাংশ

এককোষী জাইগোট দশায় ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণ সূচিত হয়। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে জাইগোটের সৃষ্টি হয়। জাইগোট থেকে ভ্রূণ এবং ভ্রূণ থেকে ক্রম পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের মধ্যে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ প্রাপ্তি ঘটে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় জাইগোট দশায় জীবের পরিস্ফুরণ আরম্ভ হয়, কিন্তু পরিস্ফুরণের প্রকৃত সূত্রপাত হয় জনন কোষ সৃষ্টি দশায়। জনন অঙ্গ থেকে জনন কোষের উৎপত্তিকে গ্যামেটোজেনেসিস বলে। গ্যামেটোজেনেসিস প্রক্রিয়াকে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, যথা —স্পার্মাটোজেনেসিস্ (পুংজনন কোষ বা শুক্রাণু সৃষ্টি) এবং উওজেনেসিস্ (স্ত্রীজনন কোষ বা ডিম্বাণু সৃষ্টি)। উভয় প্রক্রিয়ায় তিনটি সুস্পষ্ট দশা বর্তমান। তিনটি দশার মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্য থাকলেও শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ বৈসাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়।

1.8 প্রশ্নাবলী

1. গ্যামেটোজেনেসিস্ কাকে বলে? কেন গ্যামেটোজেনেসিসকে ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণের প্রথম দশা বলা হয়?
2. গ্যামেটোজেনেসিস্ প্রক্রিয়ায় কিভাবে জনন-কোষ উৎপন্ন হয়?
3. স্পার্মাটোজেনেসিস্ প্রক্রিয়ায় স্পার্মাটিডের উৎপত্তি চিত্র সহযোগে বর্ণনা করুন।
4. স্পার্মাটিলিওসিস্ কাকে বলে? স্পার্মাটিলিওসিস প্রক্রিয়ার তাৎপর্য কি?
5. শুক্রাণুর অ্যাক্রোসোম ভেসিকল ও অ্যাক্রোসোমাল গ্রানিউল স্পার্মাটিডের কোন অঙ্গাণু থেকে উৎপন্ন হয়?
6. একটি আদর্শ শুক্রাণু আণুবীক্ষণিক গঠন চিত্র সহযোগে বর্ণনা করুন।
7. উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন :

   অস্থিময় মাছের শুক্রাণুর মস্তকাংশ ________________ ।

   উভচর প্রাণীর শুক্রাণুর মস্তকাংশ ________________ ।

   ইঁদুরের ও মানুষের শুক্রাণুর মস্তকাংশ যথাক্রমে ________________ ও ________________ মত।
8. উজেনেসিস্ প্রক্রিয়ার বৃদ্ধি দশায় সেকেণ্ডারী উগোনিয়ামের পরিবর্তন বর্ণনা করুন।
9. উজেনেসিসের পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশার বৈশিষ্ট্য কি? স্পার্মাটোজেনেসিসের পূর্ণতাপ্রাপ্তির দশার সাথে উজেনেসিসের পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশার পার্থক্য কি?
10. স্পার্মাটোজেনেসিস্ ও উজেনেসিসের তুলনা করুন।

1.9 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1

(A) 1 — জাইগোট, আরম্ভ।

2 — সংখ্যাবৃদ্ধি, বৃদ্ধি, পূর্ণতা প্রাপ্তি।

3 — ডিপ্লয়েড, হ্যাপ্লয়েড।

4 — অ্যাকসিয়াল, মাইটোকনড্রিয়া, মাইটোকনড্রিয়াল।

(B) 1 — (X), 2 — (√), 3 — (X), 4 — (X)

অনুশীলনী - 2

(A) 1 — (X), 2 — (√), 3 — (√), 4 — (√)

(B) 1 — বড়, উসাইট, ছোট, পোলোসাইট।

2 — সাইটোপ্লাজমের, কর্টিক্যাল।

3 — সঞ্চিত, পরিস্ফুরণরত, পুষ্টি।

4 — একটি, তিনটি, হ্যাপ্লয়েড।

প্রশ্নাবলী

1. যে প্রক্রিয়ায় জনন অঙ্গ থেকে জনন-কোষ বা গ্যামেট উৎপন্ন হয় তাকে গ্যামেটোজেনেসিস বলে। দুইটি বিশেষ ধরণের জনন কোষের (শুক্রাণু ও ডিম্বাণু) মিলনের ফলে জাইগোটের সৃষ্টি হয় এবং জাইগোট থেকে ভ্রূণের উৎপত্তি হয়। জনন কোষের উৎপত্তি উচ্চতর প্রাণীদের পরিস্ফুরণের প্রারম্ভিক দশা।

2. জনন অঙ্গে অবস্থিত প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষ থেকে নানা পরিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যমে পূর্ণগঠিত কার্যকরী জনন কোষ উৎপন্ন হয়। পরিবর্তন প্রক্রিয়াটি খুবই জটিল এবং তিনটি সুস্পষ্ট দশায় সংঘটিত হয়, যথা- সংখ্যাবৃদ্ধি, বৃদ্ধি ও পূর্ণতা প্রাপ্তি দশা। উক্ত দশা তিনটির মধ্যে মৌলিক সাদৃশ্য থাকলেও শুক্রাণু ও ডিম্বাণু সৃষ্টির মধ্যে বিশেষ বৈসাদৃশ্য বর্তমান।

3. এই প্রশ্নটির উত্তর 1.4.1 অংশে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

4. স্পার্মাটোজেনেসিস্ প্রক্রিয়ার পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশায় সৃষ্ট স্পার্মাটিড সক্রিয় পুরুষ জনন কোষরূপে কাজ করতে অক্ষম। স্পার্মাটিলিওসিস্ নামক জটিল পরিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যমে স্পার্মাটিড পূর্ণগঠিত শুক্রাণুতে পরিণত হয়।

   স্পার্মাটিডের গঠন আদর্শ প্রাণিকোষের মত। জটিল পরিবর্তনের মাধ্যমে স্পার্মাটিডের সক্রিয় ভিন্ন আকারবিশিষ্ট শুক্রাণুতে রূপান্তর স্পার্মাটিলিওসিসের বৈশিষ্ট্য।

5. স্পার্মাটিডের গলজি বস্তি থেকে ক্রম পরিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যমে শুক্রাণুর মস্তকাংশে অবস্থিত অ্যাক্রোসোম ভেসিকল ও অ্যাক্রোসোম গ্রানিউল উৎপন্ন হয়।

6. এই প্রশ্নটির উত্তর 1.4.3 অংশে দেওয়া হয়েছে।

7. গোলাকার, বল্লম-সদৃশ, বঁড়শি ও চামচের।

8. উজেনেসিসের বৃদ্ধি দশায় প্রতিটি সেকেণ্ডারী উগোনিয়াম পুষ্টি গ্রহণ করে আয়তনে বৃদ্ধি পায়। নিউক্লিয়াসটি ভীষণভাবে স্ফীত হয়ে থলির আকার ধারণ করে। একে জার্মিনাল ভেসিকল বলে। জার্মিনাল ভেসিকলটি নিউক্লিয়ার স্যাপ নামক তরল দ্বারা পূর্ণ থাকে। সৃষ্ট কোষটিকে প্রাইমারি উসাইট বলে। এই দশাটি খুবই প্রলম্বিত এবং সাইটোপ্লাজমে প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়।

9. উজেনেসিসের পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশায় একটি প্রাইমারি উসাইট থেকে একটি বড় উটিড এবং তিনটি নিষ্ক্রিয় ক্ষুদ্রাকার পোলোসাইট উৎপন্ন হয়। উটিডটি ডিম্বাণুতে পরিণত হয় এবং পোলোসাইট তিনটি বিনষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু স্পার্মাটোজেনেসিসের ক্ষেত্রে একটি প্রাইমারি স্পার্মাটোসাইট থেকে চারটি সমান আকারযুক্ত স্পার্মাটিড সৃষ্টি হয়। প্রতি স্পার্মাটিড সক্রিয় শুক্রাণুতে পরিণত হয়।

10. এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য 1.6 অংশটি দেখুন।

একক-1 এর চিত্রাবলী ঃ

চিত্র নং 1.1 - স্পার্মাটিড সৃষ্টির বিভিন্ন পর্যায়।

চিত্র নং 1.2 - মানুষের শুক্রাশয়ের আণুবীক্ষণিক চিত্ররূপ ঃ সেমিনিফেরাস টিবিউলের মধ্যে শুক্রাণু সৃষ্টি।

চিত্র নং 1.3 - স্পার্মাটিলিওসিসের বিভিন্ন দশা ঃ (a) গলজি বডির মধ্যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র থলির উদ্ভব। থলিগুলিকে ভেসিকল বলে। প্রতিটি ভেসিকলের অভ্যন্তরে একটি করে দানা বা গ্রাণিউলের উদ্ভব হয়। (a-b) -ভেসিকল ও দানাগুলি একত্রে মিলিত হয়ে একটি বড় আকারবিশিষ্ট অ্যাক্রোসোম ভেসিকল ও অ্যাক্রোসোম গ্রাণিউল গঠন করে এবং নিউক্লিয়াসের গাত্রে যুক্ত হয়। এই সময় সেন্ট্রিওলদ্বয়ের মধ্যে সূক্ষ্ম লেজের উদ্ভব হয়। (d) অ্যাক্রোসোম গঠনের পর গলজি বডির অবশিষ্ট অংশ নিউক্লিয়াস থেকে দূরে সরে যায় এবং কোষ ঝিল্লীর নিকটে সাইটোপ্লাজমে বিস্তৃত হয়। অ্যাক্রোসোম ভেসিকল ও গ্রানিউল ক্রমে আকারে বর্ধিত হয়ে নিউক্লিয়াসের অগ্রভাগে টুপীর ন্যায় অবস্থান করে। লেজ ফিলামেন্টটি প্রলম্বিত হয়ে সাইটোপ্লাজম থেকে বাহিরে প্রসারিত হয়। (e-g) ক্রম পরিবর্তনের মাধ্যমে নিউক্লিয়াসটি পূর্ণগঠিত শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসের রূপ ধারণ করে এবং সাইটোপ্লাজম পরিশেষে পরিত্যক্ত হয়।

চিত্র নং 1.4 - বিভিন্ন প্রাণীর শুক্রাণুর আকৃতি ঃ (a) সি-আর্চিন, (b)-অ্যাস্তিওক্লাস, (c) কুনো ব্যাঙ, (d) সোনা ব্যাঙ, (e) মোরগ, (f) মোনোট্রিমাটা, (g) মানুষ ও (h) অ্যাস্কারিস।

চিত্র নং 1.5 - একটি আদর্শ স্তন্যপায়ী শুক্রাণুর বর্ধিত চিত্ররূপ।

চিত্র নং 1.6 - উজেনেসিসের ঘটনাপ্রবাহ।

চিত্র নং 1.7 - মানুষের ডিম্বাণুর বর্ধিত চিত্ররূপ।

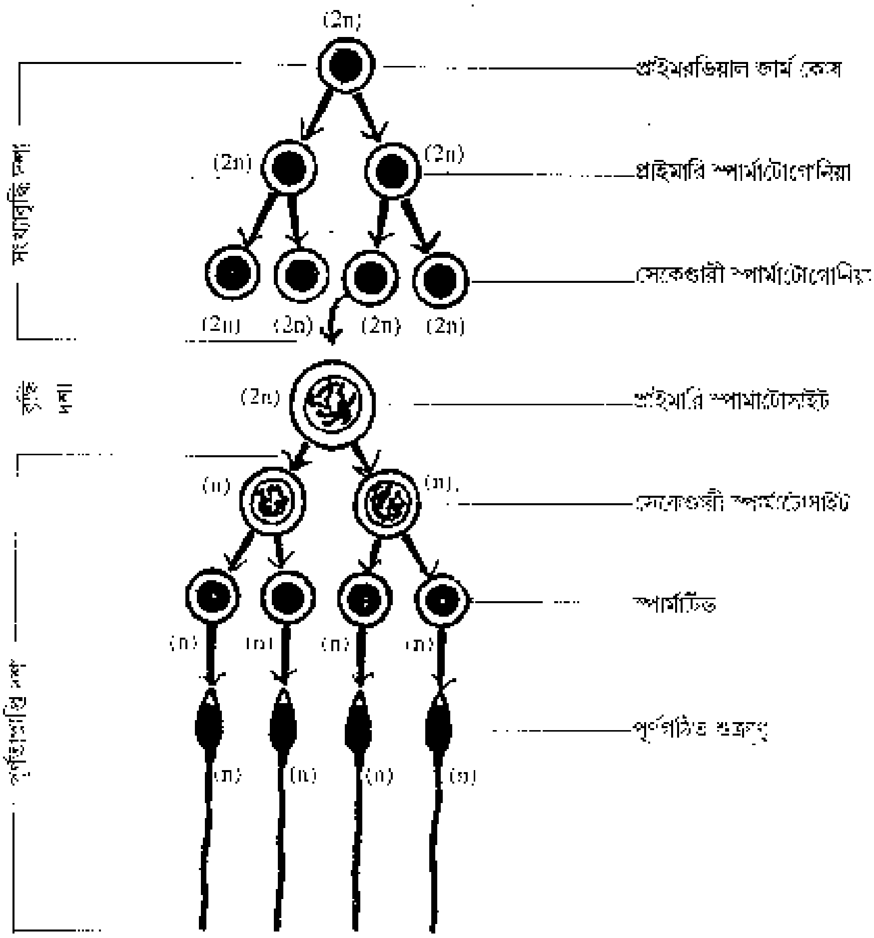

চিত্র নং 1.1

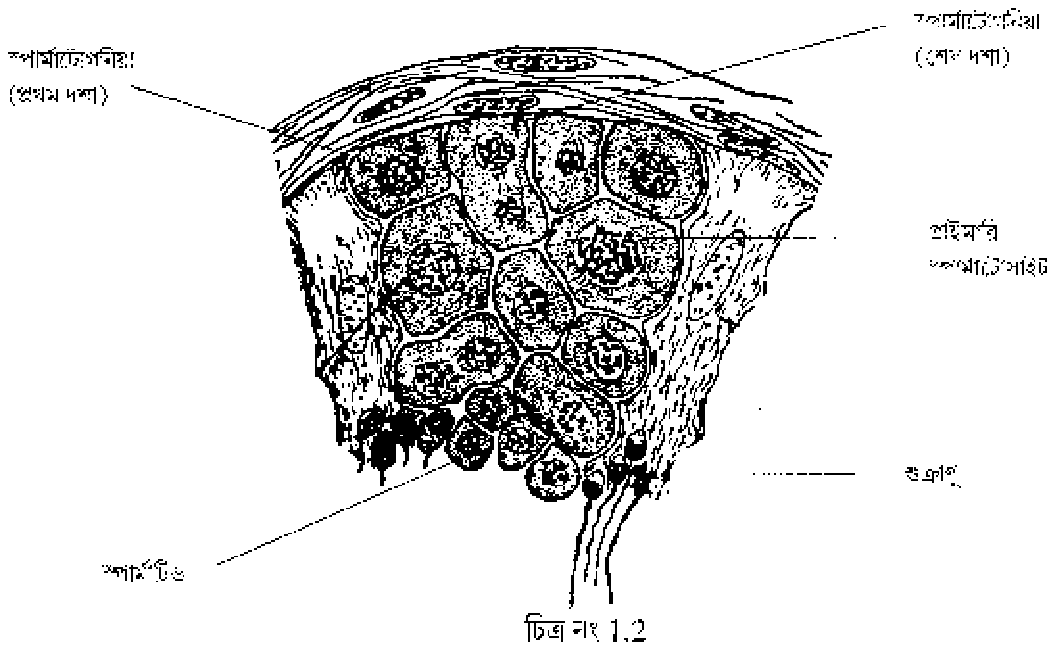

চিত্র নং 1.2

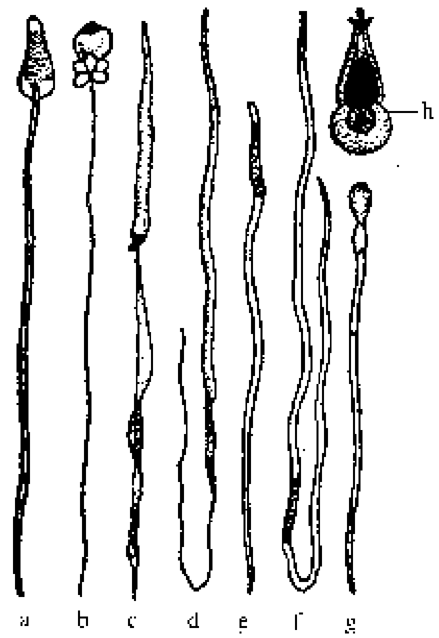

চিত্র নং 1.4

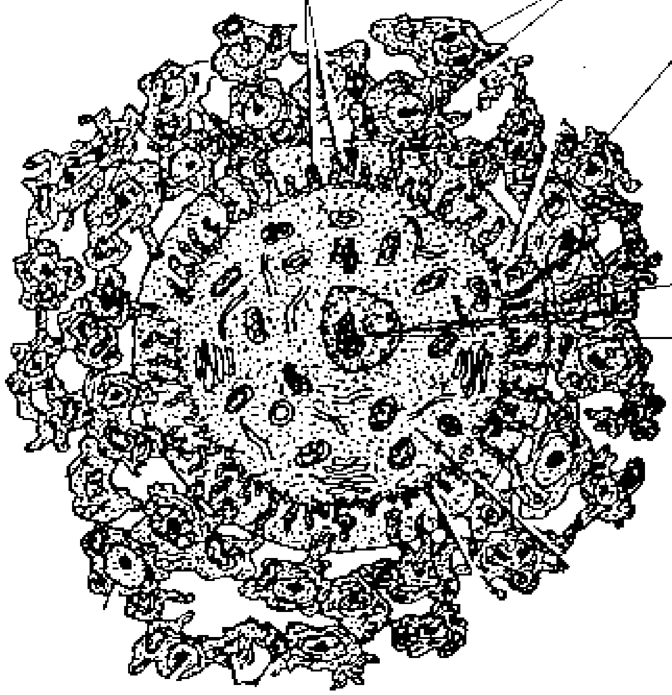

চিত্র নং 1.7

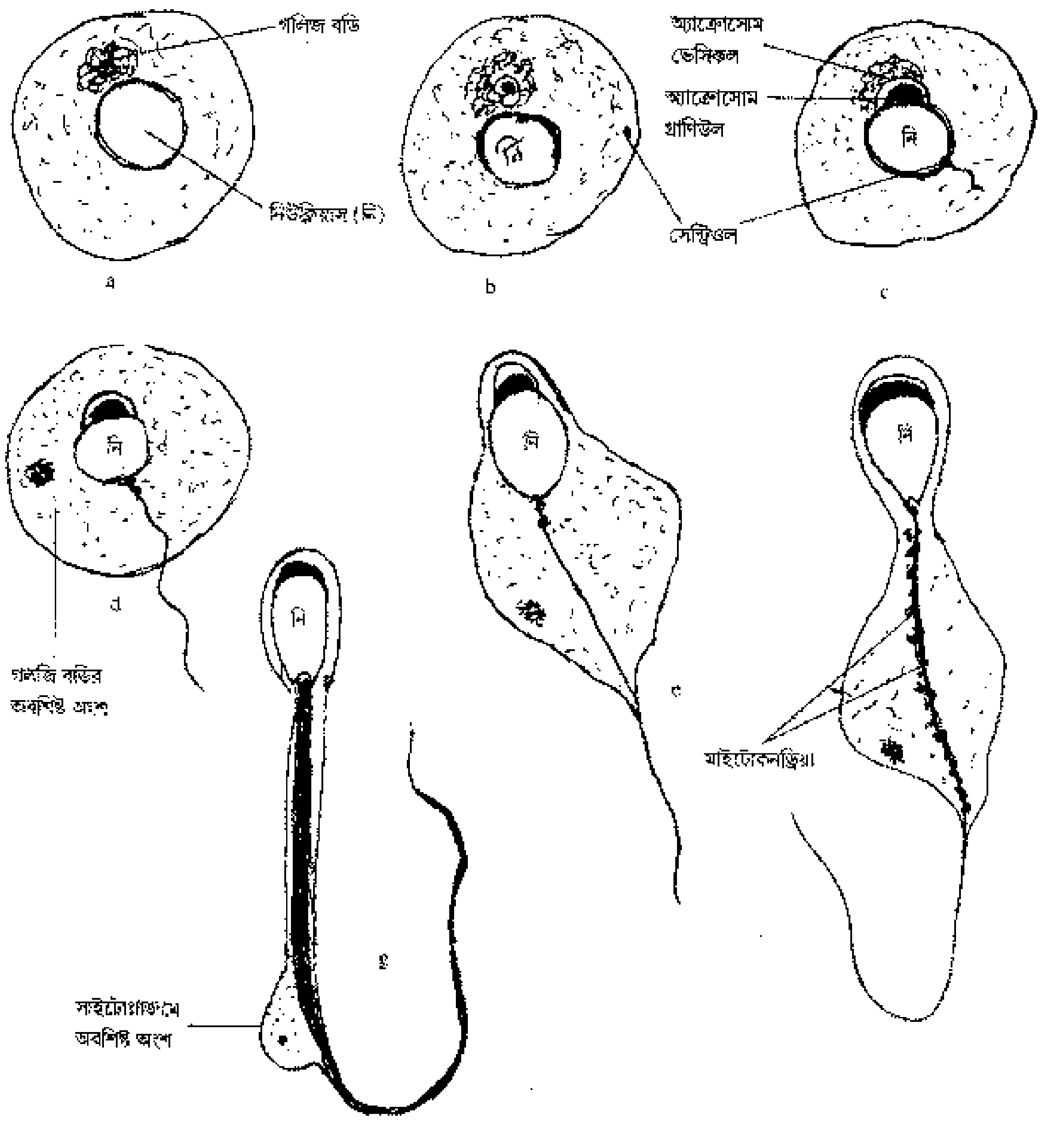
গলজি বডি
নিউক্লিয়াস (নি)
অ্যাক্রোসোম ভেসিকল
অ্যাক্রোসোম গ্রানিউল
সেন্ট্রিওল
নি
a
b
c
d
গলজি বডির অবশিষ্ট অংশ
মাইটোকনড্রিয়া
সাইটোপ্লাজমের অবশিষ্ট অংশ

চিত্র নং 1.3

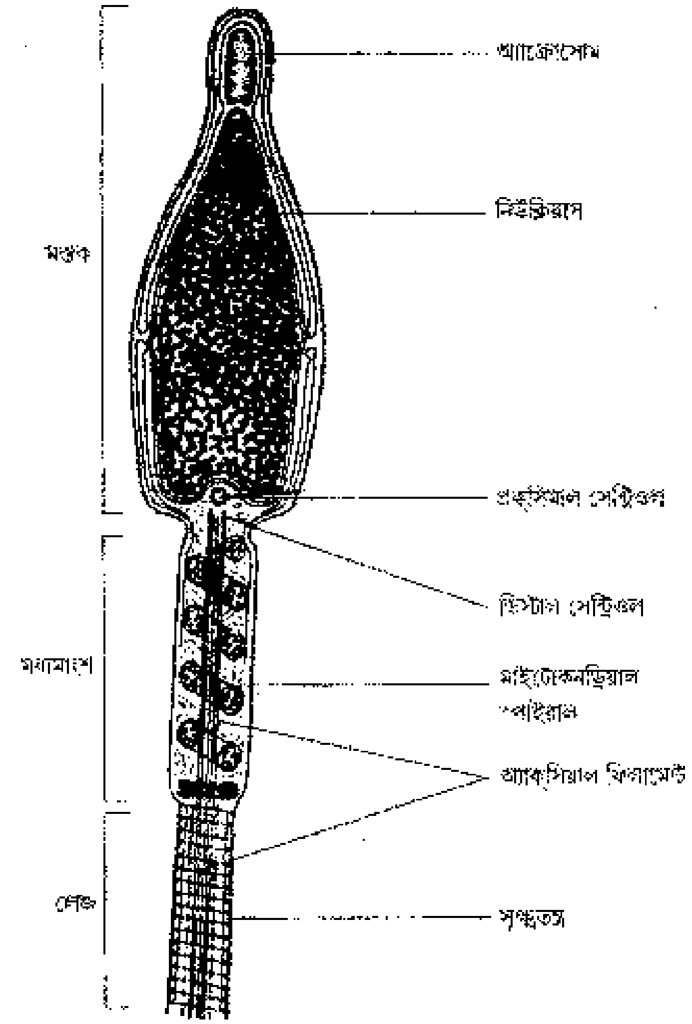
অ্যাক্রোসোম
নিউক্লিয়াস
মস্তক
প্রক্সিমাল সেন্ট্রিওল
ডিস্টাল সেন্ট্রিওল
মধ্যমাংশ
মাইটোকনড্রিয়াল
স্পাইরাল
অ্যাক্সিয়াল ফিলামেন্ট
লেজ
সূক্ষ্মতন্ত

চিত্র নং 1.5

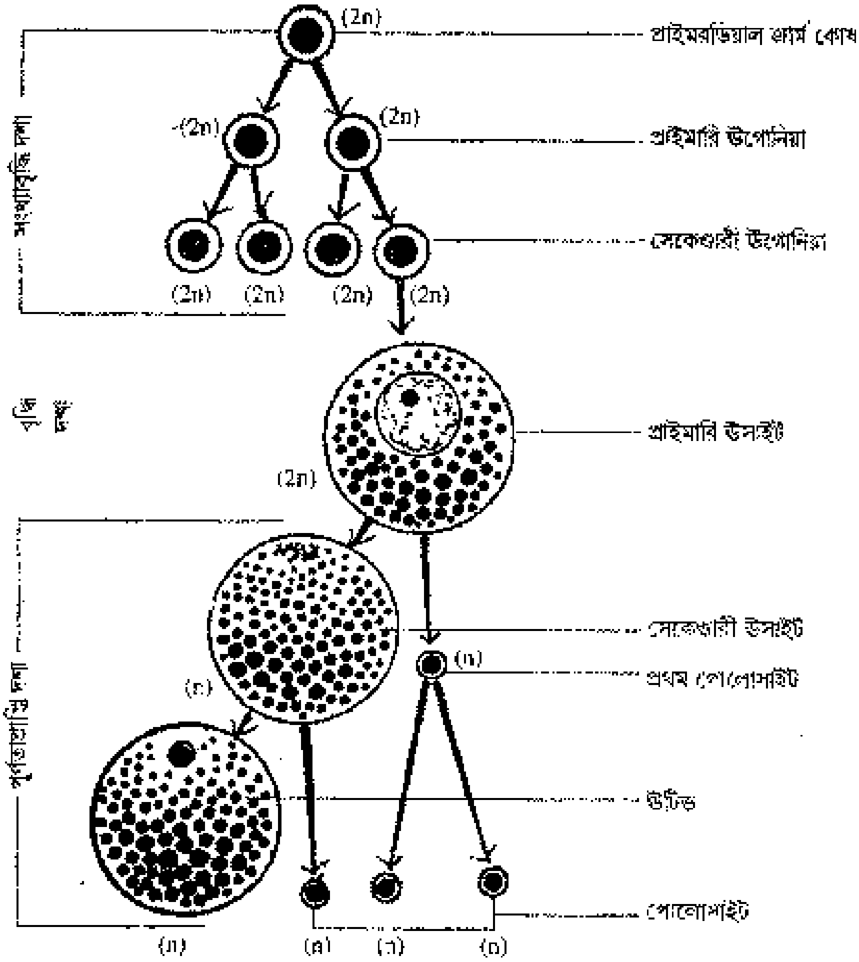

(2n)
প্রাইমরডিয়াল জার্ম কোষ
(2n)
(2n)
প্রাইমারি উগোনিয়া
সেকেণ্ডারী উগোনিয়া
(2n) (2n) (2n) (2n)
সংখ্যাবৃদ্ধি দশা
প্রাইমারি উসাইট
(2n)
সেকেণ্ডারী উসাইট
(n)
প্রথম পোলোসাইট
(n)
পূর্ণতাপ্রাপ্তি দশা
উভিড
পোলোসাইট
(n) (n) (n) (n)

চিত্র নং 1.6

একক 2 □ নিষেক (Fertilization)

গঠন

2.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

2.2 নিষেকের প্রকারভেদ

2.3 নিষেকের ঘটনা প্রবাহ

2.3.1 শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সম্মুখীন হওয়া

2.3.2 শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংযোগস্থাপন এবং অ্যাগ্লুটিনেশন

2.3.3 অনুপ্রবেশ

2.3.4 সক্রিয়তা অর্জন

2.3.5 প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের পরিযান ও অ্যাম্ফিমিক্সিস্

2.4 নিষেকের তাৎপর্য

2.5 সারাংশ

2.6 প্রশ্নাবলী

2.7 উত্তরমালা

2.1 প্রস্তাবনা

নিষেক পদ্ধতিতে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটে। এটা ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণের দ্বিতীয় দশা। নিষেকের সময় থেকেই ভ্রূণের পরিস্ফুরণ আরম্ভ হয় এবং হ্যাপ্লয়েড ক্রমোসোমযুক্ত শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলিত হয়ে ভ্রূণের কোষে ডিপ্লয়েড ক্রমোসোম সংখ্যা বজায় রাখে। আপাত দৃষ্টিতে নিষেক একটি সাধারণ প্রক্রিয়া মনে হলেও নিষেক একটি খুবই জটিল প্রক্রিয়া এবং অসংখ্য ভৌত ও রাসায়নিক ঘটনার সমন্বয়ে তা সম্পন্ন হয়। ডিম্বাণুর সক্রিয়তা অর্জন ও অপত্য প্রাণীতে পিতামাতার বংশগতিজনিত বৈশিষ্ট্যগুলির সঞ্চারণ নিষেকের দ্বারা সংঘঠিত হয়।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- নিষেকের দ্বারা কিভাবে হ্যাপ্লয়েড ক্রোমোসোমযুক্ত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে ডিপ্লয়েড ক্রোমোসোমযুক্ত জাইগোট সৃষ্টি হয় তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- নিষেককালে ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশকালে উদ্ভুত ভৌতরাসায়নিক বিক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জাইগোটের মাধ্যমে জীনগত প্রকরণের উদ্ভব সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।

2.2 নিষেকের প্রকারভেদ

মিলন ক্রিয়ার প্রারম্ভে পরিণত শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর পরস্পর সম্মুখীন হওয়া একান্ত প্রয়োজন। প্রাণিজগতে দুই প্রকার নিষেক পরিলক্ষিত হয়, যথা-

(ক) *বাহ্য নিষেক* ঃ মাছ, উভচর ও জলবাসী অমেরুদণ্ডী প্রাণীদের নিষেক দেহের বাহিরের জলে সংঘটিত হয়। এই ধরনের নিষেককে বাহ্য নিষেক বলে।

(খ) *অভ্যন্তরীণ নিষেক* ঃ এই ক্ষেত্রে (সরীসৃপ, পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণী) পরিণত ডিম্বাণু স্ত্রীদেহের ডিম্বনালীর গহ্বরে অবস্থান করে। যৌন মিলনের সময় পুরুষ দেহ থেকে শুক্রাণু স্ত্রী দেহের নির্দিষ্ট অংশে নিক্ষেপিত হয়। এই ধরনের নিষেককে অভ্যন্তরীণ নিষেক বলে।

2.3 নিষেকের ঘটনাপ্রবাহ

নিষেককালীন ভৌত ও রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে কয়েকটি পর্যায়ে বর্ণনা করা যায় -

ক) শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর পরস্পরের সম্মুখীন হওয়া।

খ) শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংযোগস্থাপন এবং অ্যাগ্লুটিনেশন।

গ) অনুপ্রবেশ

ঘ) সক্রিয়তা অর্জন

ঙ) প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের পরিযান ও অ্যাম্ফিমিক্সিস্

2.3.1 শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সম্মুখীন হওয়া

নিষেককালে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর কাছাকাছি আসা একান্ত প্রয়োজন। নানান পদ্ধতিতে গ্যামেট দুটি পরস্পরের কাছাকাছি আসে। নিষেককালে প্রচুর সংখ্যায় শুক্রাণু পরিণত ডিম্বাণুর নিকটবর্তী হয়। যান্ত্রিক প্রক্রিয়া ছাড়াও এদের আকর্ষণের জন্য রাসায়নিক বস্তুর উপস্থিতি ও কিমোট্যাক্সিসের (Chemotaxis) গুরুত্ব তাৎপর্যপূর্ণ।

2.3.2 শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংযোগস্থাপন এবং অ্যাগ্লুটিনেশন

শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংযোগস্থাপন নিষেকের প্রাথমিক ঘটনা। পরিণত ডিম্বাণুর আবরণী থেকে নিঃসৃত নির্দিষ্ট রাসায়নিক বস্তু একই প্রজাতির শুক্রাণুকে ডিম্বাণুগাত্রে আটকে রাখতে সাহায্য করে। এই অবস্থায় অনেকগুলি শুক্রাণু ডিম্বাণুগাত্রে যুক্ত হয়। শুক্রাণুগুলির এই ধরণের সমবেত হবার প্রক্রিয়াকে *অ্যাগ্লুটিনেশন* (Agglutination) বলে।

জটিল ভৌত ও রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর আকর্ষণ সংযোগস্থাপন ও মিলনক্রিয়া সম্পাদিত হয়। ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ ঘটলে প্রকৃত পরিস্ফুরণ আরম্ভ হয়। নিষেককালে ডিম্বাণু অভিমুখে শুক্রাণুর

আকর্ষণের জন্য একাধিক রাসায়নিক বস্তুর উপস্থিতি প্রমাণিত। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংযোগস্থাপনকালে ভৌত প্রক্রিয়ার সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংযোজিত হয়। সী-আর্চিনের ক্ষেত্রে ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ প্রধানতঃ দু'প্রকার জটিল রাসায়নিক পদার্থের সহক্রিয়ায় সাধিত হয়। রাসায়নিক বস্তু দু'টি হল : *ফার্টিলাইজিন* (Fertilizin) এবং *অ্যান্টিফার্টিলাইজিন* (Antifertilizin)।

ফার্টিলাইজিন : পরীক্ষাগারে একটি কাঁচের পেট্রিডিসে সমুদ্রের জলে সী-আর্চিনের কয়েকটি ডিম্বাণু কিছু সময় রাখার পর ডিম্বাণুগুলো অপসারিত করে সেই দ্রবণে বেশ কিছু শুক্রাণু স্থাপন করলে শুক্রাণুগুলোর মধ্যে একত্রিত হবার প্রবণতা দেখা যায়। একে *অ্যাগ্লুটিনেশন* বলে। ডিম্বাণুসমূহের জেলী আবরণী থেকে ক্ষরিত এক বিশেষ ধরণের পদার্থ (*ফার্টিলাইজিন*) শুক্রাণুগুলিকে এইভাবে একত্রিত হবার ক্ষমতা অর্জনে সাহায্য করে। ফার্টিলাইজিনে কয়েক প্রকার অ্যামাইনো অ্যাসিড ও পলিস্যাকারাইড সংযুক্ত থাকে এবং এর আণবিক ওজন 82,000 অপেক্ষা বেশী।

অ্যান্টি ফার্টিলাইজিন : এই রাসায়নিক বস্তুটি একপ্রকার আম্লিক প্রোটিন এবং শুক্রাণু থেকে নিঃসৃত হয়। ফার্টিলাইজিন ও অ্যান্টিফার্টিলাইজিন বস্তুদ্বয়ের বিক্রিয়ার ফলে সমসংস্থ শুক্রাণুসমূহের মধ্যে অ্যাগ্লুটিনেশন সংঘটিত হয়।

ফার্টিলাইজিন - অ্যান্টিফার্টিলাইজিন বিক্রিয়া :

ফার্টিলাইজিন ও অ্যান্টিফার্টিলাইজিন বিক্রিয়া অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি বিক্রিয়ার মত প্রজাতি নির্দিষ্ট। সুতরাং ডিম্বাণুর বহিরাবরণ থেকে ক্ষরিত ফার্টিলাইজিন উক্ত প্রজাতির শুক্রাণুগুলিকে সক্রিয় করে এবং পজিটিভ কিমোট্যাকসিস (Positive Chemotaxis) দ্বারা ডিম্বাণু গাত্রে আটকে রাখতে সাহায্য করে। দ্রব অবস্থায় ফার্টিলাইজিন হল মাল্টিভ্যালেন্ট এবং এদের অণুগুলি একাধিক শুক্রাণুকে আটকাতে সক্ষম। নিষেকের সময় বিপরীতধর্মী গ্যামেটদ্বয়ের সংযোগ স্থাপনে অ্যান্টিফার্টিলাইজিন এবং ফার্টিলাইজিনের বিক্রিয়া একান্ত প্রয়োজন।

2.3.3 অনুপ্রবেশ

পরিণত ডিম্বাণুগাত্র স্পর্শ করার পর শুক্রাণুদের গমনক্ষমতা বিলুপ্ত হয় এবং ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ অ্যাক্রোসোম বিক্রিয়ার দ্বারা সাধিত হয়। স্তন্যপায়ীদের শুক্রাণু থেকে নিঃসৃত *হায়ালুরোনিডেজ* (Hyaluronidase) নামক *স্পার্মলাইসিন* (Spermlysin) বা লাইটিক এজেন্ট ডিম্বাণুর আবরণী ভেদ করে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা নেয়।

অ্যাক্রোসোম বিক্রিয়া ও অনুপ্রবেশ :

ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ একটি বিতর্কিত বিষয়। অনুপ্রবেশ সম্বন্ধে নানা মতবাদ আছে। কেউ কেউ মনে করেন নিষেককালে ডিম্বাণুর প্লাজমামেমব্রেণ নির্দিষ্ট *পিনোসাইটোসিস* (Pinocytosis) প্রক্রিয়ায় শুক্রাণুর মস্তকাংশ ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে অধিগ্রহণ করে। কিন্তু ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে স্যাকোগ্লসাস (Saccoglossus) নামক অমেরুদণ্ডী কর্ডেট এবং হাইড্রয়ডিস (Hydroides) নামক অঙ্গুরীমাল প্রাণীদের ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশের ঘটনা বিস্তারিতভাবে জানা সম্ভব হইয়াছে। পূর্বে ধারণা ছিল নিষেককালে কেবল মাত্র

শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসদ্বয়ের মিলন সংঘটিত হয়। ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে নিষেক সম্বন্ধে আমাদের গতানুগতিক ধারণার সম্পূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। এখন এটা সুস্পষ্ট যে, নিষেককালে উভয় জনন কোষের সম্পূর্ণ সংযুক্তি ও মিলন ঘটে। ঘটনাটি এইরকম : প্রথমে শুক্রাণুর মস্তকাংশ ডিম্বাণুর ভাইটেলাইন মেমব্রেণের সংস্পর্শে আসে। শুক্রাণুর মস্তকাংশের প্লাজমা মেমব্রেণ ও অ্যাক্রোসোম ভেসিকলের মেমব্রেণ পরস্পর যুক্ত হলে এদের মধ্যস্থান ভেঙ্গে যায়। ফলে অ্যাক্রোসোম গ্র্যানিউল ডিম্বাণুর ভাইটেলাইন মেমব্রেণের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসে এবং স্পার্মলাইসিন নামক উৎসেচক ক্ষরিত হয়। উক্ত উৎসেচক ডিম্বাণুর আবরণীকে দ্রবীভূত করে। দ্রবীভূত অংশের মধ্যে দিয়ে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ ঘটে। অ্যাক্রোসোম ভেসিকলের প্লাজমা মেমব্রেণ থেকে সৃষ্ট একটি বা অনেকগুলি প্রলম্বিত *অ্যাক্রোসোমাল টিউবিউল* (Acrosomal tubule) ভাইটেলাইন মেমব্রেণ ভেদ করে ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেণের সংস্পর্শে আসে। অনুরূপভাবে ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেণ থেকে একটি বা অনেকগুলি (চিত্র নং 2.1) আঙ্গুলের মত উপবৃদ্ধি বা ভিলাই উৎপন্ন হয়। অবশেষে অ্যাক্রোসোমাল টিউবিউল এবং ভিলাই পরস্পর সংযুক্ত হয়ে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মধ্যে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন করে। ক্রমে ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজম অভিক্ষেপিত হয়ে প্রথমে শুক্রাণুর মস্তক এবং ক্রমে মধ্যমাংশ ও লেজকে পরিবৃত করে। ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমের শঙ্কু বা মোচার ন্যায় অংশকে *ফার্টিলাইজেশন কোন* (Fertilization Cone) বলে। পরিশেষে শুক্রাণুর প্লাজমা মেমব্রেণ ও ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেণ একীভূত হয়ে উদ্ভূত জাইগোটের মেমব্রেণ গঠন করে। অধিকাংশ প্রাণীদের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শুক্রাণুর নিউক্লিয়াস ও মধ্যমাংশ ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে; কিন্তু স্তন্যপায়ীদের ক্ষেত্রে শুক্রাণুর নিউক্লিয়াস, মধ্যমাংশ ও লেজ ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে প্রবেশ করে। অ্যাক্রোসোমাল গ্রানিউলগুলি কোন সময়ই ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে না। বর্ণিত ঘটনাপ্রবাহ স্যাকোগ্লসাস ও হাইড্রয়ডিসের মত অনেক প্রাণীদের ক্ষেত্রে ঘটলেও কয়েকটি প্রাণীর ক্ষেত্রে অ্যাক্রোসোম থেকে সৃষ্ট *অ্যাক্রোসোম ফিলামেন্ট* (Acrosome filament) ডিম্বাণুর আবরণী ভেদ করে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশের পথ সৃষ্টি করে।

অনুপ্রবেশে রাসায়নিক বিক্রিয়া : পূর্বের আলোচনা থেকে প্রমাণিত যে ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ মুখ্যত রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলশ্রুতি। নিষেককালে এফ. আর. লিলির (F. R. Lillie, 1919) ফার্টিলাইজিন অ্যান্টিফার্টিলাইজিন মতবাদ উপস্থাপনার পর বিভিন্ন প্রাণীবিদ্ অনুপ্রবেশের রাসায়নিক বিক্রিয়া সম্বন্ধে নানা পরীক্ষা -নিরীক্ষায় সচেষ্ট হন। টাইলারের (Tyler) মতে শুক্রাণু থেকে নিঃসৃত *হায়ালুরোনিডেজ* (Hyaluroni-dase) নামক স্পার্মলাইসিন দ্বারা ডিম্বাণুর আবরণীর স্থানিক দ্রবীভবন ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশের পথ সৃষ্টি করে। কিন্তু অধিকাংশ ভ্রূণতত্ত্ববিদ্ নিষেকে অংশগ্রহণকারী সকল রাসায়নিক বস্তুকে সামগ্রিকভাবে *গ্যামোনস* (Gamones) বলেন। শুক্রাণু থেকে উৎপন্ন *অ্যান্ড্রোগ্যামোনস্* (Androgamones) এবং ডিম্বাণু থেকে সৃষ্ট *গাইনোগ্যামোনস্* (Gynogamones)-এর ভারসাম্যের উপর স্বাভাবিক নিষেক নির্ভরশীল। আর. এন. এ. (R.N.A) যৌগ থেকে গ্যামোনস্ উৎপন্ন হয় এবং গ্যামেটের আবরণীতে সঞ্চিত আর এন. এ-এর ঘনত্ব খুব বেশী থাকে।

2.3.4 সক্রিয়তা অর্জন

নিষেকের আগে ডিম্বাণুর বিপাকীয় ক্রিয়াদি ন্যূনতম অবস্থায় থাকে। কিন্তু নিষেকের পরই ডিম্বাণুর বিপাকীয় ক্রিয়া বৃদ্ধি পায় এবং সুপ্ত ডিম্বাণু সক্রিয় হয়ে ওঠে। শুক্রাণু অনুপ্রবেশের পর ডিম্বাণুর সংগঠনিক রদবদল বহুমুখী।

উক্ত প্রক্রিয়াগুলিকে সামগ্রিকভাবে ডিম্বাণুর সক্রিয়তা বলে। সমস্ত সংগঠনিক পরিবর্তনের মধ্যে *কর্টিক্যাল বিক্রিয়া* এবং *ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ* গঠন উল্লেখ্য (চিত্র নং 2.2)।

যদিও নিষেককালে অনেকগুলি শুক্রাণু ডিম্বাণু সংলগ্ন হয়, কেবলমাত্র একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় এবং জাইগোট গঠন করে। অবশিষ্ট এবং বিলম্বে উপনীত শুক্রাণুগুলি ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে না। ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেণের বাইরে একটি বিশেষ আবরণ সৃষ্টির ফলে ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে একাধিক শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ প্রতিহত করে। সৃষ্ট আবরণকে *ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ* (Fertilization membrane) বলে।

নিষেকের পর ডিম্বাণুর সক্রিয়তা অর্জনের প্রথম সূচক হল ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমের কর্টেক্সে ধারাবাহিক ভৌত রাসায়নিক বিক্রিয়া (*কর্টিক্যাল রিঅ্যাকসন* - Cortical Reaction)) এবং *ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ* সৃষ্টি। অধিকাংশ প্রাণীদের ক্ষেত্রে উক্ত গঠন পদ্ধতির মধ্যে সমতা থাকলেও সী-আর্চিন নামে এক ধরণের কন্টকত্বক প্রাণীর কর্টিক্যাল রিঅ্যাকসন ও ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ গঠন প্রক্রিয়া খুবই সুস্পষ্ট।

সী-আর্চিনের ডিম্বাণুর আবরণটি অনিষিক্ত অবস্থায় দুটি ঝিল্লী দ্বারা গঠিত। বাইরের ঝিল্লীটিকে ভিটেলাইন মেমব্রেণ (Viteline membrane) এবং ভিতরেরটিকে *প্লাজমা মেমব্রেণ* বলে। প্লাজমা মেমব্রেণের তলদেশে অসংখ্য ক্ষুদ্রাকার *কর্টিক্যাল গ্র্যানিউল* (Cortical granules) সজ্জিত থাকে। গ্র্যানিউলগুলি মিউকোপ্রোটিন দ্বারা গঠিত। কর্টিক্যাল গ্র্যানিউলগুলি প্লাজমা মেমব্রেণ সৃষ্ট থলির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। উক্ত গ্র্যানিউলগুলি আপাতদৃষ্টিতে ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেণের অভ্যন্তরে দৃষ্ট হলেও প্রকৃতপক্ষে এরা প্লাজমা মেমব্রেণের বাইরে অবস্থিত। ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমের সাথে শুক্রাণুর সংযোগ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে কর্টিক্যাল গ্র্যানিউলগুলির পরিবর্তন সূচিত হয়। গ্র্যানিউলগুলি স্ফীত হয়ে প্লাজমা মেমব্রেণ থলির মধ্যে বিস্ফোরিত হয় এবং বিচ্যুত উপাদানগুলি ভাইটেলাইন মেমব্রেণের অবতলে সংযোজিত হয়। ফলে মেমব্রেণটি পুরু হয় এবং সৃষ্ট ঝিল্লীটিকে *ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ* বলে। এই ঝিল্লীটি বিলম্বে উপস্থিত শুক্রাণুদের ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে দেয় না। এক বিশেষ ধরণের তরল পদার্থের সঞ্চয়ের ফলে ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণটি ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেণ থেকে ক্রমে আলাদা হয়ে যায়। ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেণ থেকে সূক্ষ্ম অভিক্ষেপের উদ্ভব হয় এবং এটি একটি সমসত্ত্ব *হায়ালাইন স্তর* (Hyaline layer) দ্বারা পরিবৃত হয়। হায়ালাইন স্তর ও ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণের মধ্যবর্তী স্থানটিকে *পেরিভাইটেলাইন স্পেস* (Perivitelline Space) বলে। অভেদ্য ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য হল নিষিক্ত ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে বহু শুক্রাণুর অনুপ্রবেশে বাধা সৃষ্টি করা। এই বাধাদানকে *ব্লক টু পলিস্পার্মি* (Block to Polyspermy) বলে।

2.3.5 প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের পরিযান ও অ্যাম্ফিমিক্সিস

ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর মধ্যে সাইটোপ্লাজমের সেতু স্থাপনের পর সেই সেতুপথে শুক্রাণু ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের মিলন ডিম্বাণুর সক্রিয়তা অর্জনের পরবর্তী ঘটনা। প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের মিলন পদ্ধতি প্রাণীদের ক্ষেত্রে বিভিন্নভাবে সম্পন্ন হয়। আদর্শ উদাহরণ হিসাবে কোলা ব্যাঙের নিষেকে প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের পরিযান ও মিলন পদ্ধতি বর্ণনা করা হল।

শুক্রাণুর মস্তক ও মধ্যমাংশ ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমের মধ্যে অনুপ্রবেশের পর ডিম্বাণুর মিয়োসিস কোষ বিভাজন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হয় এবং সেন্ট্রিওলটির বিলুপ্তি ঘটে। অনুপ্রবেশের পর শুক্রাণুর অংশ 180° তে আবর্তিত হয়। ফলে শুক্রাণুর মধ্যমাংশ অগ্রভাগে এবং নিউক্লিয়াসটি পশ্চাতে অবস্থান করে। শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসটি স্ফীত হয় এবং এর ক্রোমাটিন সূক্ষ্ম কণিকায় পরিণত হয় ও গোলাকার ধারণ করে। উক্ত নিউক্লিয়াসকে *পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াস* (Male Pronucleus) বলে। এই সময় পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসটি ডিম্বাণুর সাইটপ্লাজমের মধ্যে অনিয়তভাবে সঞ্চালিত হয়। এই পরিযানের পথটিকে *পেনিট্রেশন পথ* (Penetration Path) বলে। স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াসটি ডিম্বাণুর পরিধির দিকে চলে যায় এবং পরে মিলন বিন্দুতে ফিরে আসে (চিত্র নং 2.3)। পরে পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসটি নিয়ন্ত্রিতভাবে সঞ্চালিত হয়ে স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াসের কাছে চলে আসে এবং উভয়ে মিলিত হয়। এই মিলন প্রক্রিয়াকে *অ্যাম্ফিমিকসিস* (Amphimixis) বলে। সঞ্চালনে এই পথটিকে *কপুলেশন পথ* (Copulation path) বলে।

অ্যাম্ফিমিকসিসের পরে প্রোনিউক্লিয়াস দু'টি পাশাপাশি সংলগ্ন হয়। পরবর্তীকালে নিউক্লিয়ার মেমব্রেণটি বিলুপ্ত হয় এবং ক্রোমোসোমগুলি সাইটোপ্লাজমে বিস্তৃত হয়ে যায়। এই সময় শুক্রাণুর সেন্ট্রোসোম দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে বিপরীত মেরুতে সজ্জিত হয়। এবং অ্যাস্টার তৈরী করে (চিত্র নং 2.4)। মাইটোসিসের মেটাফেজ দশার ন্যায় ক্রোমোসোমগুলি নিরক্ষীয় তলে অবস্থান করে। এইভাবে নিষেক সমাপ্ত হলে সৃষ্ট জাইগোটটি পরবর্তী দশার জন্য প্রস্তুত হয়।

অনুশীলনী - 1

(A) সঠিক উত্তরটিতে (√) চিহ্ন এবং ভুলটিতে (X) চিহ্ন দিন -

1. পরিণত ডিম্বাণুগাত্র থেকে অ্যান্টিফার্টিলাইজিন নামক রাসায়নিক বস্তু নিঃসৃত হয়।
2. অ্যান্টিফার্টিলাইজিন এক প্রকার আম্লিক প্রোটিন।
3. পরিণত শুক্রাণু থেকে ফার্টিলাইজিন ক্ষরিত হয়।
4. স্পার্মলাইসিন এক প্রকার লাইটিক এজেন্ট।
5. অ্যাক্রোসোম গ্র্যানিউলগুলি থেকে স্পার্মলাইসিন নিঃসৃত হয়।
6. ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণু অনুপ্রবেশে সাহায্য করে।
7. ভিটেলাইন মেমব্রেণ ও ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ একই বস্তুর দু'টি নাম।
৪. স্ত্রী ও পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের মিলন ক্রিয়াকে অ্যাম্ফিমিকসিস বলে।

( ) সঠিক শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

1. নিষেককালে প্রচুর সংখ্যায় শুক্রাণু ______________ ডিম্বাণুর নিকটবর্তী হয় এবং ডিম্বাণু গাত্রে ______________ হয়, এই প্রক্রিয়াকে ______________ বলে।

2. ফার্টিলাইজিন কয়েক প্রকার ______ ______, ও ______ সংযুক্ত থাকে এবং এর আণবিক ওজন ______________ অপেক্ষা বেশী।

3. অ্যাক্রোসোম ফিলামেন্ট ______________ অনুপ্রবেশের পথ সৃষ্টি করে।

4. হায়ালাইন স্তর ও ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণের ______________ স্থানটিকে ______________ স্পেস বলে।

5. স্ত্রী ও পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের ______________ অ্যাম্ফিমিকসিস বলে।

6. মানুষের শুক্রাণুর নিউক্লিয়াসে ______________ এবং জাইগোটে ______________ ক্রোমোসোম থাকে।

7. সী-আর্চিনের ডিম্বাণুর বাইরের ঝিল্লীটিকে ______________ মেমব্রেণ এবং ভেতরেরটিকে ______________ মেমব্রেণ বলে।

8. শুক্রাণু থেকে উৎপন্ন গ্যামোনকে ______________ এবং ডিম্বাণু থেকে সৃষ্ট গ্যামোনকে ______________ বলে।

2.4 নিষেকের তাৎপর্য

(ক) প্রতিটি প্রজাতির নির্দিষ্ট সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। নির্দিষ্ট সংখ্যাটি (2n) (ডিপ্লয়েড) দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। যেমন মানুষের ক্রোমোসোম সংখ্যা হল 46 (23 জোড়া)। স্ত্রী ও পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসে হ্যাপ্লয়েড (n) সংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে। নিষেককালে প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের মিলনের ফলে ডিপ্লয়েড (2n) অবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আত্মোৎপাদনের দ্বারা প্রাণীদের নিজ নিজ প্রজাতির বংশবৃদ্ধি করে।

(খ) শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপাদনকালে নানা ধরণের জীনগত প্রকরণের (Genetic variation) উদ্ভব হয়। নিষেকের সময় শুক্রাণু ও ডিম্বাণু নিউক্লিয়াসদ্বয়ের মিলনের ফলে জীনগত প্রকরণের হার বহুলাংশে বর্ধিত পায়।

(গ) জীবনীশক্তি বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি প্রজাতির উদ্দীপনার প্রয়োজন। নিষেককালে দু'টি জনন-কোষের মিলনের ফলে যে উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় তা প্রজাতিকে পুনরুজ্জীবিত (Rejuvenate) করে।

(ঘ) ক্লিভেজ প্রক্রিয়ার জন্য ডিম্বাণু সক্রিয়তা এবং মাইটোসিস প্রবর্তনের জন্য জাইগোটে ডি. এন. এ. (D.N.A) সংশ্লেষের হার বৃদ্ধি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

2.5 সারাংশ

নিষেককালে শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন ঘটে এবং জাইগোট সৃষ্টি হয়। জাইগোট থেকে ভ্রূণ এবং ভ্রূণের পরিস্ফুরণের দ্বারা ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণ সূচিত হয়। নিষেক একটি জটিল ভৌত-রাসায়নিক প্রক্রিয়া এবং এটি পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয়, যথা - শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর কাছাকাছি আসা, এদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন, ডিম্বাণুর

অভ্যন্তরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ, ডিম্বাণুর সক্রিয়তা অর্জন, স্ত্রী ও পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের মিলন এবং জাইগোট গঠন।

ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশে ফার্টিলাইজিন ও অ্যান্টিফার্টিলাইজিনের সহক্রিয়া তাৎপর্যপূর্ণ এবং অ্যাক্রোসোম গ্রানিউলের সক্রিয়তা উল্লেখ্য। নিষেকের সময় ডিম্বাণুর মধ্যে নানান সংগঠনিক পরিবর্তন সাধিত হয়। পরিবর্তনের মধ্যে ডিম্বাণুর কর্টিক্যাল বিক্রিয়া এবং ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ সৃষ্টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এ ছাড়া প্রাণী প্রজাতির ডিপ্লয়েড (2n) সংখ্যক ক্রোমোসোম সংখ্যা অপরিবর্তিত রাখা, নানা ধরণের জীনগত প্রকরণের উদ্ভব ও প্রজাতিকে পুনরুজ্জীবিত করা নিষেকের মুখ্য উদ্দেশ্য।

2.6 প্রশ্নাবলী

1. নিষেককে ব্যক্তিজনিক পরিস্ফূরণের দ্বিতীয় দশা বলা হয় কেন?
2. নিষেক কয় প্রকার ? উদাহরণসহ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।
3. শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংযোগস্থাপনে ফার্টিলাইজিন ও অ্যান্টিফার্টিলাইজিনের ভূমিকা কি ?
4. ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশে অ্যাক্রোসোম গ্রানিউলগুলি গুরুত্ব কি?
5. নিষেককালে কর্টিক্যাল বিক্রিয়া ও ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ গঠন প্রক্রিয়া চিত্র সহযোগে বর্ণনা করুন।
6. অ্যাম্ফিমিকসিস প্রক্রিয়া চিত্র সহ আলোচনা করুন.
7. নিষেকের তাৎপর্য কি ?
8. কেন একাধিক শুক্রাণু ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না?

2.7 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1

(A) 1 — **(X)**, 2 — **(√)**, 3 — **(X)**, 4 — **(√)**
5 — **(√)**, 6. — **(X)**, 7 — **(X)**, এবং 8 — **(√)**

(B) 1 — পরিণত, যুক্ত, অ্যাগ্লুটিনেশন।
2 — অ্যামাইনো অ্যাসিড, পলিস্যাকারাইড : 82,000
3 — শুক্রাণুর।
4 — মধ্যবর্তী, পেরিভাইটালাইন।
5 — মিলনকে।

6 — 23 টি, 46 টি।

7 — ভিটেলাইন, প্লাজমা।

8 — অ্যাণ্ডোগ্যামোনস্, গাইনোগ্যামোনস্।

প্রশ্নাবলী

1. নিষেক হল শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন। মিলন ক্রিয়ার ফলে উদ্ভূত নিষিক্ত ডিম্বাণু বা জাইগোট থেকে ভ্রূণের সৃষ্টি হয়। ব্যক্তিজনিক পরিস্ফূরণে প্রথম দশা হল শুক্রাণু ও ডিম্বাণু উৎপাদন অর্থাৎ গ্যামেটোজেনেসিস্। শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলন বা নিষেক গ্যামেটোজেনেসিসের পরবর্তী অর্থাৎ দ্বিতীয় দশা।

2. এই প্রশ্নটির উত্তর 2.2 অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

3. শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর সংযোগস্থাপনে ডিম্বাণুর গা থেকে ক্ষরিত ফার্টিলাইজিন এবং শুক্রাণু থেকে নিঃসৃত অ্যান্টিফার্টিলাইজিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ক্ষরিত বস্তু দু'টি অ্যান্টিজেন ও অ্যান্টিবডি বিক্রিয়ার মত প্রজাতি নির্দিষ্ট। ডিম্বাণু থেকে ক্ষরিত ফার্টিলাইজিন ওই প্রজাতির শুক্রাণুগুলিকে সক্রিয় করে এবং পজিটিভ কিমোট্যাকসিস্ দ্বারা ডিম্বাণুগাত্রে আটকে রাখতে সাহায্য করে। নিষেকের সময় বিপরীত ধর্মী গ্যামেট দু'টির সংযোগ স্থাপনে ফার্টিলাইজিন ও অ্যান্টিফার্টিলাইজিন বিক্রিয়া একান্ত প্রয়োজন।

4. পরিণত ডিম্বাণুগাত্র স্পর্শ করবার পর শুক্রাণুগুলির গমন ক্ষমতা বিলুপ্ত হয় এবং ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ অ্যাক্রোসোম বিক্রিয়া দ্বারা সাধিত হয়। নিষেককালে শুক্রাণুর মস্তকাংশ ডিম্বাণুর ভাইটেলাইন মেমব্রেণের সংস্পর্শে আসে। শুক্রাণুর মস্তকাংশের প্লাজমা মেমব্রেণ ও অ্যাক্রোসোম ভেসিকলের মেমব্রেণ পরস্পর যুক্ত হলে এদের মধ্যস্থান ভেঙ্গে যায়। অ্যাক্রোসোম গ্রানিউল থেকে ক্ষরিত স্পার্মলাইসিন উৎসেচক ডিম্বাণুর আবরণকে দ্রবীভূত করে এবং এই পথে শুক্রাণু ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে।

5. এই প্রশ্নটির উত্তর 2.3.4 অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

6. এই প্রশ্নটির উত্তর 2.3.5 অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

7. এই প্রশ্নটির উত্তর 2.4 অংশে আলোচনা করা হয়েছে।

8. নিষেককালে বহু শুক্রাণু ডিম্বাণুর সংলগ্ন হলেও কেবলমাত্র একটি শুক্রাণু ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয় এবং জাইগোট গঠন করে। ডিম্বাণুর প্লাজমা মেমব্রেণের বাইরে একটি বিশেষ আবরণ সৃষ্টি করে। সৃষ্ট আবরণকে ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ বলে। এই আবরণটি ডিম্বাণুর অভ্যন্তরে একাধিক শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ প্রতিহত করে।

একক - 2 -এর চিত্রাবলী ঃ

চিত্র নং 2.1 - নিষেককালে (a-f) অ্যাক্রোসোম বিক্রিয়া ও ডিম্বাণুর মধ্যে শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ : (a) শুক্রাণুর ডিম্বাণুর নিকটবর্তী আসা, (b) ডিম্বাণু আবরণীর সংস্পর্শে আসা শুক্রাণুর শীর্ষে পরিবর্তন, (c) প্রক্ষিপ্ত অ্যাক্রোসোম প্রাচীর, (d) জনন কোষদ্বয়ের প্লাজমা-মেমব্রেণের সংযুক্তি, (e) ফার্টিলাইজেশন কোণের উৎপত্তি ও (f) শুক্রাণুর অনুপ্রবেশ।

চিত্র নং 2.2 - সী-অর্চিনের নিষেককালে কর্টিক্যাল গ্রানিউলের বিস্ফোরণ ও ফার্টিলাইজেশন মেমব্রেণ সৃষ্টি পর্ব। ($1Å = 10^{-1}$ nm)

চিত্র নং 2.3 - নিষেকের সময় স্ত্রী ও পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াস দ্বয়ের সঞ্চালন ও মিলন প্রক্রিয়া

চিত্র নং 2.4 - আর্বোসিয়া নামক প্রাণীর নিষেক।

(a) = ডিম্বাণুর সাইটোপ্লাজমে শুক্রাণুর মস্তক ও মধ্যমাংশের অনুপ্রবেশ, এর 180° আবর্তন (খ) মধ্যমাংশের বিচ্ছিন্ন হওয়া ও অ্যাস্টারের সৃষ্টি (c), পুরুষ প্রোনিউক্লিয়াসের স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াসের দিকে অগ্রসর ও নিষেক (d-e)।

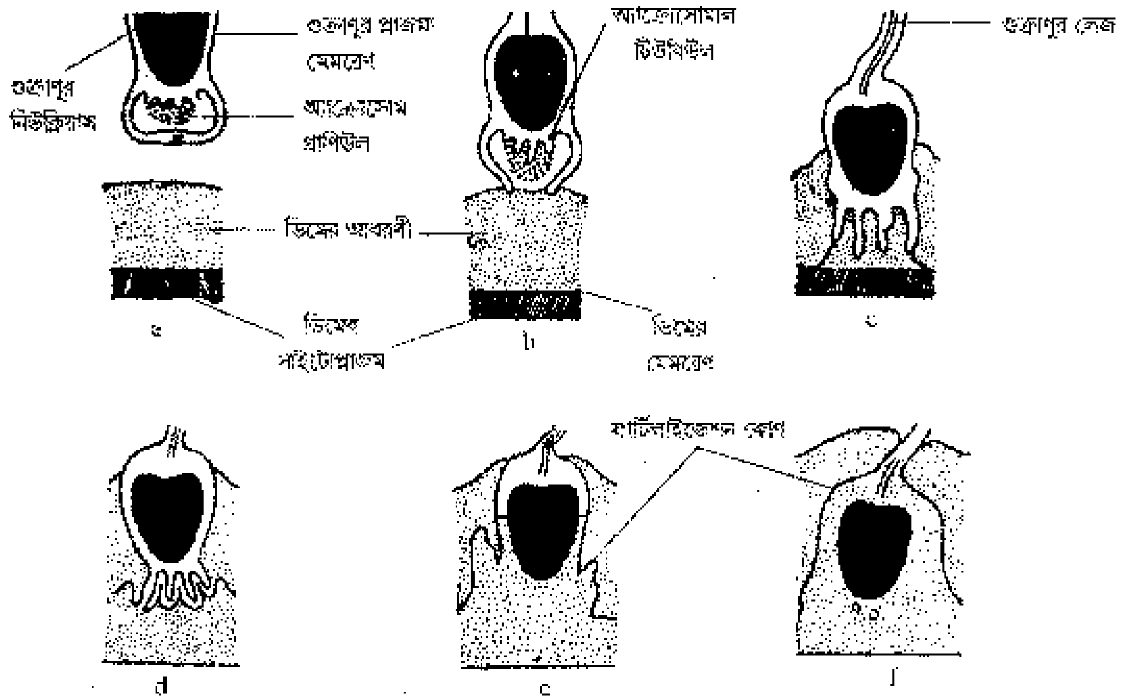

চিত্র নং 2.1

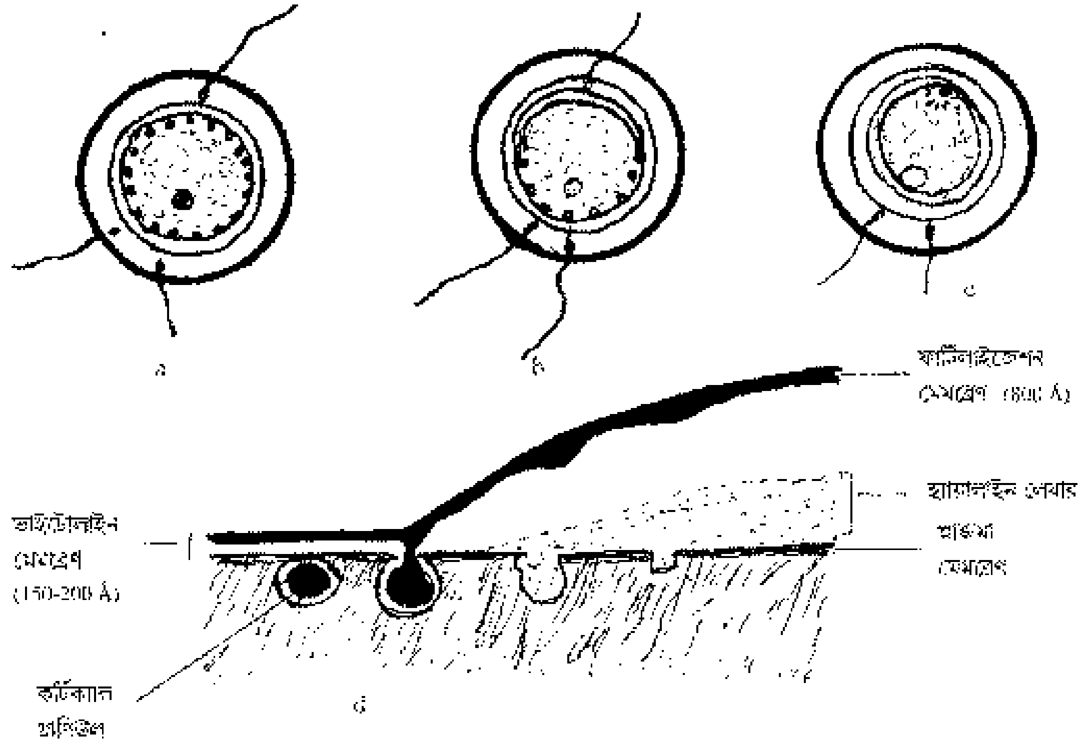

চিত্র নং 2.2

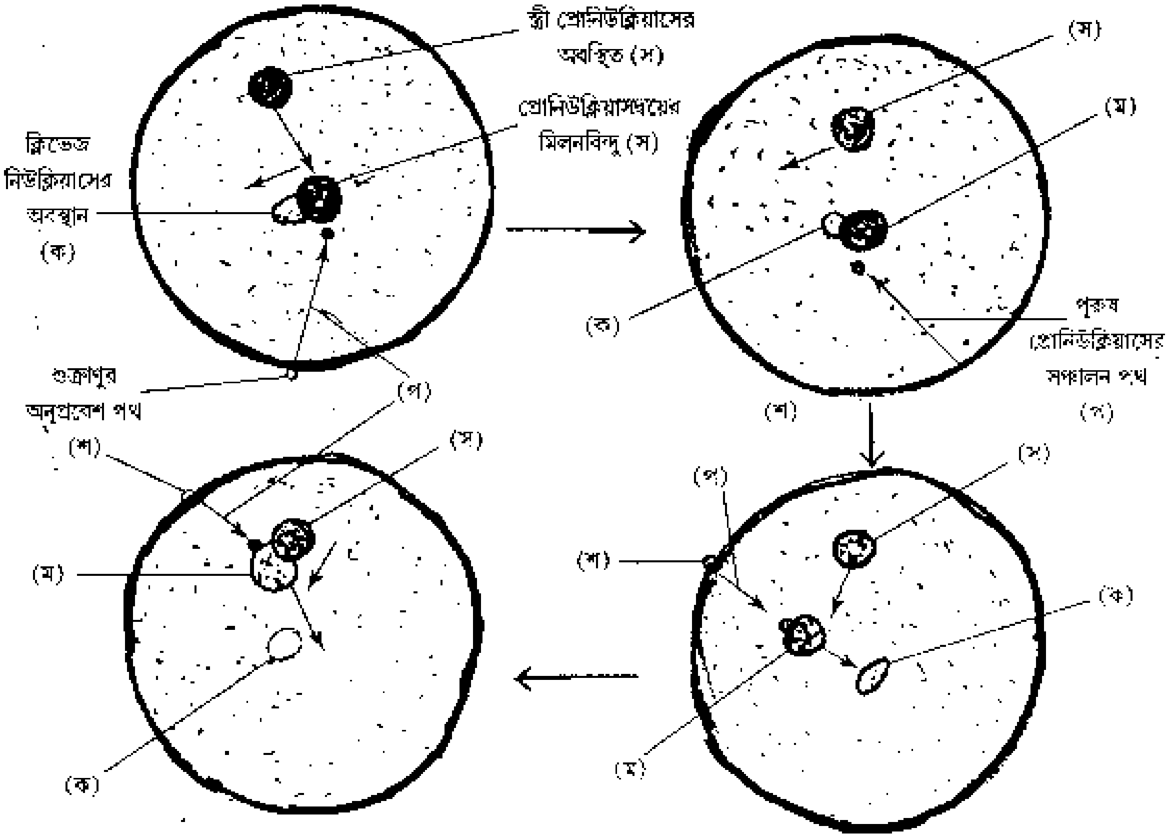
স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াসের
অবস্থিত (স)
প্রোনিউক্লিয়াসদ্বয়ের
মিলনবিন্দু (স)
ক্লিভেজ
নিউক্লিয়াসের
অবস্থান
(ক)
শুক্রাণুর
অনুপ্রবেশ পথ
পুরুষ
প্রোনিউক্লিয়াসের
সঞ্চালন পথ

চিত্র নং 2.3

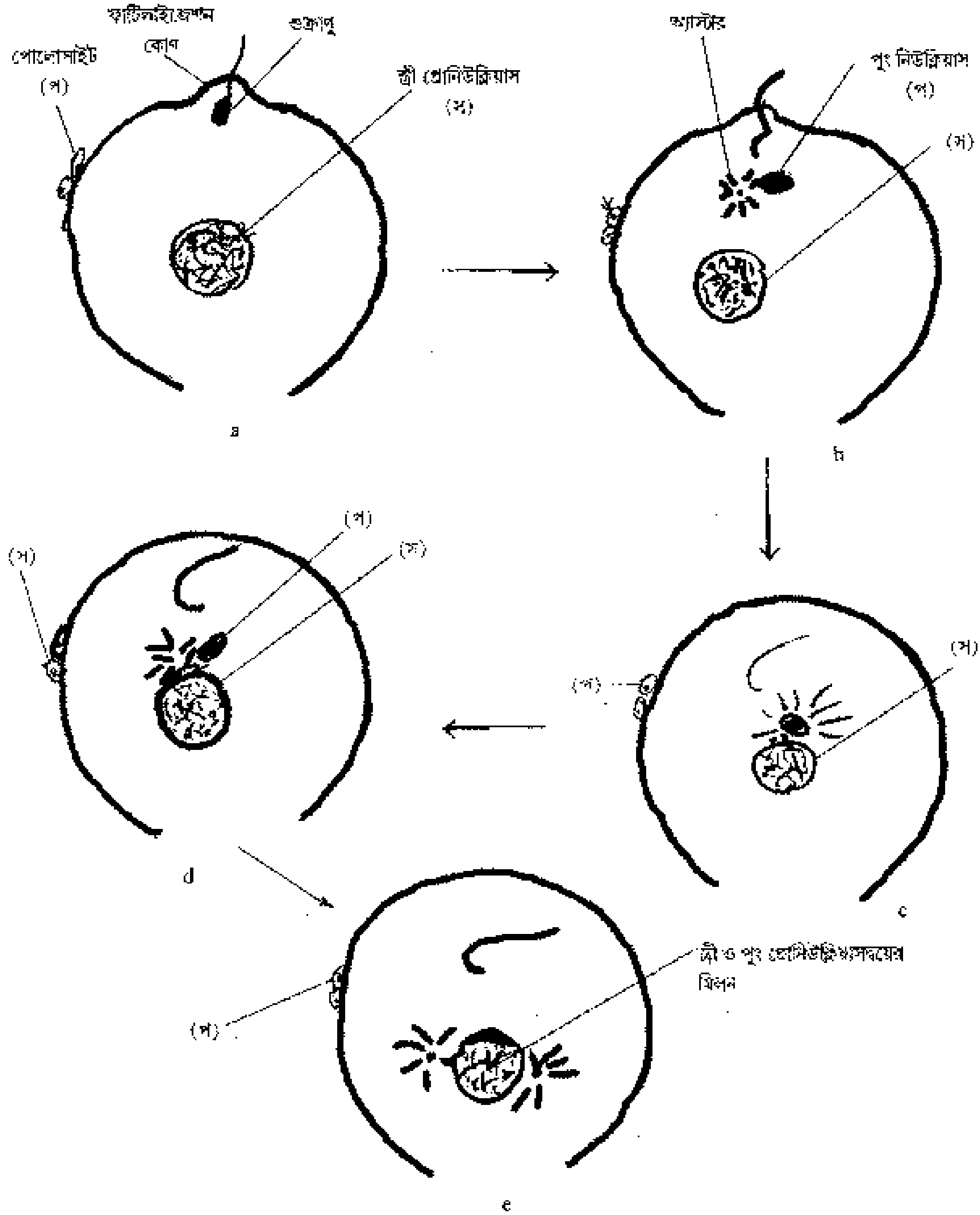
ফার্টিলাইজেশন
কোণ
শুক্রাণু
পোলোসাইট
(প)
স্ত্রী প্রোনিউক্লিয়াস
(স্ত্রী)
a
অ্যাস্টার
পুং নিউক্লিয়াস
(প)
(স)
b
(প)
(স)
c
(প)
(প)
(স)
d
স্ত্রী ও পুং প্রোনিউক্লিয়সদ্বয়ের
মিলন
(প)
e

চিত্র নং 2.4

একক 3 □ ক্লিভেজ (Cleavage)

গঠন

3.1 প্রস্তাবনা

3.2 উদ্দেশ্য

3.3 সংজ্ঞা

3.4 বৈশিষ্ট্য

3.5 কোষ বিভাজনের হার

3.6 ক্লিভেজ চলাকালীন রাসায়নিক পরিবর্তন

3.7 ক্লিভেজে কুসুমের প্রভাব

3.8 ক্লিভেজের তল

3.9 ক্লিভেজের সূত্র

3.10 বিভিন্ন প্রাণীর ক্লিভেজ

3.11 মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্লিভেজের তুলনামূলক তথ্য

3.12 সারাংশ

3.13 প্রশ্নাবলী

3.14 উত্তরমালা

3.1 প্রস্তাবনা

2 নং এককে আপনারা জেনেছেন কিভাবে বহুকোষী প্রাণীদের ডিম নিষিক্ত হয়ে জাইগোট গঠিত হয়। সৃষ্ট জাইগোট এককোষী। কিন্তু এটি পরবর্তী দশায় খুব তাড়াতাড়ি বহুকোষ গঠন করতে সক্ষম হয়। এই কোষগঠন ভ্রূণ তৈরীর প্রাথমিক অবস্থায় খুবই জরুরী এবং বহু বিভাজনের ফলে সৃষ্ট গোলাকার কোষনির্মিত গঠনটিকে ব্লাস্টুলা (Blastula) বলে।

3.2 উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- এককোষী জাইগোটের বহুকোষী ব্লাস্টুলায় রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কি প্রক্রিয়ায় এককোষী জাইগোট বহুকোষী ব্লাস্টুলায় পরিণত হয় তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- জাইগোটের আয়তন বৃদ্ধি না করে এবং কোষের সাইটোপ্লাজমের কোনও স্থানচ্যুতি না ঘটিয়ে কি ভাবে ব্লাস্টুলা তৈরী হতে পারে তা নির্দেশ করতে পারবেন।

3.3 ক্লিভেজের সংজ্ঞা

নিষেকের ফলে উৎপন্ন জাইগোটটি বিভাজিত হতে শুরু করে। এই ক্রমাগত কোষ বিভাজন প্রক্রিয়াকে ক্লিভেজ (Cleavage) বলা হয় এবং এই প্রক্রিয়া ব্লাস্টুলা তৈরীর জন্য অপরিহার্য। উৎপন্ন কোষগুলিকে ব্লাস্টোমিয়ার

(Blastomere) বলে। ব্লাস্টুলার মধ্যস্থ গহ্বরকে ব্লাস্টোসিল (Blastocoel) ও একস্তরে সজ্জিত কোষস্তরটিকে ব্লাস্টোডার্ম (Blastoderm) বলা হয়।

3.4 বৈশিষ্ট্য ঃ

1. এককোষী জাইগোট মাইটোসিস (mitosis) প্রক্রিয়ায় বিভাজিত হয়ে ব্লাস্টুলা তৈরী করে।
2. ব্লাস্টুলার আয়তন জাইগোটের আয়তনের প্রায় সমান হয়।
3. এইসময় সাইটোপ্লাজম নানাভাবে রূপান্তরিত হয়।
4. ক্লিভেজের প্রথম দশায় নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজমের অনুপাত কম থাকে। কিন্তু পরে তা শরীরের অন্যান্য দেহকোষের সমান হয়।
5. ক্লিভেজের জন্য আকৃতির কোনও পরিবর্তন হয় না। কিন্তু এর শেষে একটি গহ্বর বা ব্লাস্টোসিল (Blastocoel) তৈরী করে।

3.5 কোষ বিভাজনের হার (Rate of cleavage)

প্রাথমিক দশায় বিভাজনের হার খুবই দ্রুত হলেও ক্রমশঃ এই হার কমতে থাকে।

ক্লিভেজে কোষ-বিভাজনের বৈশিষ্ট্য (Characteristics of cell division in cleavage) ঃ

যদিও ক্লিভেজে কোষ বিভাজন মাইটোসিস প্রক্রিয়াতেই হয়, তবুও এরসঙ্গে দেহকোষের বিভাজনের কিছু পার্থক্য আছে। যেমন - দেহকোষ বিভাজিত হবার পর অপত্য কোষগুলি (daughter cells) আয়তনে বাড়ে এবং সেগুলি পূর্ণতাপ্রাপ্ত হলে তবেই আবার কোষ -বিভাজন সম্ভব হয়। এজন্য কোষগুলির একটা গড় আয়তন (average size) বজায় থাকে। কিন্তু ক্লিভেজের সময় খুব দ্রুত এবং বারবার কোষবিভাজনের জন্য কোষগুলির আয়তন ক্রমেই ছোট হতে থাকে। ব্রাসে (Brachet, 1950) দেখিয়েছেন যে, সী-আর্চিনের (Sea-urchin) ক্ষেত্রে নিষেকের আগে নিউক্লিয়াস - সাইটোপ্লাজমের আয়তনের আণুপাতিক হার থাকে ঃ

$$\frac{\text{নিউক্লিয়াসের হার}}{\text{সাইটোপ্লাজমের হার}} = 1/550$$

কিন্তু ক্লিভেজের পর এই আণুপাতিক হার দাঁড়ায় 1/6 সমান।

3.6 ক্লিভেজ চলাকালীন রাসায়নিক পরিবর্তন (Chemical changes during cleavage)

কোষ বিভাজনের সঙ্গে সঙ্গে ক্লিভেজের সময় কোষগুলির মধ্যে কিছু রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটতে থাকে; ক্রমাগত সাইটোপ্লাজম থেকে নিউক্লিয় বস্তু তৈরীই শুধু নয়, প্রত্যেকবার বিভাজনের সময় নিউক্লিয়াসের পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়া এবং এইসঙ্গে ক্রোমোজোমের সংখ্যাও DNA পরিমাণ দ্বিগুণ হওয়াও ক্লিভেজের বৈশিষ্ট্য।

1. দেখা গেছে সী আর্চিন ডিম্বাণুতে রাইবোনিউক্লিয়টাইড রিডাকটেজ (ribonucleotide reductase) নামে একটি উৎসেচক প্রচুর পরিমাণে থাকে যার সাহায্যে রাইবোনিউক্লিয়টাইড থেকে ডি অক্সি-রাইবোনিউক্লিয়টাইড তৈরী হতে পারে।

2. এই সময় প্রোটিন সংশ্লেষমাত্রা অনেক বৃদ্ধি পায়। অপত্য কোষগুলিতে হিস্টোন (Histone) ও DNA পলিমারেজ (DNA Polymerase) প্রোটিনের পরিমাণও বেশী থাকে। এগুলি ক্রোমোসোমের অনুলিপি (Chromosome replication) সৃষ্টিতে দরকারী। এছাড়াও বেমতন্তু (spindle fibre) তৈরীর জন্য প্রয়োজনী টিবিউলিন (Tibulin) প্রোটিনের পরিমাণও বাড়ে।

3. ক্লিভেজের সময় RNA সংশ্লেষ একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কোষগুলিতে এইসময় rRNA না থাকলেও mRNA ও tRNA সংশ্লেষ হতে দেখা যায়।

3.7 ক্লিভেজে কুসুমের প্রভাব (Effect of Yolk on cleavage):

ডিমে কুসুমের পরিমাণ ক্লিভেজ প্রক্রিয়া ও ক্লিভেজের প্রকৃতি ও হারের (rate) ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। কোষ বিভাজনের সময় সাইটোপ্লাজম, নিউক্লিয় বস্তু বিভাজনের সঙ্গে কুসুমদানাও ব্লাস্টোমিয়ারে সমপরিমাণে ভাগ হয়। কোষে কুসুমের পরিমাণ বেশী হলে ক্লিভেজ প্রক্রিয়াও ধীরে হয় বা কোনও কোনও ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যায়।

কুসুম পদার্থের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে কয়েক ধরণের ক্লিভেজ প্রক্রিয়া দেখা যায়। যে ডিম কুসুমহীন বা যার ডিমে অত্যন্ত অল্প কুসুম থাকে সেখানে ক্লিভেজের ধরণ সমান হলোব্লাস্টিক (equal holoblastic)। ডিমের মধ্যে কুসুম অনেকটা অংশে থাকায় অনেক সময় ক্লিভেজ খাত সমস্ত ডিমকে সমানভাবে ভাগ করতে পারে না। ফলে পরবর্তীকালে অসম কোষের সৃষ্টি হয়। এই ক্লিভেজকে অসমান হলোব্লাস্টিক (unequal holoblastic) ক্লিভেজ বলে।

1. সম্পূর্ণ বিভাজন (Holoblastic cleavage or Total cleavage) ঃ এখানে একটি ব্লাস্টোমিয়ার সম্পূর্ণভাবে দু'ভাগ হয়। এটি দু' প্রকার ঃ -

   ক) *সম-সম্পূর্ণ (equal) বিভাজন* ঃ এটি *মাইক্রোলেসিথাল* (microlecithal) ডিমে দেখা যায় এবং এখানে সমান আয়তনের কোষ তৈরী হয়।

   খ) *অসম-সম্পূর্ণ (unequal) বিভাজন* ঃ এটি *মেসোলেসিথাল* (mesolecithal) ডিমের ক্ষেত্রে দেখা যায়। সব ব্লাস্টোমিয়ারগুলি আয়তনে সমান হয় না-ছোট আকারের গুলিকে *মাইক্রোমিয়ার* (micromere) ও বড় আকারের গুলিকে *ম্যাক্রোমিয়ার* (macromere) বলে।

2. **আংশিক বিভাজন (Partial cleavage)** ঃ ডিমের কিছু অংশ অ-বিভাজিত থাকে। এটি ম্যাক্রোলেসিথাল macrolecithal) ডিমে দেখা যায়।

3. **অসম্পূর্ণ বিভাজন (Meroblastic cleavage)** ঃ এক্ষেত্রে বিভাজন শুধুমাত্র ব্লাস্টোমিয়ারের এনিমাল পোলের সাইটোপ্লাজমের একটি ছোট অংশে ঘটে। এই বিভাজিত অংশকে *ব্লাস্টোডিস্ক* (blastodisc) বলে। কোষের বাকী অংশ কুসুমপূর্ণ থাকায় সেখানে বিভাজন হতে পারে না। *টিলোলেসিথাল* (Telolecithal) ডিম আছে এমন প্রাণী যেমন হাঙর, সরীসৃপ, পাখী আর হংসচঞ্চুতে অসম্পূর্ণ বিভাজন দেখা যায়।

3.8 ক্লিভেজের তল (Planes of cleavage) :

কোষ বিভাজনের জন্য ক্লিভেজের তল নির্ধারণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ডিম্বাণুর কর্টেক্সে (Cortex) তলের ধরণ স্থির করার উপাদান মজুত থাকে। এই উপাদান কোষ বিভাজনের সময় মাইক্রোটিবিউল (microtubule) ও অ্যাস্টারের রশ্মির (aster fibres) বিক্রিয়ায় সাহায্য করে এবং কোষে বেমতন্তুর অবস্থান নির্ণয় করে। র‍্যাপাপোর্ট (Rappaport, 1978) অবশ্য দেখিয়েছেন যে অ্যাস্টার রশ্মি ক্লিভেজ খাত গঠনে বেমতন্তুর থেকে অনেক বেশী কার্যকরী। কারণ বেমতন্তু ও ডিম্বাণুর কর্টেক্সের মধ্যের সাইটোপ্লাজমে দ্রুত সঞ্চালন সৃষ্টিতে ক্লিভেজ খাত গঠনে কোনও অসুবিধা হয় না কিন্তু অ্যাস্টার রশ্মি তৈরীর আগে যদি এই সঞ্চালন সৃষ্টি হয়, তবে দেরীতে মাইটোটিক এ্যাপারেটাস (mitotic apparatus) তৈরী হয় আর ক্লিভেজতলও গঠিত হয় না।

ব্লাস্টোমিয়ার তৈরীর সময় বিভিন্ন তলের ক্লিভেজ-খাত (cleavage furrow) জাইগোটকে খণ্ড-বিখণ্ড করে। এই ক্লিভেজের খাতগুলি ঃ -

1. *মধ্যতল (Meridional cleavage)* ঃ এই বিভাজনের ফলে এ্যানিম্যাল ভেজিটাল অক্ষ বরাবর অর্থাৎ ডিমের মধ্যতল (meridian) দিয়ে সমানভাবে দু-খণ্ডে বিভক্ত হয়।
2. *লম্বতল (Vertical cleavage)* ঃ এই বিভাজন ডিমের এ্যানিম্যাল-ভেজিটাল অক্ষ বরাবর ঘটলেও কখনই ডিমের মধ্যতল দিয়ে প্রসারিত হয় না। মধ্যতলের ডান অথবা বাঁ ভাগ দিয়ে ঘটে থাকে।
3. *নিরক্ষীয় তল (Equatorial cleavage)* ঃ এই প্রক্রিয়ায় ব্লাস্টোমিয়ার এ্যানিম্যাল ও ভেজিটাল পোলের মাঝের নিরক্ষরেখা ধরে দ্বিখণ্ডিত হয়।
4. *অক্ষাংশীয় (Latitudinal cleavage)* ঃ কোষের বিভাজন নিরক্ষরেখার ওপর বা নীচ বরাবর ঘটে থাকে।

3.9 ক্লিভেজের সূত্র (Laws of cleavage) :

ক্লিভেজ ঘটনাটি কতকগুলি সূত্র দিয়ে নিয়ন্ত্রিত হয়।

1. *স্যাকস-এর সূত্র (Sach's rules)* ঃ
   a) কোষগুলি বিভক্ত হয়ে সমান অপত্য কোষ তৈরী করে।
   b) প্রত্যেকবার কোষ বিভাজনের তল তার আগের কোষ বিভাজনের তলটির সমকোণ বরাবর হয়ে থাকে।
2. *হার্টউইগ-এর সূত্র (Hertwig's law)* ঃ-
   ক্লিভেজের সময় কোষের সাইটোপ্লাজমের ওপর নিউক্লিয়াস প্রভাব বিস্তার করে।
3. *বালফোর-এর সূত্র (Balfour's law)* ঃ
   ডিমের কুসুম থাকা বা না থাকার ওপর ক্লিভেজের হার ও ধরণ নির্ভর করে।

3.10 বিভিন্ন প্রাণীর ক্লিভেজ (cleavage in different animals) :

বোঝার সুবিধার জন্য এখানে কতকগুলি শুধু মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্লিভেজ বর্ণনা করা হল।

3.10.1 এ্যামফিঅক্সাসের ক্লিভেজ (cleavage in Amphioxus) :

এই প্রাণীর ডিমে কুসুমের পরিমাণ খুবই কম থাকে এজন্য এর পূর্ণ বা হলোব্লাস্টিক ক্লিভেজ হয় এবং নিষেকের 1 ঘন্টার মধ্যেই এই বিভাজন শুরু হয়।

প্রথম ক্লিভেজ : এ্যানিমাল -ভেজিটাল অক্ষ বরাবর ডিমের মধ্যতল দিয়ে ঘটে। ফলে জাইগোটটি দুটি সমান কোষে বিভক্ত হয়।

দ্বিতীয় ক্লিভেজ : প্রথম ক্লিভেজের এক ঘন্টা পর কোষ দুটি আবার প্রথম ক্লিভেজের সঙ্গে সমকোণ করে মধ্যতলেই ঘটে। ফলে চারটি সমান ব্লাস্টোমিয়ার সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় ক্লিভেজ : এটি কোষগুলির অর্থাংশ বরাবর বিষুবরেখার কিছু ওপর দিয়ে হয়ে থাকে (latitudinal)। ফলে এ্যানিমাল মেরুতে চারটি অপেক্ষাকৃত ছোট মাইক্রোমিয়ার (micromere) ও ভেজিটাল মেরুতে চারটি বড় ম্যাক্রোমিয়ার (macromere) কোষ তৈরী হয়।

চতুর্থ ক্লিভেজ : বিভাজনটির সময় সব কোষগুলি লম্বালম্বি মধ্যতল বরাবর বিভক্ত হয়ে আটটি মাইক্রোমিয়ার, আটটি ম্যাক্রোমিয়ার সৃষ্টি করে।

পঞ্চম ক্লিভেজ : এটি অক্ষাংশ বরাবর বিষুবরেখার দুই পাশেই হয়ে থাকে, ফলে দুইস্তর মাইক্রোমিয়ার (13 টি কোষযুক্ত) আর দুইস্তর (16 টি কোষ) ম্যাক্রোমিয়ার তৈরী হয়। এই ক্লিভেজের শেষে মোট 32 টি কোষ সৃষ্টি হয়।

পঞ্চম বিভাজনের পর ক্লিভেজের কোষ বিভাজন ক্রমশঃ অনিয়মিত হতে থাকে।

ষষ্ঠ বিভাজনটি মধ্যতল বরাবর হয়। উৎপন্ন কোষগুলি মেরু বরাবর আটটি স্তরে সাজানো থাকে। এই সময় ব্লাস্টোমিয়ারগুলির মধ্যে একটি ছোট গর্ত তৈরী হয়। এটি ব্লাস্টোসিল (Blastocoel)। এই গর্ত বড় হওয়ার সঙ্গে এটি জলীয় বস্তুতে পূর্ণ হয়। গর্তযুক্ত ব্লাস্টোমিয়ারের বলকে ব্লাস্টুলা (Blastula) বলে (চিত্র নং 3.7a)।

3.10.2 ব্যাঙ-এর ক্লিভেজ (cleavage in Toad) :

ব্যাঙের ডিম মেসোলেসিথাল আর এর ভেজিটাল মেরুতে কুসুম থাকে। এই প্রাণীর এ্যানিমাল আর ভেজিটাল মেরুর সন্নিকটে একটি ধূসর রঙের কাস্তে আকারের অংশ দেখা যায়। এটিকে গ্রে ক্রিসেন্ট (Grey Crescent) বলে। ব্যাঙে পূর্ণ বা হলোব্লাস্টিক ক্লিভেজ দেখা যায়। নিষেকের আড়াই ঘন্টার মধ্যেই ক্লিভেজ আরম্ভ হয়।

প্রথম ক্লিভেজ : জাইগোটটি মেরু বরাবর কোষের মধ্যতলদিয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়।

দ্বিতীয় ক্লিভেজ : প্রথম বিভাজনের 45 মিনিট পর শুরু হয়। এটিও মধ্যতল বরাবর হয়। কিন্তু প্রথম ক্লিভেজের সঙ্গে সমকোণে কোষগুলি বিভক্ত হয়। এর ফলে চারটি সমান কোষ সৃষ্টি হয়।

তৃতীয় ক্লিভেজ : দ্বিতীয় ক্লিভেজ শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গেই এই বিভাজন শুরু হয়। এটি অক্ষাংশ-তলীয় হয় এবং কোষগুলির বিষুবরেখার কিছু ওপর দিয়ে বিভাজন হয়ে থাকে। এরফলে এ্যানিমাল মেরুতে চারটি মাইক্রোমিয়ার ও ভেজিটাল মেরুতে চারটি ম্যাক্রোমিয়ার উৎপন্ন হয়।

চতুর্থ ক্লিভেজ : এই বিভাজনের খাতটি মধ্যতলীয়। কিন্তু অ্যানিমাল মেরুর কোষ বিভাজনের হার ভেজিটাল মেরুর কোষগুলির তুলনায় অনেক দ্রুত। অর্থাৎ এই সময় থেকেই কোষ বিভাজনের হারের ওপর কুসুমের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। এই বিভাজনের শেষে এ্যানিমাল ও ভেজিটাল মেরুর প্রত্যেকটিতে আটটি কোষ তৈরী হয়।

পঞ্চম ক্লিভেজ : এটি অক্ষাংশ বরাবর হয়ে থাকে। এই বিভাজনের শেষে চারস্তরের মোট 32 টি কোষ সৃষ্টি হয় এবং প্রত্যেকটি স্তরে 8 টি কোষ থাকে।

এর পরের বিভাজনগুলি ক্রমশঃ অনিয়মিত হতে থাকে। ব্যাঙের ক্ষেত্রেও কোষগুলির মধ্যে গর্ত সৃষ্টি হয় এবং বলের আকারে উৎপন্ন কোষগুচ্ছকে ব্লাস্টুলা বলে (চিত্র নং 3.1, 3.7b)।

3.10.3 মুরগীর ক্লিভেজ (cleavage in Chick) :

মুরগীর ডিম টিলোলেসিথাল-এজন্য এদের অসম্পূর্ণ (meroblastic) ক্লিভেজ হয়ে থাকে। ডিম নিষিক্ত হবার সাড়ে 4 ঘন্টার মধ্যে বিভাজন শুরু হয়। এই বিভাজন এ্যানিমাল মেরু 3.5 - 4 মিলিমিটার ব্যাসযুক্ত অঞ্চলের (যেখানে নিউক্লিয়াস ও অল্প সাইটোপ্লাজম থাকে) মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। এই অঞ্চলকে ব্লাস্টোডিস্ক (blastodisc) বলে। এই কারণে মেরোব্লাস্টিক বিভাজনকে ডিস্কয়ডাল ক্লিভেজ ও (discoidal cleavage) বলা হয়ে থাকে।

প্রথম বিভাজন : মধ্যতল বরাবর হয়ে থাকে। এই ক্লিভেজ খাত ব্লাস্টোডিস্কের মাঝখানে একটি খাঁজের সৃষ্টি করে এবং বিভাজন ব্লাস্টোডিস্কের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে।

দ্বিতীয় বিভাজন : এটিও মধ্যতলীয়, তবে প্রথম ক্লিভেজ তলটিকে সমকোণে বিভক্ত করে। এরফলে চারটি ব্লাস্টোমিয়ার তৈরী হয়।

তৃতীয় বিভাজন : এটি লম্বতল বরাবর প্রথম বিভাজন তলের সঙ্গে সমান্তরালভাবে হয়ে থাকে। এই বিভাজনের ফলে আটটি ব্লাস্টোমিয়ার সৃষ্টি হয়।

চতুর্থ বিভাজন : এটি লম্বতলে ঘটলেও কোষ বিভাজন এমনভাবে হয় যাতে 4 টি কেন্দ্রীয় (central cells) ও 12 টি প্রান্তীয় (marginal cells) কোষের সৃষ্টি হয়। কেন্দ্রের কোষগুলির নীচে সীমানা না থাকায় এগুলি কুসুমের ওপর বিস্তৃত থাকে।

চতুর্থ বিভাজনের পর মুরগীর ক্লিভেজ অনিয়মিত হয়। ব্লাস্টোডিস্কের পরিধির দিকে খুব ঘন ঘন (frequent) খাঁজ সৃষ্টি হবার জন্য কেন্দ্রের কোষ সংখ্যায় বাড়ে আর এরা ক্রমশঃ পরিধির দিকে সরে যায়। এইভাবে সমস্ত ব্লাস্টোমিয়ার একসঙ্গে গোলাকার চাকতির মতন সৃষ্টি করে। এটিকে *ব্লাস্টোডার্ম* (blastoderm) বলে।

মুরগীর ব্লাস্টোডিস্কের ওপরের তলের ক্লিভেজের সঙ্গে আরও এক ধরণের ক্লিভেজে খাত দেখা যায়। এগুলি ওপরের তলের নীচে, কিন্তু ওপরের তলের সঙ্গে সমান্তরাল ভাবে হয়ে থাকে। এরফলে ওপরের তলটি একস্তর যুক্ত হয়, এর নীচে আর একটি কোষস্তর থাকে এবং এটির ঠিক নীচেই থাকে কুসুম। এইবার কোষ বিভাজনের ফলে ওপরের তলে অনেক কোষস্তর সৃষ্টি হয়। কিন্তু একেবারে প্রান্তের কোষগুলি (যেখানে ব্লাস্টোডার্ম পেরিব্লাস্টে মিলেছে) একস্তর যুক্তই থাকে আর এই কোষগুলির সঙ্গে কুসুমেরও যোগ থাকে। এই অঞ্চলকে জোন অব

জাংশন (Zone of junction) বলে। ক্রমাগত কোষ বিভাজনের জন্য ভ্রূণ যখন প্রায় 100 কোষযুক্ত হয়, তখন ব্লাস্টোডার্মের নীচে একটা ফাটল দেখা যায়। এই ফাটলটি ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং এটি তরল পদার্থে ভর্তি থাকে। এই তরলযুক্ত ফাটলটি *সাবজার্মিনাল গহ্বর* (sub germinal cavity) ।

আরও কিছু কোষবিভাজন হবার পর ব্লাস্টোডিস্কের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সাব জার্মিনাল গহ্বরের ওপরের কোষগুলি কুসুমের থেকে আলাদা হয়ে যায়। এই স্বচ্ছ অংশকে *পেলুসিডা এলাকা* (area pellucida) আর চারপাশের অস্বচ্ছ অংশকে *ওপেকা অঞ্চল* (area opeca) বলে। ওপেকা অঞ্চলের কোষগুলি কুসুমস্তরের ওপরেই থাকে।

নিষিক্ত ডিম জরায়ুতে পৌঁছানোর প্রায় 12-14 ঘন্টা পর ব্লাস্টোডার্মের নীচের থেকে কুসুমযুক্ত কিছু কোষ আলাদা হয়ে সাব জার্মিনাল গহ্বরে খসে পড়ে। যে কোষগুলি এখনও ব্লাস্টোডার্মের ওপরের স্তরে থাকে তাদের মধ্যে কুসুম কম থাকে। অপেক্ষাকৃত কুসুমযুক্ত কোষগুলি ব্লাস্টোডার্মের যে অংশ থেকে বিচ্যুত হতে থাকে, ভবিষ্যতে সেটিই ভ্রূণের পশ্চাৎ সীমানা (tail end) হিসাবে চিহ্নিত হয়। ক্রমে এই কোষগুলি পরস্পরের সঙ্গে মিলে একটি স্তর তৈরী করে। এটিই *হাইপোব্লাস্ট* (hypoblast)। হাইপোব্লাস্ট স্তরটি ব্লাস্টোডার্মের ওপরের স্তর থেকে একটি সংকীর্ণ গহ্বর দিয়ে আলাদা করা থাকে। এই গহ্বরটিকে *ব্লাস্টোসিল* (blastocoel) বলে (চিত্র নং 3.2, 3.6, 3.7c)।

3.10.4 খরগোসের ক্লিভেজ (cleavage in Rabbit) :

খরগোসের ডিমে কুসুম প্রায় নেই বললেই চলে--- এজন্য এটি *সেকেণ্ডারী মাইক্রোলেসিথাল* (secondary microlecithal) এবং এর ক্লিভেজ *পূর্ণ বা হলোব্লাস্টিক*।

প্রথম বিভাজন : এটি লম্বতল বরাবর (vertical) হয় ও 2 টি অসমান কোষ সৃষ্টি করে।

দ্বিতীয় বিভাজন : ক্লিভেজ লম্ব -মধ্যতল বরাবর এবং প্রথম ক্লিভেজের সমকোণে সংঘটিত হয়। ফলে চারটি অসমান ব্লাস্টোমিয়ার তৈরী হয়।

তৃতীয় বিভাজন : বিষুব অঞ্চলের ওপর অনুভূমিক ভাবে (horizontal) হয়ে থাকে।

এর পরের সব ক্লিভেজই অনিয়মিত। ক্রমাগত বিভাজনের ফলে একগুচ্ছ কোষের সৃষ্টি হয়। এই দশাকে মরুলা (morula) বলে কারণ এটা দেখতে তুঁতফলের (mulberry) মতন। ক্রমশঃ মরুলায় দুই ধরণের কোষ দেখা যায়। বাইরের স্তরের কোষগুলিকে ট্রফোব্লাস্ট (trophoblast) ও ভিতরের কোষগুলিকে ইনার সেল মাস (inner cell mass) বলে। মরুলার বৃদ্ধির সঙ্গে কোষগুলির মধ্যে তরলপূর্ণ গহ্বরের সৃষ্টি হয়। এই অবস্থাকে ব্লাস্টোসিস্ট (blastocyst) এবং এরমধ্যের তরলপূর্ণ অঞ্চলকে ব্লাস্টোসিল (blastocoel) বলে। ব্লাস্টোসিল ক্রমশঃ আয়তনে বাড়ে। এরফলে ইনার সেল মাস একপাশে সরে যায় এবং ব্লাস্টোসিল ঘিরে একসারি ট্রফোব্লাস্ট কোষ দেখা যায়। ইনার সেল মাসের ওপরের ট্রফোব্লাস্ট স্তরটিকে রাউবার বর্ণিত কোষ (Cells of Rauber) বলে। ক্রমে ব্লাস্টোসিলের আয়তন আরও বাড়ার সঙ্গে ইনার সেল মাস ব্লাস্টোসিলের এক কোণে গুটি বা (Knob) আকারে সজ্জিত থাকতে দেখা যায়। এটিকে *ভ্রূণগুটি* (embryonic Knob) বলে (চিত্র নং 3.3, 3.4, 3.7d)।

এই অবস্থায় খরগোসের ভ্রূণ মাতার জরায়ুর সঙ্গে ট্রফোব্লাস্টের সাহায্যে যুক্ত হয় ও অমরা তৈরী করে (চিত্র নং 3.5)।

3.11 মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্লিভেজের তুলনামূলক তথ্য ঃ

	এ্যাম্ফিঅক্সাস	ব্যাঙ	মুরগী	খরগোস
ডিম	মাইক্রোলেসিথাল	মেসোলেসিথাল	টেলোলেসিথাল	সেকেণ্ডারী মাইক্রোলেসিথাল
ক্লিভেজ	হলোব্লাস্টিক-সমসম্পূর্ণ	হলোব্লাস্টিক-অসমসম্পূর্ণ	মেরোব্লাস্টিক- অসম্পূর্ণ	হলোব্লাস্টিক-অসমসম্পূর্ণ
প্রথম বিভাজন	মধ্যতল বরাবর	মধ্যতল বরাবর	মধ্যতল বরাবর ব্লাস্টোডিস্কে সীমিত	লম্বতল বরাবর
দ্বিতীয় বিভাজন	মধ্যতল বরাবর	মধ্যতল বরাবর	মধ্যতল বরাবর ব্লাস্টোডিস্কে সীমিত	লম্বতল বরাবর
তৃতীয় বিভাজন	বিষুবরেখার ওপর	বিষুবরেখার ওপর	বিষুবরেখার ওপর	বিষুবরেখার ওপর
চতুর্থ বিভাজন	মধ্যতল বরাবর	মধ্যতল বরাবর	লম্বতল বরাবর	ক্লিভেজ - অনিয়মিত
পঞ্চম বিভাজন	অক্ষাংশে	অক্ষাংশে	অনিয়মিত	ক্লিভেজ - অনিয়মিত
ষষ্ঠ বিভাজন	অনিয়মিত	অনিয়মিত	অনিয়মিত	ক্লিভেজ - অনিয়মিত
ব্লাস্টুলা	গোলাকার একস্তরযুক্ত কোষ দিয়ে গঠিত	গোলাকার মাইক্রোমিয়ার ও ম্যাক্রোমিয়ার কোষস্তর যুক্ত	চাকতির মত-শুধুমাত্র এ্যানিমাল পোলে সীমিত	গোলাকার
ব্লাস্টোসিল	ব্লাস্টুলার কেন্দ্রে বড় গোলাকার গহ্বর	গহ্বর -গোলাকার, ছোট এ্যানিমাল পোলের দিকে ন্যস্ত	চ্যাপ্টা গহ্বর, এপিব্লাস্ট ও হাইপোব্লাস্টের মধ্যে সীমিত	গোলাকার

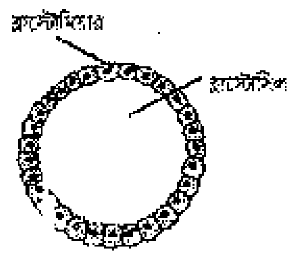

এ্যাম্ফিঅক্সাসের ব্লাস্টুলা

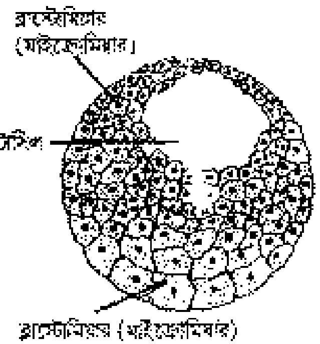

ব্যাঙের ব্লাস্টুলা

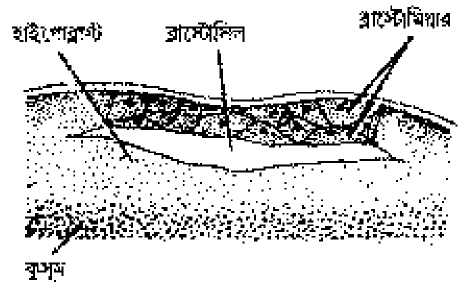

মুরগীর ব্লাস্টুলা

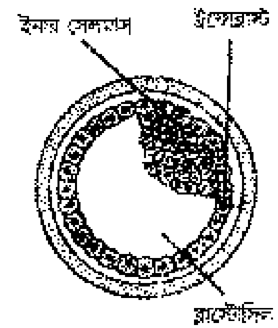

খরগোসের ব্লাস্টুলা

3.12 সারাংশ ঃ

নিষেকের পরই ডিম্বাণু দু'কোষ বিভক্ত হয়। উৎপন্ন কোষ দু'টি এরপর ক্রমাগত বিভক্ত হয়ে বহুকোষী গোলকের সৃষ্টি করে। নিষিক্ত ডিম্বাণুর বিভাজন প্রক্রিয়াকে ক্লিভেজ এবং এরফলে সৃষ্ট গোলককে ব্লাস্টুলা বলে। ব্লাস্টুলার ভিতরে তরলপূর্ণ ব্লাস্টোসিল থাকে।

ক্লিভেজে ভ্রূণের আয়তন না বাড়াতেও কোষসংখ্যা খুব দ্রুতহারে বাড়তে থাকে। ফলে, উৎপন্ন কোষগুলির আয়তন ক্রমশঃ কমতে থাকে ও কোষের সাইটোপ্লাজম নিউক্লিয় বস্তুতে রূপান্তরিত হয়। ডিমের কুসুম ক্লিভেজের ওপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করে। কুসুম ডিমের যে মেরুতে থাকে তাকে ভেজিটাল মেরু ও কুসুমহীন মেরুকে এনিমাল মেরু বলে। কুসুমের পরিমাণের ওপর নির্ভর করে ডিম্বাণু যথাক্রমেঃ

1. কম কুসুমযুক্ত মাইক্রোলেসিথাল - এ্যমফিয়কসাস
2. অপেক্ষাকৃত বেশী কুসুমযুক্ত - মেসোলেসিথাল - ব্যাঙ
3. ঘন কুসুমযুক্ত - টিলোলেসিথাল - পাখী, সরীসৃপ।

ব্লাস্টুলেশনের সময় ক্লিভেজখাত বিভিন্ন তলে হয়। যেমন - মধ্যতল, লম্বতল, নিরক্ষীয় তল ও অক্ষাংশীয় তল।

কুসুমের পরিমাণের ভিত্তিতে ক্লিভেজ কয়েক প্রকার।

1. সম্পূর্ণ বা হলোব্লাস্টিক (সমান বা অসম)। এটি অল্প কুসুমযুক্ত প্রাণীর ক্ষেত্রে দেখা যায়।
2. ঘন কুসুমযুক্ত ডিমে অসম্পূর্ণ বা মেরোব্লাস্টিক ক্লিভেজ দেখা যায়। এদের ডিমের কুসুমের উপর অবস্থিত নিউক্লিয়াস ও সাইটোপ্লাজম সম্বলিত একটি ছোট্ট চাকতির মধ্যে বিভাজন নির্দিষ্ট থাকে। এটিকে ব্লাস্টোডিস্ক বলে।

অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর সঙ্গে খরগোসের ক্লিভেজের কিছু পার্থক্য আছে। এখানে প্রথম থেকে অসমকোষ বিভাজন দেখা যায় ও ক্লিভেজের ফলে বাইরে ট্রফোব্লাস্ট ও ভিতরে ইনার সেল মাস তৈরী হয়।

ক্লিভেজ চলার সময় জাইগোট ক্রমশঃ গুচ্ছকারে সজ্জিত একটি নিরেট কোষ-বলের আকার ধারণ করে। একে মরুলা বলা হয়। ক্রমে এটি তরলপূর্ণ হয় ও গহ্বর যুক্ত কোষ গোলককে ব্লাস্টুলা বলে।

3.13 প্রশ্নাবলী

1. **সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ**

   (i) ক্লিভেজে কোষ বিভাজনের বৈশিষ্ট্য কি ?

   (ii) ক্লিভেজে কোষে রাসায়নিক পরিবর্তন বিবৃত করুন।

   (iii) কুসুমের পরিমাণ অনুযায়ী ক্লিভেজের প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

   (iv) ব্লাস্টোডিস্ক কি ?

   (v) মরুলা ও ব্লাস্টুলার মধ্যে পার্থক্য কি ?

   (vi) ব্লাস্টোসিল কাকে বলে ?

2. **দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

   (i) কুসুমবস্তুর পরিমাণ ও অবস্থান কিভাবে মুরগীর ক্লিভেজ প্রক্রিয়া নির্ধারণ করে বর্ণনা দিন।

   (ii) খরগোসের ক্লিভেজ প্রক্রিয়ার বর্ণনা দিন।

   (iii) মেরুদণ্ডী প্রাণীর ক্লিভেজের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

   (iv) হলোব্লাস্টিক ও মেরোব্লাস্টিক ক্লিভেজের তুলনামূলক আলোচনা করুন।

3. **শূণ্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

   (i) ক্লিভেজে প্রত্যেকটি কোষকে ______________ বলে।

   (ii) কুসুমবস্তু ডিমের যে অঞ্চলে থাকে তাকে ______________ বলে।

   (iii) ______________ প্রাণীতে অসম হলোব্লাস্টিক ক্লিভেজ দেখা যায়।

   (iv) এ্যামফিয়কসাসে ______________ ক্লিভেজ দেখা যায়।

   (v) মুরগীর এরিয়া পেলুসিডা ও কুসুমবস্তুর মধ্যের গহ্বরকে ______________ বলে।

3.14 উত্তরমালা

প্রশ্নাবলী - 1

1. (i) — 3.5

   (ii) — 3.6

   (iii) — 3.7

   (iv) — 3.7 c

   (v) — নিরেট কোষবলকে মরুলা ও ব্লাস্টোসিল গহ্বরযুক্ত বলকে ব্লাস্টুলা বলে।

   (vi) — ব্লাস্টুলার মধ্যের গহ্বর।

2. (i) — 3.7c

   (ii) — 3.7d

   (iii) — 3.11

   (iv) — 3.11

3. (i) — ব্লাস্টোমিয়ার

   (ii) — ভেজিটাল মেরু

   (iii) — স্তন্যপায়ী

   (iv) — হলোব্লাস্টিক (পূর্ণ)

   (v) — সাব জার্মিনাল গহ্বর

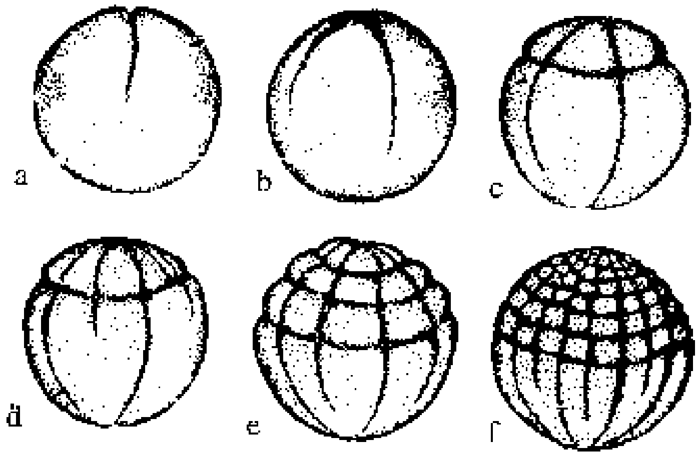

চিত্র নং 3.1 ঃ ব্যাঙের ক্লিভেজ

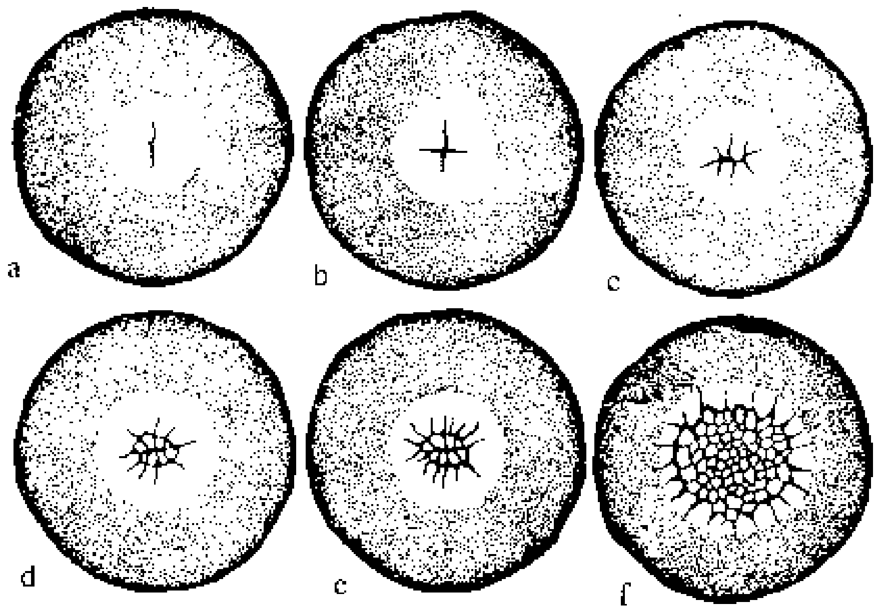

চিত্র নং 3.2 ঃ মুরগীর ব্লাস্টুলা

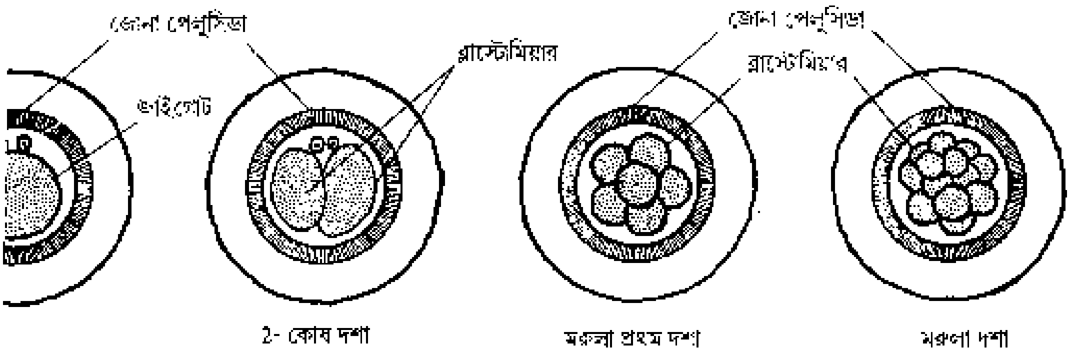

চিত্র নং 3.3 ঃ খরগোসে বিভাজন-প্রথমদশা

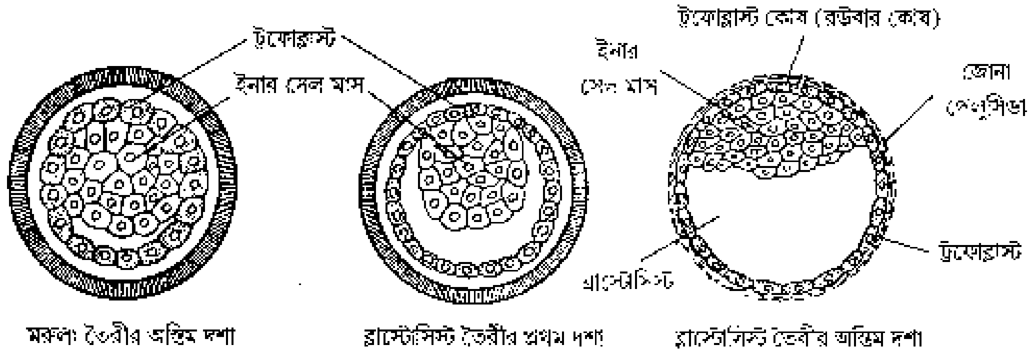

চিত্র নং 3.4 ঃ খরগোসের ব্লাস্টোসিস্ট তৈরীর বিভিন্ন দশা

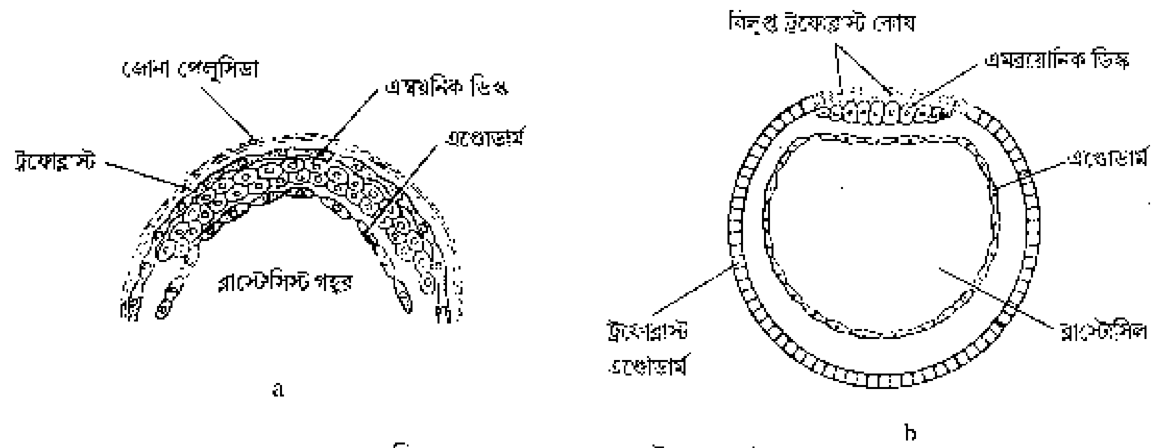

চিত্র নং 3.5 ঃ খরগোসের ব্লাস্টুলা। (a-b)

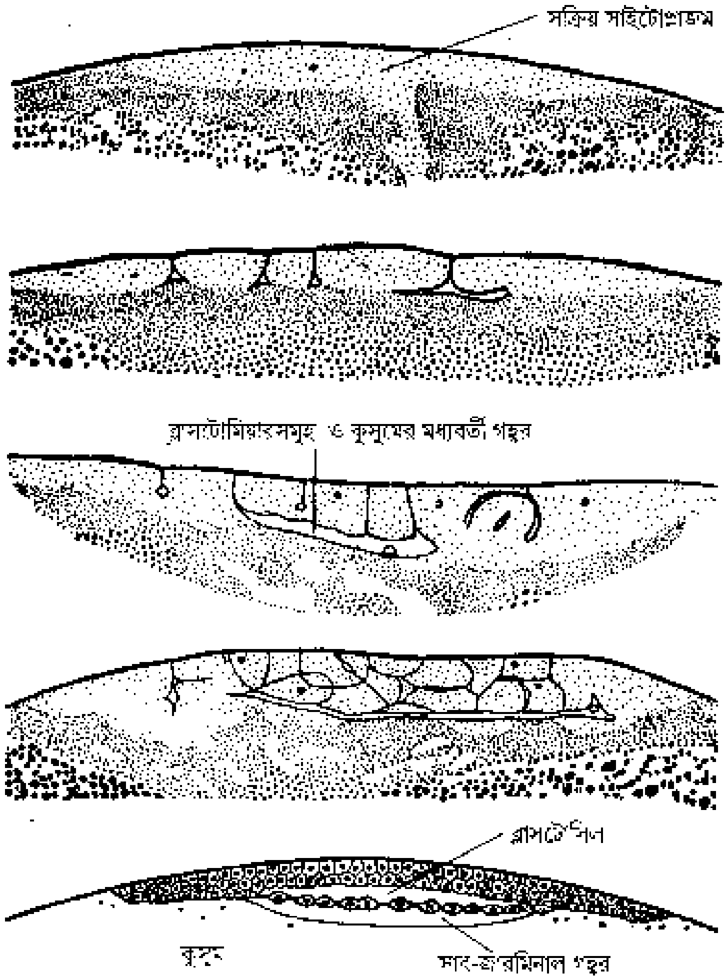

চিত্র নং 3.6 ঃ ডিমের সাধারণ ক্লিভেজের বিভিন্ন পর্যায়; সর্বনিম্নের চিত্রে ব্লাসটোসিল ও সাবজারমিনাল গহ্বর দেখানো হয়েছে।

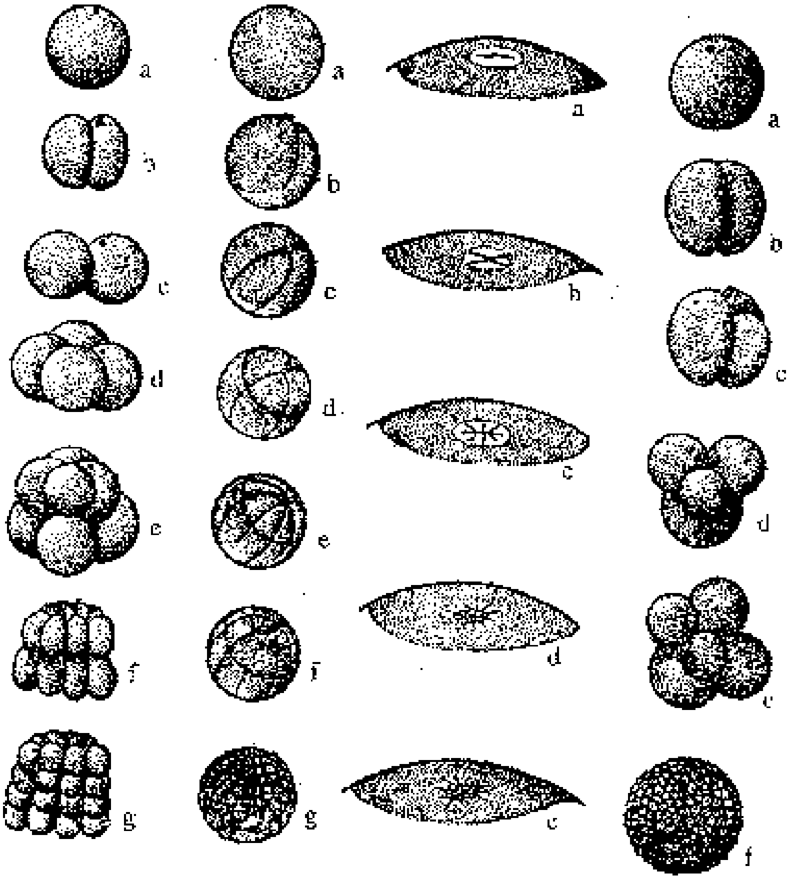

চিত্র নং 3.7 ঃ বিভিন্ন প্রকার মেরুদণ্ডী প্রাণীর নিষিক্ত ডিম্বাণুর ক্লিভেজ প্রক্রিয়া।

a. অ্যাম্ফিঅক্সাস - ডিম্বাণুর আকার (a), প্রথম ক্লিভেজ (b, c), দ্বিতীয় ক্লিভেজ (d), তৃতীয় ক্লিভেজ (e), চতুর্থ ক্লিভেজ (f), পঞ্চম ক্লিভেজ (g)।

b. ব্যাঙ - ডিম্বাণুর আকার (a), প্রথম ক্লিভেজ (b), দ্বিতীয় ক্লিভেজ (c), তৃতীয় ক্লিভেজ (d), চতুর্থ ক্লিভেজ (e), পঞ্চম ক্লিভেজ (f) ও ব্লাস্টুলা (g)।

c. মুরগী - ডিম্বাণুর ব্লাস্টোডিক অঞ্চল ও প্রথম ক্লিভেজ (a), দ্বিতীয় ক্লিভেজ (b), তৃতীয় ক্লিভেজ (c), চতুর্থ ক্লিভেজ (d), পঞ্চম ক্লিভেজ ও অনিয়মিত বিভাজন (e)।

d. খরগোশ - ডিম্বাণুর আকার (a), প্রথম ক্লিভেজ (b), দ্বিতীয় ক্লিভেজ (c), তৃতীয় ক্লিভেজ (d), চতুর্থ ক্লিভেজ (e), ব্লাস্টুলা (f) ঃ (দ্বিতীয় ক্লিভেজ থেকেই অনিয়মিত বিভাজন দেখা যায়)।

একক 4 □ মরফোজেনেটিক চলন (Morphogenetic Movement) ও মুরগীর গ্যাস্ট্রুলেশন (Gastrulation in chick)

গঠন

4.1 প্রস্তাবনা
4.2 উদ্দেশ্য
4.3 সংজ্ঞা
4.4 বৈশিষ্ট্য
4.5 পদ্ধতি
4.6 কোষ বিচলন
4.7 সংগঠকের গুরুত্ব
4.8 সংগঠকের বৈশিষ্ট্য
4.9 গ্যাস্ট্রুলেশনে কোষ গমন
4.10 ভাগ্য-মানচিত্র রূপায়ণ
4.11 মুরগীর ভাগ্য-মানচিত্র
4.12 মুরগীর গ্যাস্ট্রুলেশন
4.13 প্রিমিটিভে স্ট্রীকের সংকোচন ও অভিলুপ্তি
4.14 প্রিমিটিভ স্ট্রীক ও ব্লাস্টোপোর
4.15 সারাংশ
4.16 প্রশ্নাবলী
4.17 উত্তরমালা

4.1 প্রস্তাবনা

জাইগোট ক্লিভেজের মাধ্যমে ব্লাস্টুলা (Blastula) ও গ্যাস্ট্রুলেশন (gastrulation) প্রক্রিয়ায় গ্যাস্ট্রুলায় (gastrula) পরিণত হয়। গ্যাস্ট্রুলেশন ভ্রূণ তৈরীর জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। এই সময় মাইক্রোলেসিথাল প্রাণীতে গোলাকার ব্লাস্টুলার একপাশ ভিতরের দিকে ঢুকে একটা দ্বিস্তর বিশিষ্ট কাপ (cup) তৈরী করে। এই কাপের গহ্বরকে গ্যাস্ট্রোসিল (gastrocoel) বা আরকেনটেরন (Archenteron), আর এর সামনের গোলাকার ছিদ্র পথকে ব্লাস্টোপোর (blastopore) বলে। এরফলে একস্তর বিশিষ্ট ব্লাস্টুলা দ্বিস্তর যুক্ত হয়। বাইরের কোষস্তরটিকে *এক্টোডার্ম* (ectoderm) ও ভিতরেরটিকে *এণ্ডোডার্ম* (endoderm) বলে। এই দুইস্তরের সঙ্গে গ্যাস্ট্রুলেশনের সময় ভ্রূণের দেহে মেসোডার্ম স্তরও সৃষ্টি হয়। এই এক্টো, মেসো ও এণ্ডোডার্ম স্তরগুলিকে জনিত কোষপুঞ্জ বা বৈজিক স্তর (germ layers) বলে কারণ উক্ত তিনটি কোষস্তর থেকেই ভ্রূণের দেহের বিভিন্ন অঙ্গ সৃষ্টি হয়। এই

প্রত্যেকটি জনিত স্তরের অবস্থান, অঙ্গ -সৃষ্টি ক্ষমতা ও কাজ আলাদা। সুতরাং গ্যাস্ট্রুলাগুহর তৈরীর সঙ্গে কোষের কর্মক্ষমতা পৃথকীকরণ (segregation of developmental potential) এইসময়েই হয়ে থাকে। এটি সম্ভব হয় গ্যাস্ট্রুলেশনের সময় কোষগুলি নিয়ন্ত্রিত বিচলনে সক্ষম হয় বলেই। পরিস্ফুটণের জন্য কোষসমষ্টির স্থানান্তরে গমন বা সঞ্চরণকে মরফোজেনেটিক মুভমেন্ট (morphogenetic movement) বলে। কোষ সঞ্চরণের সঙ্গে সঙ্গে নিউক্লিয় পৃথকীকরণ (differentiation) ও রাসায়নিক পৃথকীকরণ (chemo differentiation) হয়ে থাকে।

4.2 উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- উন্নত শ্রেণীর প্রাণীতে এককোষস্তরযুক্ত ব্লাস্টুলা থেকে বহু কোষস্তরযুক্ত গ্যাস্ট্রুলায় রূপান্তর-এর প্রক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ভ্রূণ তৈরীর জন্য গ্যাস্ট্রুলেশন পর্যায়টির প্রয়োজনীয় ভূমিকা ও তাৎপর্য নির্দেশ করতে পারবেন।
- গ্যাস্ট্রুলেশনের সময় কিভাবে ভ্রূণের দেহে তিনটি জনিত কোষস্তরতৈরী করার সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যৎ অঙ্গ রচনা হয়ে থাকে, কিভাবে কোষের মধ্যে বিভিন্ন প্রকার বিভব (potential)-এর সৃষ্টি হয়, এবং কিভাবে কোষগুলি নিজেদের মধ্যে আবেশ বিক্রিয়ায় (inductive interaction) সক্ষম হয় ও প্রধান অঙ্গ তন্ত্রের ভিত্তি কাঠামো প্রস্তুত করে - এইসব বিষয় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কিভাবে এইসময় থেকেই মূলতঃ নিউক্লীয়াস ভ্রূণের কোষগুলির কাজ নিয়ন্ত্রণ করে তা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

4.3 সংজ্ঞা

গ্যাস্ট্রুলেশন ভ্রূণের পরিস্ফুটনের একটি অতি অত্যাবশ্যক গতিশীল পর্যায়। এই প্রক্রিয়ায় ক্লিভেজ পর্যায়ে উৎপন্ন ব্লাস্টোমিয়ারগুলি সঞ্চালনের দ্বারা ভ্রূণের একস্থান হইতে অন্য অংশে গমন করে উপযুক্ত স্থান দখল করে। এই সময় আর্কেনটেরন তৈরীর সঙ্গে ভ্রূণের দেহে জনিত কোষ স্তর সৃষ্টি হয় ও ভবিষ্যৎ প্রাণীর অঙ্গ কাঠামো রচনা হয়।

বিভিন্ন জনিত কোষ থেকে উদ্ভূত অঙ্গসমূহ ঃ

1. এক্টোডার্ম - ত্বক ও নার্ভতন্ত্র
2. মেসোডার্ম - কঙ্কাল, পেশী, সংযোগ কলা, হৃদপিণ্ড, বৃক্ক, বৃক্কনালী, ডিম্বাশয়, শুক্রাশয়, শুক্রনালী, ইত্যাদি।
3. এন্ডোডার্ম - খাদ্যনালী ও কুসুমথলি।

4.4 বৈশিষ্ট্য ঃ

1. কোষ সঞ্চরণের (morphogenetic movement) ফলে ভ্রূণের কোষবিন্যাস হয়। কোষের বিচরণের ফলে একগুণ সম্পন্ন কোষগুলি কাছাকাছি আসে ও এদের মধ্যে আবেশ বিক্রিয়া হয়।
2. ভ্রূণে তিনটি মূল জনিত কোষস্তর সৃষ্টি।
3. কোষ বিভাজন হার সামান্য কম।
4. ভ্রূণের আয়তন অপরিবর্তিত থাকে।
5. বিপাকজনিত পরিবর্তন ও অকসিজেন জারনের গতিবৃদ্ধি ।
6. নতুন প্রোটিন সংশ্লেষিত হয় ও ভ্রূণে প্রোটিনের পরিমাণ বাড়তে থাকে।
7. কোষগুলির নিউক্লিয়সের মধ্যে পৃথকীভবন ও কোষগুলির কাজের ওপর জিনের নিয়ন্ত্রণ দেখা যায়।
8. কোষগুলিতে গ্লাইকোজেনের পরিমাণ খুব তাড়াতাড়ি কমতে থাকে।

4.5 গ্যাসট্রুলেশনের পদ্ধতি (Basic mechanism of gastrulation)ঃ

কোষ বিভাজন (cell division), কোষ সংযোগ (cell contact) ও কোষ সঞ্চরণ (cell movement)– মূলতঃ এই তিন সুসংহত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভ্রূণে গ্যাস্ট্রুলেশন সম্পন্ন হয়।

4.6 গ্যাসট্রুলেশনের সময় কোষের বিচলন (Cell movement during gastrulation) ঃ

গ্যাস্ট্রুলেশন ভ্রূণ গঠনে অতি সুনিয়ন্ত্রিত এবং সক্রিয় দশা। এটি প্রধানতঃ কতকগুলি স্বতঃস্ফূর্ত আভ্যন্তরীণ (intrinsic) শক্তির সাহায্যে নিয়ন্ত্রিত হয়। এই শক্তিগুলি ব্লাস্টুলেশন দশার শেষ এবং গ্যাসট্রুলেশন দশার শুরুতে বিভিন্ন ভবিষ্যৎ অঙ্গ গঠন অঞ্চলের জন্য নির্দিষ্ট জৈব-রাসায়নিক (physico-chemical) অবস্থায় নিহিত থাকে। এই অন্তর্নিহিত শক্তিগুলি আবার কিছু বাহ্যিক (extrinsic) শর্তাবলীর ওপর নির্ভরশীল।

গ্যাসট্রুলেশনের সময় সাধারণতঃ দুই রকম কোষ পরিযান দেখা যায় — *এপিবলি* (epiboly) ও *এমবলি* (emboly)। এই দুই ধরণের কোষের গমনকে একত্রে *আকৃতি নির্দেশক* (morphogenetic) কোষ বিচলন বলে।

এপিবলি ও এমবলি প্রক্রিয়া কোষের বিচরণের সঙ্গে আরও অনেক ক্রিয়াকলাপ জড়িত। এদের মধ্যে বিশেষ কয়েকটি ঃ

1. কোষসমূহের পরিযান (morphogenetic movement)
2. সংগঠক এবং এদের প্রভাব (organiser and its influence)
3. কোষসমূহের রাসায়নিক পৃথকীকরণ (chemo differentiation of cells)

আগেই বলেছি গ্যাস্ট্রুলেশন দশায় কোষগুলির সুশৃঙ্খল চলনক্ষমতা ভ্রূণের অঙ্গগঠনের জন্য প্রয়োজনীয়। তবে কোন বিশেষ শক্তির বশে (যেমন - রাসায়নিক, যান্ত্রিক ইত্যাদি) কোষগুলি চলন ক্ষমতা অর্জন করে তা সঠিকভাবে জানা নেই।

ব্লাস্টুলা দশার শেষেই এই চলনক্ষমতা লক্ষ্য করা যায়। কোষগুলি একটি নির্দিষ্ট পথে পরিযান করে প্রাথমিক গ্যাসট্রুলার মধ্যে প্রবেশ করে। যে শক্তির দ্বারা চালিত হয়ে কোষগুলি অভিযান করে সেই নিয়ন্ত্রণকারী শক্তিকে (guiding force) প্রাইমারী অরগানাইজার (Primary Organiser) বলে। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ভ্রূণতত্ত্ববিদরা প্রমাণ করেছেন যে ব্যাঙের গ্যাসট্রুলেশনে পৃষ্ঠীয় ওষ্ঠের (dorsal lip) মধ্যে এই সংগঠক (organisation centre) থাকে।

4.7 গ্যাসট্রুলেশন প্রক্রিয়ায় সংগঠকের গুরুত্ব (importance of organiser in gastrulation) ঃ

গ্যাস্ট্রুলেশনের সময় বিভিন্ন ধরণের বিচলন পদ্ধতির (4.9 দ্রষ্টব্য) মাধ্যমে কোষ বিচলন ঘটে। এই চলনকে সংগঠন করার জন্য আভ্যন্তরীণ শক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। বিভিন্ন অঙ্গ তৈরীর জন্য বিভিন্ন কোষের মধ্যের ভৌত-রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য এই শক্তির উৎস। এই শক্তিকেই সংগঠক বলা হয়। স্পীমান (Spemann) এবং তাঁর ছাত্র ম্যানগোল্ড (Mangold) প্রভৃতি ভ্রূণতত্ত্ববিদরা প্রমাণ করেছেন ব্লাস্টোপোরের পৃষ্ঠীয় ওষ্ঠ অঞ্চলের ভৌত রাসায়নিক প্রক্রিয়া গ্যাসট্রুলেশনের কোষ অভিযানে নিয়ন্ত্রণকারী শক্তি হিসাবে কাজ করে। আরও দেখা গেছে যে পৃষ্ঠীয় ওষ্ঠ পৃষ্ঠীয় অক্ষীয় অঙ্গ - যেমন নোটোকর্ড, নিউরাল টিউব, সোমাইট ইত্যাদির গঠনেও প্রভাব বিস্তার করে।

4.8 সংগঠকের বৈশিষ্ট্য (special features of organiser) ঃ

1. এই কোষগুলি স্বপৃথকীভবন (auto differentiation) ক্ষমতা সম্পন্ন।
2. এদের স্ব-সংগঠন ক্ষমতা (self organisation) আছে।
3. এরা অন্য কোষের গঠনকে প্রণোদিত (induce) করে।

সংগঠকের এইসব গুণাবলীর উৎস সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতবিভেদ আছে। অনেকের মতে কোষের গ্লাইকোজেন বা স্টেরয়েড এর উৎস। অনেকের মতে DNA, RNA বা প্রোটিনজাতীয় পদার্থের উপস্থিতির জন্যই কিছু কোষ এই বিশেষ ক্ষমতা লাভ করে।

4.9 গ্যাসট্রুলেশনে কোষ গমন (Types of cell movement during gastrulation) ঃ

ধরণ অনুযায়ী এপিবলি ও এমবলি প্রক্রিয়ায় কোষ গমন নানান রকম।

1. **এপিবলি (Epiboly)** — এটি বর্হিমুখী কোষ সঞ্চরণ প্রক্রিয়া। এক্টোডার্ম কোষগুলির সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে তাদের অগ্রপশ্চাৎ অক্ষ বিন্যাস ও পার্শ্ব বিন্যাসকে এপিবলি বলে (চিত্র নং - 4.1)।

2. এমবলি (Emboly) — এটি অর্ন্তমুখী কোষ বিচরণ প্রক্রিয়া। এর ফলে কোষগুলি খুব তাড়াতাড়ি বিভাজিত হয়ে ভ্রূণের দেহের ভিতর কোষ সঞ্চারণ করায়। এটি আবার কয়েকপ্রকার হতে পারে।

a) *ইনভ্যাজিনেশন* (Invagination or caving in) ঃ

ধারণা করুন এমন এক ব্লাস্টুলা যার একদিকে আছে এনিমাল মেরু (animal pole), অন্যদিকে ভেজিটাল মেরু (vegetal pole) এবং ভিতরে ফাঁকা ব্লাস্টোসিল (blastocoel)। এই ব্লাস্টুলার ভেজিটাল মেরুর দিকটায় যদি চাপ দেওয়া যায় এটি একটি দ্বিস্তরযুক্ত কাপের আকার নেয় (চিত্র 4.2 a-c) এবং ভিতরের গহ্বরটি আরকেন্টেরন (archantaron) সৃষ্টি করে। আরকেন্টেরন গহ্বরটি বাইরের জলের সঙ্গে যে ছিদ্রপথে যুক্ত থাকে তাকে ব্লাস্টোপোর (blastopore) ও এর কিনারাকে ব্লাস্টোপোরের ওষ্ঠ (lip of blastopore) বলে। আরকেনটেরনের গভীরতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্লাস্টোপোরের ওষ্ঠ দুইপাশে প্রসারিত হয়ে পৃষ্ঠীয় ওষ্ঠ (dorsal lip) ও অংকীয় ওষ্ঠ (vertial lip) তৈরী করে। এ্যামফিয়কসাস (Amphioxus) ও ব্যাঙের ব্লাস্টুলায় এই পদ্ধতি দেখা যায় (চিত্র নং 4.2,a-c)।

b) *ইনভলুসান* (Involution or rolling under) ঃ

ঘন কুসুমযুক্ত টেলোলেসিথাল (Telolecithal) ডিমের বৈশিষ্ট্য। ব্লাস্টোডার্মের কোনও বিশেষ কিনারা থেকে কোষগুলির অর্ন্তমুখী চলন শুরু হয়। এই কোষগুলি ডিমের কুসুমের ওপর বিস্তৃত না হয়ে সেগমেনটেশন গহ্বরের (segmentation cavity) বিচলন করে এণ্ডোডার্ম গঠন করে। (চিত্র নং 4.3, a-c)।

c) *কনভারজেন্স* (Convergence) ঃ ব্লাস্টোডার্মের কোষগুলির সমকেন্দ্রাভিমুখী চলনের ফলে এরা গ্যাস্টুলার এক জায়গায় জড় হয় ও মাঝ বরাবর একটা অক্ষ গঠন করে। এটি উভচর প্রাণী ও মুরগীর বৈশিষ্ট্য। (চিত্র নং 4.5)।

d) *ডাইভারজেন্স* (Divergence) ঃ এই পরিযান প্রক্রিয়া কনভারজেন্স প্রক্রিয়ার বিপরীত। এই প্রক্রিয়ায় অর্ন্তমুখী কোষগুলি বিভিন্নদিকে ছড়িয়ে পড়ে গ্যাস্টুলার মধ্যে তাদের ভাবী নির্দিষ্ট অবস্থানে পৌঁছায়। উদাহরণ ঃ মুরগীর গ্যাস্টুলায় হাইপোব্লাস্ট কোষের বিচরণ।

e) *ডিলামিনেশন* (Delamination) ঃ পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর পরিস্ফুরণে এই চলন দেখা যায়। ব্লাস্টোমিয়ারগুলি প্রথমে ছোট ছোট গুচ্ছ বা দলে বিভক্ত হয় ও পরে পরস্পরের থেকে পৃথকভাবে নীচে জমা হয়ে একটি স্তর গঠন করে (চিত্র নং 4.4, a-c)।

f) *এক্সপ্যানশন* (Expansion) ঃ এই প্রক্রিয়ায় এনিমাল মেরুর কোষগুলির পরিব্যাপ্তি ঘটে ও এরা ক্রমশঃ ব্লাস্টোপোর অপরে সম্প্রসারিত হয়।

g) *কনক্রিসেন্স* (Concrescence) ঃ এই চলন অনেকটাই কনগ্রুয়েন্স বা কনভারজেন্স ধরণের। বৈশিষ্ট্য ঃ এটি কেবলমাত্র অক্ষরেখা বরাবরই হয়ে থাকে। পাখীর পরিস্ফুটণে দেখা যায় (চিত্র নং 4.7)।

h) *ইনফিলট্রেশন* (Infiltration) ঃ পাখী, স্তন্যপায়ী প্রাণীতে ব্লাস্টোডার্ম থেকে কিছু কোষ ছাড়া ছাড়া ভাবে নীচে সাবজার্মিনাল গহ্বরের তলায় কুসুমের ওপর জমা হয়ে হাইপোব্লাস্ট স্তর তৈরী করে (চিত্র নং 4.6)।

4.10 গ্যাসট্রুলেশনের সময় কোষ সঞ্চরণ প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ পদ্ধতি ও ভাগ্য-মানচিত্র রূপায়ণ (Methods to study the cell movement mechanism during gastrulation and drawing of fate map) ঃ

পরিস্ফুটনের সময় গ্যাস্ট্রুলেশনে কোন্ কোষ থেকে কি কলা (tissue) ও অঙ্গ (organ) তৈরী হবে তার কাঠামো স্থির হয়। এই তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ভ্রূণতত্ত্ববিদগণ বিভিন্নপ্রাণীর ভ্রূণের ভাগ্য-মানচিত্র (fate map) তৈরী করতে সক্ষম হয়েছেন। গ্যাস্ট্রুলেশন প্রক্রিয়া বিশ্লেষণে ভাগ্য-মানচিত্র বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভাগ্য-মানচিত্র তৈরীর পদ্ধতি ঃ

1. *চেতন রঞ্জক প্রক্রিয়া* (Vital stain method] ঃ ভোগ্‌ট উভচর প্রাণীতে প্রথম এই কৌশল ব্যবহার করেন। তিনি নিউট্রাল রেড (Neutral red), এনিলিন ব্লু (Aniline blue), জেনাস গ্রীন বি (Janus green B) প্রভৃতি ভাইটাল স্টেন (যা কোষের কোনও ক্ষতি না করে কোষকে রঞ্জিত করে) ব্যবহার করেন। এই রঞ্জকগুলি ব্লাস্টুলার বিশেষ বিশেষ কোষকে বিশেষ রং-এ রঞ্জিত করে। গ্যাস্ট্রুলেশনের সময় তাদের স্থানান্তরে বিচরণ ও বিন্যাস সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়। ভোগ্‌ট (Vogt) এইভাবে বম্বিনেটর (Bombinator) নামে ব্যাঙের ভাগ্য- মানচিত্র তৈরী করতে সক্ষম হন।

2. *কার্বন-কণিকা প্রক্রিয়া* (Drawing of fate map by application of carbon particles) ঃ পরবর্তীকালে স্প্রাট (Spratt, 1946) ভ্রূণের কোষগুলিকে চিহ্নিত করার জন্য সুক্ষ কার্বন-কণিকা প্রয়োগ করেন। কার্বন কণিকাগুলি কোষের গায়ে আটকে যায় ও পরবর্তীকালে তাদের অভিযান অনুসরণ ও পর্যবেক্ষণ সহজ হয়। এইভাবে তিনি মুরগীর ভাগ্য-মানচিত্র তৈরী করতে সক্ষম হন।

3. *তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার* (Use of radioactive particles) ঃ বর্তমানকালে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে রোজেনকুইস্ট (Rosenquist, 1966) ও নিকোলেট (Nicholet, 1970) পাখীর ভাগ্য-মানচিত্র তৈরী করেন। ব্লাস্টোডার্মের কোষগুলি তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ দিয়ে চিহ্নিত হয় (^3H থাইমিডিন ^3H Thymidine ব্যবহার করা হয়)। এই পদ্ধতিতে অনেক নিখুঁত ভাবে ভাগ্য-মানচিত্র তৈরী সম্ভব হচ্ছে।

4.11 মুরগীর ভাগ্য-মানচিত্র (Fate map in chick) ঃ

এই চিত্রে শুধুমাত্র এপিব্লাস্টের বিভিন্ন অঞ্চল দেখানো হয়েছে (চিত্র নং 4.8)।

পেলুসিডা এলাকার প্রায় কেন্দ্রে একটি ছোট অংশে নোটোকর্ড তৈরী করে। এর ঠিক পিছনেই মধ্যতলে একটি ডিম্বাকৃতি এলাকা দেখা যায় – এটিই ভবিষ্যতের এণ্ডোডার্ম। এর পিছনে থাকে ভ্রূণ বহিঃস্থ এণ্ডোডার্ম (extra embryonic endoderm), যা কুসুমথলির (yolk sac) আংশিক আবরণ তৈরীর কাজ করে। নোটোকর্ড অঞ্চলের দুই পাশ এবং ভাবী এণ্ডোডার্ম ও ভ্রূণ বহিঃস্থ এণ্ডোডার্মের পিছন পর্যন্ত অঞ্চলটিতে ভবিষ্যৎ মেসোডার্মের বিভিন্ন উপ-অঞ্চলগুলি তৈরীর কোষ থাকে। নোটোকর্ডের খুব কাছে দুপাশে থাকে প্রাককর্ডাল মেসোডার্ম (pre-chordal

mesoderm)। এর পরের মেসোডার্মে সোমাইট অঞ্চল (somite area) ও তারও পরের অংশের মেসোডার্মে পার্শ্বীয় প্লেট মেসোডার্ম (lateral plate mesoderm) তৈরীর কোষ থাকে। পেলুসিডা এলাকার একেবারে সীমানার কাছের মেসোডার্ম ভ্রূণবহিঃস্থ (extra-embryonic) মেসোডার্ম তৈরীর কাজ করে। এপিব্লাস্টের বাকী অংশে এক্টোডার্ম কোষ থাকে। নোটোকর্ডের সামনে অর্ধ-বৃত্তাকার অংশটির থেকে নার্ভতন্ত্র (nerve cord) তৈরী হয়। এর বাইরের এপিব্লাস্ট ভ্রূণস্থ এক্টোডার্ম ও পেলুসিডা এলাকার সীমানায় বলয়াকারে ভ্রূণবহিঃস্থ (extra-embryonic) এক্টোডার্ম থাকে।

4.12 মুরগীর গ্যাসট্রুলেশন (Gastrulation in chick) ঃ

অন্যান্য মেরুদণ্ডী প্রাণীর তুলনায় মুরগীর গ্যাসট্রুলেশন পদ্ধতি অনেক জটিল। এর কারণ ঃ a) এদের ঘন কুসুমযুক্ত ডিম ও b) প্রাক্-গ্যাসট্রুলেশন পর্যায়টি অর্থাৎ ব্লাস্টুলাদশা মুরগীর ডিম্বনালীর ভিতর সম্পন্ন হয়.

বহু ভ্রূণতত্ত্ববিদ বহু বৎসর ধরে মুরগীর গ্যাস্ট্রুলেশন ব্যাখ্যা করে চলেছেন। আগের পরিচ্ছেদেই (3.10.3) আপনারা জেনেছেন মুরগীর ব্লাস্টুলা দেখতে একটি চাকতির মতন, যাকে ব্লাস্টোডিস্ক (blastodisc) বলে। এটি দ্বি-স্তর বিশিষ্ট, উপরের স্তরটি এপিব্লাস্ট (epiblast), নীচেরটি হাইপোব্লাস্ট (hypoblast) ও মধ্যের গহ্বরটি সাবজার্মিনাল গহ্বর (subgerminal cavity)। এই ব্লাস্টোডিস্কের কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছ হওয়ায় এটিকে পেলুসিডা এলাকা (area pellucida) ও এর চারপাশের কুসুমের ওপর অবস্থিত অ-স্বচ্ছ অঞ্চলকে ওপেকা অঞ্চল (area opeca) বলে।

মুরগীর গ্যাস্ট্রুলেশনে তিনটি ধাপ লক্ষ্য করা যায় ঃ

1. গৌণ হাইপোব্লাস্ট গঠন (formation of secondary hypoblast)
2. প্রিমিটিভ স্ট্রীক (Primitive streak) গঠন
3. ভ্রূণীয় অক্ষের সৃষ্টি।

আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি (3.10 দ্রষ্টব্য) ব্লাস্টুলেশন দশার শেষের দিকে প্রাথমিক হাইপোব্লাস্ট (primordial hypoblast) তৈরী হয়। ওপরের এপিব্লাস্ট ও হাইপোব্লাস্টের মধ্যের গহ্বরটি ব্লাস্টোসিল (blastocoel)।

হাইপোব্লাস্ট তৈরীর অল্প সময়ের মধ্যেই পেলুসিডা এলাকার পিছন দিকে কিছু কোষ শিকলের আকারে সজ্জিত দেখা যায়। এটিকে কোলারের শিকল (Koller's sickle) বলে। এই কোলারের শিকল থেকে গৌণ হাইপোব্লাস্ট স্তর উৎপন্ন হয়ে প্রাথমিক স্তরটিকে সামনের দিকে ঠেলতে শুরু করে। গৌণ হাইপোব্লাস্ট ক্রমশঃ বাড়তে থাকায় প্রাথমিক হাইপোব্লাস্ট স্তরটি খুব ছোট হয়ে যায় এবং ব্লাস্টোডার্মের সীমানায় অর্ধচন্দ্রকারে সজ্জিত থাকতে দেখা যায়। এই গৌণ হাইপোব্লাস্টের উৎপত্তি সম্পর্কে ভ্রূণতত্ত্ববিদদের নানান মত আছে। অনেকেই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে প্রাথমিক বা গৌণ কোনও হাইপোব্লাস্টেরই ভ্রূণের কোষ গঠনে কোনও ভূমিকা নেই। অনেকে অবশ্য মনে করেন প্রাথমিক হাইপোব্লাস্ট আদিম জনন কোষ উৎপন্ন করে এবং গৌণ হাইপোব্লাস্ট প্রধানতঃ কুসুমবৃন্ত (Yolk stalk) গঠন করে। প্রাথমিক ও গৌণ হাইপোব্লাস্ট তৈরীর পর্যায়কে প্রাক্-গ্যাস্ট্রুলেশন ঘটনা বলে অনেকে মনে করেন। বেশীরভাগেরই মতে এপিব্লাস্ট স্তর থেকেই তিনটি আদি জনন কোষস্তর (এক্টো, মেসো ও এণ্ডোডার্ম) তৈরী হয়।

প্রাথমিক ও গৌণ হাইপোব্লাস্ট চলনের সময় ইনকিউবেশনের আনুমাণিক 3-4 ঘন্টার মধ্যেই এপিব্লাস্টের পিছনদিকের কোষগুলি অভিসরণ (convergence) পরিযান প্রক্রিয়ায় একত্র হয়। এই ঘটনা থেকেই গ্যাস্ট্রুলেশন ও এরসঙ্গে ভ্রূণের কোয়ন্তর সৃষ্টির সূচনা। এই কোষগুলি ক্রমশঃ পেলুসিডা অঞ্চলের পিছনদিকে মধ্যরেখা বরাবর একটি প্রশস্ত ও স্থূল এলাকা গঠন করে। এটিই আদি প্রিমিটিভ ষ্ট্রীক (Primordial Primitive Streak)। ইনকিউবেশনের 7-8 ঘন্টার মধ্যে এটি একটি সুনির্দিষ্ট আকার ধারণ করে এবং 10-12 ঘন্টার পরে এটি ভ্রূণীয় অক্ষ সৃষ্টি করে স্ট্রীকটি ক্রমে মধ্যরেখা ধরে পেলুসিডা অঞ্চলের তিন -চতুর্থাংশ (3/4) ভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয় ও একটি মিডিয়াম ষ্ট্রীক হিসাবে ব্লাস্টোডার্মে থাকতে দেখা যান।

4.12.1 ক্ষুদ্র প্রিমিটিভ ষ্ট্রীক (Short primitive streak) ঃ

কিনারার (lateral area) এপিব্লাস্ট কোষগুলির সমকেন্দ্রাভিমুখী যাত্রার ফলে মধ্যরেখা বরাবর প্রিমিটিভ ষ্ট্রীক তৈরীর সূচনা হয়। প্রাথমিক অবস্থায় প্রিমিটিভ ষ্ট্রীক অগ্র-পশ্চাৎ দুইদিকেই বাড়তে থাকে। ক্রমে এতে আরও কোষ যোগ হয় এবং সামনের দিকে এর বৃদ্ধি সেকেণ্ডারী বা গৌণ হাইপোব্লাস্টের র সমতালে চলে। আর পিছনদিকে এর বিস্তৃতি অপেক্ষা এলাকা পর্যন্ত হতে দেখা যায়। ফলে এই পিছনদিকের অঞ্চল অপেক্ষাকৃত প্রশস্ত হয় এবং এর প্রান্তসীমাও সুস্পষ্ট থাকে না।

নির্দিষ্ট প্রিমিটিভ ষ্ট্রীক (Definitive Primitive Streak) ঃ ক্ষুদ্র প্রিমিটিভ ষ্ট্রীক সামনের দিকে মধ্যরেখা ধরে বাড়তে থাকায় কোষগুলি ক্রমশই ঘনীভূত হয় এবং ষ্ট্রীকটি একটি নির্দিষ্ট সীমানা প্রাপ্ত হয়। এর মধ্যে দীর্ঘ অক্ষ বরাবর একটি খাঁজ দেখা যায় - এটি প্রিমিটিভ গ্রুভ (Primitive Groove)। এই খাঁজের দুইপাশে উঁচু দুটি অংশ থাকে। এগুলিকে প্রিমিটিভ রিজ (Primitive Ridge) বলে। প্রিমিটিভ গ্রুভ সামনের দিকে একটা ছোট গহ্বরে শেষ হয় - এটি প্রিমিটিভ পিট (Primitive Pit) এবং পিছনদিকে প্রিমিটিভ ষ্ট্রীক প্রিমিটিভ প্লেট (Primitive Plate) পর্যন্ত বিস্তৃত।

প্রিমিটিভ ষ্ট্রীক অঞ্চলে কোষগুলির চলনের ফলে এপিব্লাস্টের যে জায়গা খালি হয়, সামনের ও পাশের কোষগুলি সঞ্চালিত হয়ে সেইসব জায়গা দখল করে। প্রিমিটিভ ষ্ট্রীক গঠনের পরই এমবলি পরিযান শুরু হয়। কোষগুলি মধ্যরেখা ধরে বিচলন করে প্রিমিটিভ ষ্ট্রীক গঠনের পর ভিতরের দিকে সরে যায় ও শেষে ষ্ট্রীক ছেড়ে সামনে ও পাশের দিকে অবস্থান করে। আবার এপিব্লাস্টের পরিযানরত কিছু কোষ স্থানান্তরিত হয়ে এপিব্লাস্ট ও হাইপোব্লাস্টের মধ্যে একটা চওড়া মধ্যবর্তী স্তর হিসাবে ষ্ট্রীক বরাবর সামনে ও পাশে বিস্তৃত হয়। এগুলি মেসোডার্ম কোষ। প্রিমিটিভ ষ্ট্রীকের সামনে কোষ জড় হয়ে একটা স্থূল অঞ্চল গঠন করে। এটিকে প্রিমিটিভ নট (Primitive Knot) বা হেনসেন গ্রন্থি (Hensen's node) বলা হয় (চিত্র নং 4.9 - 4.13)।

ইনকিউবেশনের 18 থেকে 19 ঘন্টার পর প্রিমিটিভ ষ্ট্রীক গঠন সম্পূর্ণ হয়। প্রিমিটিভ ষ্ট্রীক গঠনের সময় পেলুসিডা অঞ্চল ক্রমশঃ গোলাকার থেকে নাসপাতির আকার (Pear shaped) ধারণ করে। ভ্রূণের মাথার দিক প্রিমিটিভ ষ্ট্রীকের সামনের অঞ্চল থেকে তৈরী হয়।

পেলুসিডা অঞ্চলের প্রিমিটিভ ষ্ট্রীক সংলগ্ন অঞ্চল বিশেষ স্থূল আকার ধারণ করে। এই অঞ্চলকে ভ্রূণ অঞ্চল (Embryonic area) বলে। এর আকৃতি শিল্ডের মতন হওয়ায় এটিকে ভ্রূণ শিল্ড or (Embryonic shield) বলা হয়।

প্রিমিটিভ স্ট্রীক গঠন মুরগীর গ্যাস্ট্রুলেশন প্রক্রিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। স্ট্রীকের মধ্য দিয়ে এণ্ডো- ও মেসোডার্ম কোষগুলি অভিযান করে ও বিভিন্ন কোষস্তর সৃষ্টি করে। মুরগীতে এই কোষগুলি প্রিমিটিভ স্ট্রীক ও হেনসেন নোডের মধ্যে চলনের সময় একটি স্তর হিসাবে সঞ্চালিত না হয়ে একটি একটি আলাদা কোষ হিসাবে পরিযান করে। মুরগীর কোষের এই চলনকে ইনভলুশন (Involution) বলা হয়। অনেকে এই চলনকে ইমিগ্রেশন (Immigration) আখ্যা দেন। পরিযানরত কোষগুলি এণ্ডোডার্ম, মেসোডার্ম ও নোটোকর্ড তৈরী করে।

এপিব্লাস্ট কোষগুলির ক্রমাগত প্রিমিটিভ স্ট্রীকের দিকে অর্ন্তমুখী যাত্রার ফলে যে শূন্যস্থান তৈরী হয় ব্লাস্টোডার্মের উপরের তলের কোষগুলি এপিবলি প্রক্রিয়ায় সেই সব জায়গা পূরণ করে (ভাগ্য-মানচিত্র দ্রষ্টব্য)।

4.12.2 এণ্ডোডার্ম গঠন (Formation of endoderm) :

প্রিমিটিভ স্ট্রীক সম্পূর্ণভাবে গঠিত হবার আগেই যে কোষগুলি এণ্ডোডার্ম সৃষ্টি করবে তারা স্ট্রীকের অগ্রাংশের মধ্য দিয়ে অন্তঃমুখী সঞ্চলনের মাধ্যমে হাইপোব্লাস্ট পৌঁছায় আর হাইপোব্লাস্ট কোষগুলিকে সামনের দিকে ও ওপেকা অঞ্চলের দিকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। এর ফলে হেনসেন নোডের সামনে ও চারিপাশ অঞ্চলে প্রিমিটিভ স্ট্রীক থেকে বাইরে আসা কোষগুলি দখল করে। এই অঞ্চলটির থেকেই পরবর্তীকালে অগ্র-অন্ত্র (foregut) তৈরী হয়। এরপর হেনসেন নোডের পিছনদিকের এণ্ডোডার্ম তৈরীর কোষগুলি প্রিমিটিভ স্ট্রীকের মধ্য দিয়ে অভিযান করে পশ্চাদ-পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে স্থাপিত হয় ও কুসুমথলির আবরণী অংশ গঠন করে। ইনকিউবেশনের 22 ঘন্টার মধ্যে ভাবী এণ্ডোডার্মের সবকোষগুলি নির্দিষ্ট জায়গায় স্থাপিত হয় (চিত্র নং 4.14)।

4.12.3 নোটোকর্ড গঠন (Formation of notochord) :

ভাবী নোটোকর্ড তৈরীর কোষগুলি প্রথমে হেনসেন নোডে জমা হয় ও পরে এপিব্লাস্টের নীচে এই ঘন কোষ সম্বলিত অঞ্চলটি দণ্ডের মতন সামনের দিকে প্রসারিত হয়। ইনকিউবেশনের 20 ঘন্টার মধ্যেই নোটোকর্ড তৈরীর সূচনা লক্ষ্য করা যায়।

4.12.4 মেসোডার্ম গঠন (Formation of mesoderm) :

ইনকিউবেশনের 15 ঘন্টা পর্যান্ত মেসোডার্ম কোষ কোনও সক্রিয়তা দেখায় না। মেসোডার্ম কোষগুলি হেনসেন নোডের পিছনে প্রিমিটিভ স্ট্রীক বরাবর কেন্দ্রীভূত হয়ে ব্লাস্টুলার ভিতরদিকে অভিযান করে। হেনসেন নোডের ঠিক পাশের কোষগুলি মস্তক মেসোডার্ম (Head mesoderm), পিছনের কোষগুলি সোমাটিক মেসোডার্ম (Somatic mesoderm)। এগুলি স্ট্রীক থেকে বাইরে এসে সামনের দিকে প্রসারিত হয় ও নোটোকর্ডের দুই পাশে অবস্থান করে। এরপর প্রিমিটিভ স্ট্রীকের মধ্যভাগ থেকে পার্শ্বীয় প্লেট (Lateral plate) মেসোডার্ম তৈরীর কোষগুলি একইভাবে প্রথমে স্ট্রীকের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, পরে পাশে ও সামনে স্থানান্তরিত হয়ে সোমাইটের দুইপাশে সজ্জিত হয়। প্রিমিটিভ স্ট্রীকের একদম পিছনের মেসোডার্ম কোষগুলি ভ্রূণবহিঃস্থ মেসোডার্ম তৈরী করে। (চিত্র নং 4.15)।

4.13 প্রিমিটিভ স্ট্রীকের সংকোচন ও অবলুপ্তি (Gradual disappearance of Primitive Streak) ঃ

আগেই জানিয়েছি (চিত্র নং 4.11 দ্রষ্টব্য), এপিব্লাস্টের নোটোকর্ড, মেসো ও এণ্ডোডার্ম কোষগুলি কেন্দ্রীভূত হয়ে প্রিমিটিভ স্ট্রীক গঠন করে এবং এই কোষগুলি স্ট্রীক থেকে ভ্রূণের অভ্যন্তরে পরিযান করে নির্দিষ্ট জায়গায় পৌঁছোয়। এরফলে স্ট্রীকের কোষের ভাণ্ডার ক্রমেই খালি হতে থাকে এবং স্ট্রীকটি সামনের থেকে পিছনদিকে ক্রমশঃই সঙ্কুচিত হতে থাকে। প্রথমে স্ট্রীকের সামনের হেনসেন নোড থেকে নোটোকর্ড কোষগুলি সরে যায়। এরপর ভাবী এণ্ডোডার্ম কোষগুলিরও অপসারণ ঘটে ও শেষে বিভিন্ন মেসোডার্ম কোষগুলি স্ট্রীক থেকে সরে যাওয়ায় প্রিমিটিভ স্ট্রীক সঙ্কুচিত হয়ে প্রায় অবলুপ্ত হয়। ইনকিউবেশনের চতুর্থ দিনে অবশিষ্ট অংশটুকু ভ্রূণের লেজ কোষের (tail bud) সঙ্গে ও অবসারণী অঞ্চলের সঙ্গে মিশে একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয় (চিত্র নং 4.16)।

4.14 প্রিমিটিভ স্ট্রীক ও ব্লাস্টোপোর ঃ

প্রিমিটিভ স্ট্রীকের মাধ্যমে ভ্রূণের ভাবী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোষগুলির অভ্যন্তরে অভিযান ঘটে। এই কারণে প্রিমিটিভ স্ট্রীককে অন্যান্য ভ্রূণের ব্লাস্টোপোরের সঙ্গে তুলনা করা হয়। গ্যাস্ট্রুলেশনের শেষে প্রিমিটিভ স্ট্রীকের সংকোচন ও অদৃশ্য হওয়ার ঘটনার সঙ্গেও ব্লাস্টোপোরের ছিদ্র বন্ধ হওয়ার তুলনা করা যায়।

4.15 সারাংশ ঃ

নিষিক্ত জাইগোট থেকে ভ্রূণের পরিস্ফুটণের পর্যায়গুলির মধ্যে গ্যাস্ট্রুলেশন সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ গতিশীল ও স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রক্রিয়া। এই পদ্ধতিতে ব্লাস্টুলা গ্যাসট্রুলায় রূপান্তরিত হয়। মাইক্রোলেসিথাল ডিমে গোলাকার ব্লাস্টুলার একপাশ ক্রমশঃ ভিতরের দিকে ঢুকে দ্বি-স্তর যুক্ত গ্যাসট্রুলা তৈরী করে। এর বাইরের আবরণী স্তরটি এক্টোডার্ম, ভিতরেরটি এণ্ডোডার্ম ও গহ্বরটি আরকেনটেরন। গ্যাসট্রুলেশনের সময় কোষের কর্মক্ষমতার পৃথকীকরণ ঘটে, কোষগুলি চলনক্ষমতাযুক্ত হয় ও কোষের কাজের ওপর জিনের প্রভাব শুরু হয়। কোষের চলনক্ষমতাকে পরিযান বা (Morphogenetic movement) বলা হয়। এই চলনের ওপর ভিত্তি করেই ভবিষ্যতের জনন কোষস্তর ও প্রাণীর দেহ গঠনের ছক তৈরী হয়।

কোষ বিভাজন, কোষ সংসর্গ ও কোষ চলন এই দশার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কোষগুলি এপিবলি ও এমবলি প্রক্রিয়ায় চলনক্ষম হয়। এপিবলির মাধ্যমে একটোডার্ম কোষস্তরের সংখ্যাবৃদ্ধি ও দেহের বহিরাবরণের বিন্যাস ঘটে। এমবলি প্রক্রিয়ায় ব্লাস্টোডার্মের কোষগুলি দেহের অভ্যন্তরে বিভাজন ও চলনে সক্ষম হয় ও প্রাণীর দেহে এণ্ডো ও মেসোডার্ম কোষের বিন্যাস ও অঙ্গগঠন করে। এমবলি প্রক্রিয়া কয়েকপ্রকার : 1. ইনভ্যাজিনেশন 2. ইনভলুশান 3. কনভারজেন্স 4. ডাইভারজেন্স 5. ডিলামিনেশন 6. একসপ্যানশন 7. কনক্রিসেন্স 8. ইনফিলট্রেশন। কোষবিভাজনে উদ্ভূত কোষগুলির মধ্যে অঙ্গ তৈরীর জন্য ভৌত রাসায়নিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন শক্তি নিহিত থাকে। এই শক্তিকে সংগঠক বা (Organiser) বলা হয়।

গ্যাসট্রুলেশনের সময় কোন কোষ থেকে কোন কলা বা অঙ্গ তৈরী হবে বোঝার জন্য বিজ্ঞানীরা নানা উপায়ে ভ্রূণের ভাগ্য মানচিত্র রচনা করতে সক্ষম হয়েছেন। তেজস্ক্রিয় আইসোটোপ ব্যবহার করে মুরগীর ভাগ্য-মানচিত্র সঠিকভাবে জানা যায়।

পেলুসিডা অঞ্চলের কোষগুলির থেকেই ভ্রূণ তৈরী হয়। ইনকিউবেশনের শুরুতেই পেলুসিডা এলাকার পিছনদিকের কোষগুলি শিকলের আকারে চলন করে গৌণ হাইপোব্লাস্ট তৈরী করে। ফলে প্রাথমিক হাইপোব্লাস্ট আকারে ছোট হয়ে অর্ধচন্দ্রাকারে ব্লাস্টোডার্মের সীমানায় সজ্জিত থাকে। এই চলনকে প্রাক্-গ্যাসট্রুলেশন চলন বলে।

ইনকিউবেশনের 3 - 4 ঘন্টার মধ্যে এপিব্লাস্টের পিছন দিকের কোষগুলি অভিসরণ করে মধ্য অক্ষরেখা বরাবর প্রিমিটিভ স্ট্রীক গঠনের সূচনা করে ও ইনকিউবেশনের 18 - 19 ঘন্টার মধ্যে এই গঠনটি সম্পূর্ণ হয়। প্রিমিটিভ স্ট্রীকের সামনে কোষ জড় হয়ে হেনসেন নোড তৈরী করে। এর থেকেই নোটোকর্ড অঞ্চলটি সৃষ্টি হয়। প্রিমিটিভ স্ট্রীকের মধ্যে এণ্ডো ও মেসোডার্ম কোষস্তর তৈরীর কোষগুলি অন্তর্ভুক্ত হয়। এণ্ডোডার্ম কোষগুলি অগ্র-অন্ত্র ও কুসুমথলির আবরণী গঠন করে। মেসোডার্ম কোষগুলি মস্তক মেসোডার্ম, সোমাইট ও পার্শ্বীয় মেসোডার্ম গঠন করে। ক্রমে, এণ্ডো-ও মেসোডার্ম কোষগুলি প্রিমিটিভ স্ট্রীক থেকে বেরিয়ে যাওয়ায় এই গঠনটি সংকুচিত হয়ে অবশেষে অবলুপ্ত হয়।

4.16 প্রশ্নাবলী

1. তুলনা করুন ঃ -

a) ব্লাস্টোডার্ম ও ব্লাস্টোডিস্ক

b) এপিবলি ও এমবলি

c) ইনভ্যাজিনেশন ও ইনভলুশান

d) প্রিমিটিভ গ্রুভ ও প্রিমিটিভ নোড

e) পেলুসিডা অঞ্চল ও ওপেকা অঞ্চল।

f) ক্ষুদ্র প্রিমিটিভ স্ট্রীক ও নির্দিষ্ট প্রিমিটিভ স্ট্রীক।

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

a) ভাগ্য-মানচিত্র তৈরীর পদ্ধতিগুলি উল্লেখ করুন।

b) প্রিমিটিভ স্ট্রীক গঠনটি কি ?

c) গ্যাসট্রুলেশনে কুসুমের প্রভাব কি ?

d) গ্যাস্ট্রুলেশনের সংজ্ঞা লিখুন। এই প্রক্রিয়ার প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কি ?

e) মরফোজেনেটিক মুভমেন্ট কাকে বলে ? গ্যাস্ট্রুলেশনে এর প্রয়োজনীয়তা কতখানি ?

3. **দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

a) মুরগীর এণ্ডোডার্ম ও মেসোডার্ম গঠনের বিবরণ দিন।

b) প্রিমিটিভ স্ট্রীক কি ? মুরগীতে প্রিমিটিভ স্ট্রীক কি ভাবে গঠিত হয় ?

c) মুরগীর গ্যাস্ট্রুলেশনের বর্ণনা দিন।

d) গ্যাস্ট্রুলেশন প্রক্রিয়ায় সংগঠনের ভূমিকা বর্ণনা করুন।

4. **শূণ্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

a) মুরগীর প্রিমিটিভ স্ট্রীকে সামনের প্রসারিত অংশকে _______________ বলে।

b) পরিস্ফুটণ কালে ভ্রূণের দেহের এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে কোষ সমষ্টির স্থানান্তরকে _______________ বলে।

c) গ্যাস্ট্রুলেশন পর্যবেক্ষণে _______________ খুবই সহায়ক।

d) গ্যাসট্রুলেশনে বহির্মুখী কোষসঞ্চলন প্রক্রিয়াকে _______________ ও অন্তর্মুখী কোষ সঞ্চলন প্রক্রিয়াকে _______________ বলে।

4.17 উত্তরমালা

প্রশ্নাবলী

1. a) — 4.12
   b) — 4.9
   c) — 4.9
   d) — 4.12.2 (b)
   e) — 4.12
   f) — 4.12.1 এবং 4.12.2

2. a) — 4.10
   b) — 4.12.1 এবং 4.12.2
   c) — 4.1
   d) — 4.3, 4.4
   e) — 4.4

3. a) — 4.12.3 এবং 4.12.5

   b) — 4.12.1 এবং 4.12.2

   c) — 4.12.1 থেকে 4.12.5

   d) — 4.7

4. a) — হেনসেন নোড

   b) — মরফোজেনেটিক মুভমেন্ট

   c) — ভাগ্য-মানচিত্র

   d) — এপিবলি, এমবলি

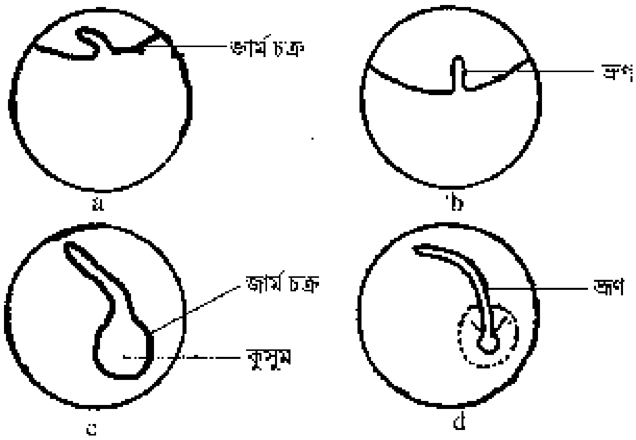

চিত্র নং 4.1 : এপিবলি : পূর্ণাস্থি মাছের ভ্রূণ বৃদ্ধির চারিটি দশা (a-d), এবং কুসুম বস্তুর চারিদিকে জার্মরিং বা ব্লাস্টোপোর ওষ্ঠ সৃষ্টি চিত্ররূপ।

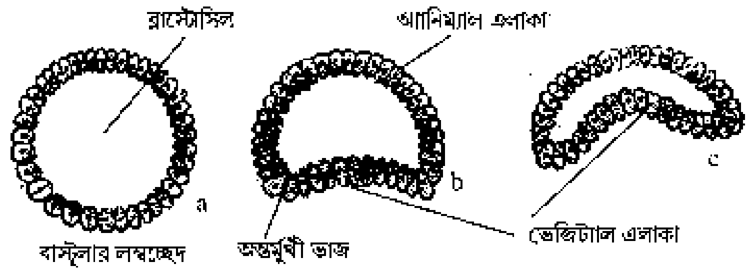

চিত্র নং 4.2 : ইনভ্যাজিনেশনের চিত্ররূপ (a-c)।

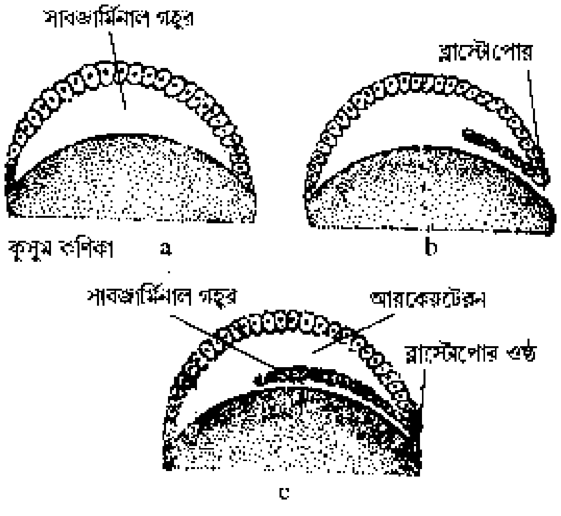

চিত্র নং 4.3 : ইনভল্যুশনের চিত্ররূপ (a-c)।

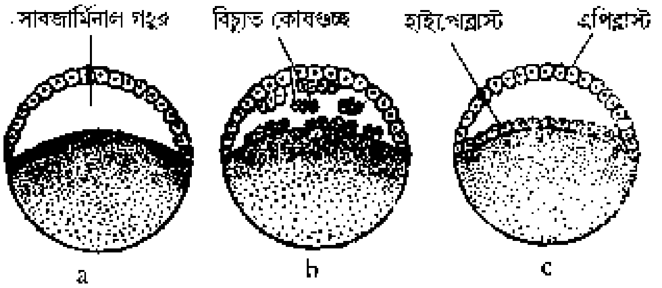

চিত্র নং 4.4 ঃ ডিলামিনেশনের চিত্ররূপ (a-c)।

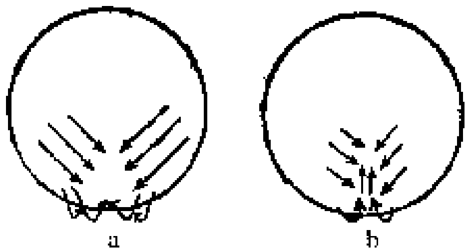

চিত্র নং 4.5 ঃ কনভারজেন্সের চিত্ররূপ ।
a) আরম্ভে ব্লাস্টোডার্মের পৃষ্ঠ, b) প্রক্রিয়ার শেষে।

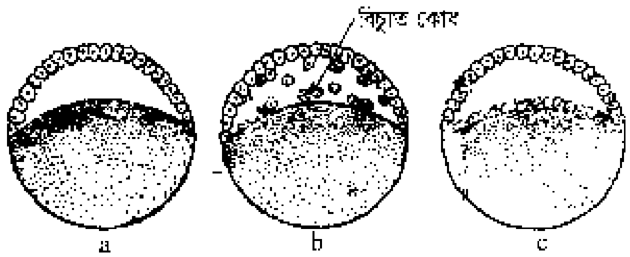

চিত্র নং 4.6 ঃ ইনফিলট্রেশনের চিত্ররূপ (a-c)।

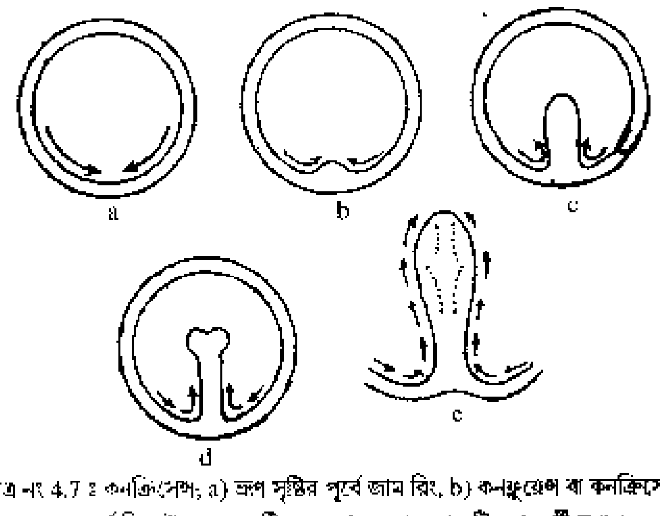

চিত্র নং 4.7 ঃ কনক্রিসেন্স; a) ভ্রূণ সৃষ্টির পূর্বে জার্ম রিং, b) কনফ্লুয়েন্স বা কনক্রিসেন্স আরম্ভ, c) জার্ম রিং হইতে ভ্রূণ সৃষ্টি হচ্ছে, d) ও e) ভ্রূণ সৃষ্টির পরবর্তী দশা।(a-e)।

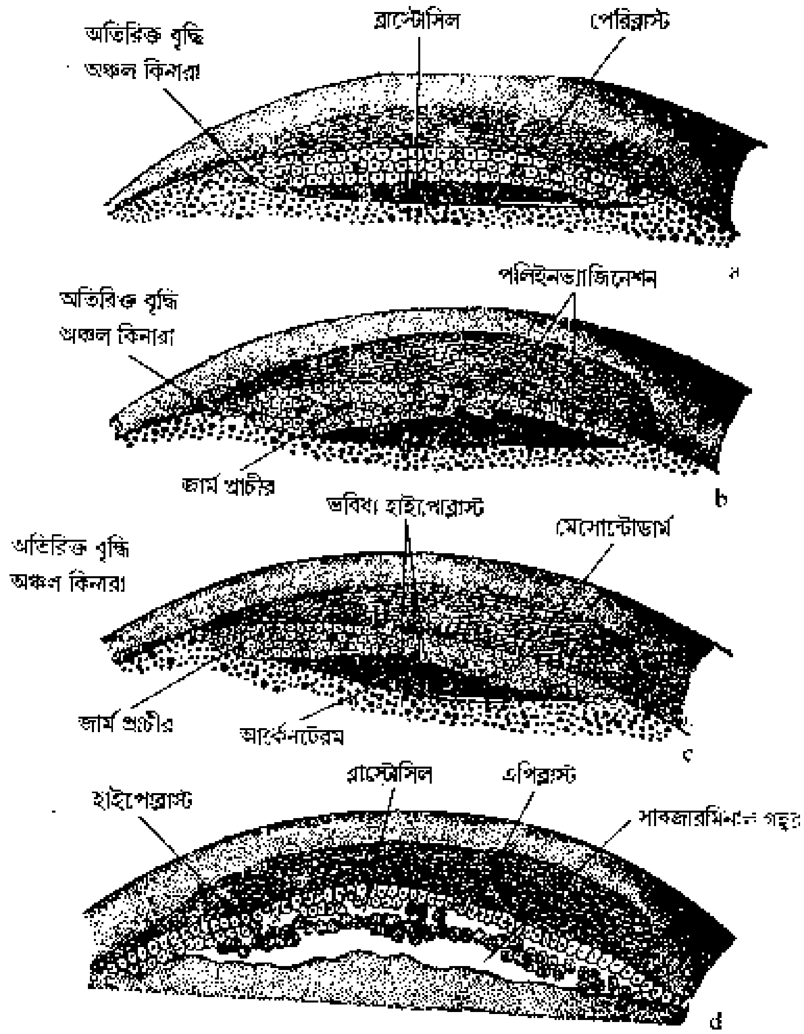

চিত্র নং 4.৭ ঃ মুরগীর গ্যাস্ট্রুলেশন কালে ব্লাস্টোডিস্ক অঞ্চলের দৃশ্য। প্রাথমিক গ্যাস্ট্রুলেশন পর্যায় ও ক্লিভেজের ফলে উদ্ভূত কোষ ও ব্লাস্টোসিল (a), ব্লাস্টোডার্মের কিছু কোষের নিম্নমুখী চলন এবং ব্লাস্টোসিলের ছাদে অবস্থান (b) পলিইনভ্যাজিনেশন প্রক্রিয়া ও ভবিষ্যৎ হাইপোব্লাস্ট ও এপিব্লাস্ট ও আর্কেনটেরনের গঠন (c, d)।

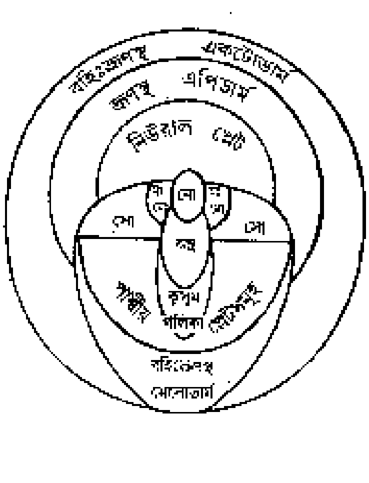

চিত্র নং 4.৪ ঃ গ্যাস্ট্রুলেশনের ঠিক পূর্বে একটি পাখির ভ্রূণের ভাগ্য মানচিত্র। মঃ মেঃ -মস্তক মেসোডার্ম; নো- নোটোকর্ড; সোঃ সোমাইট।

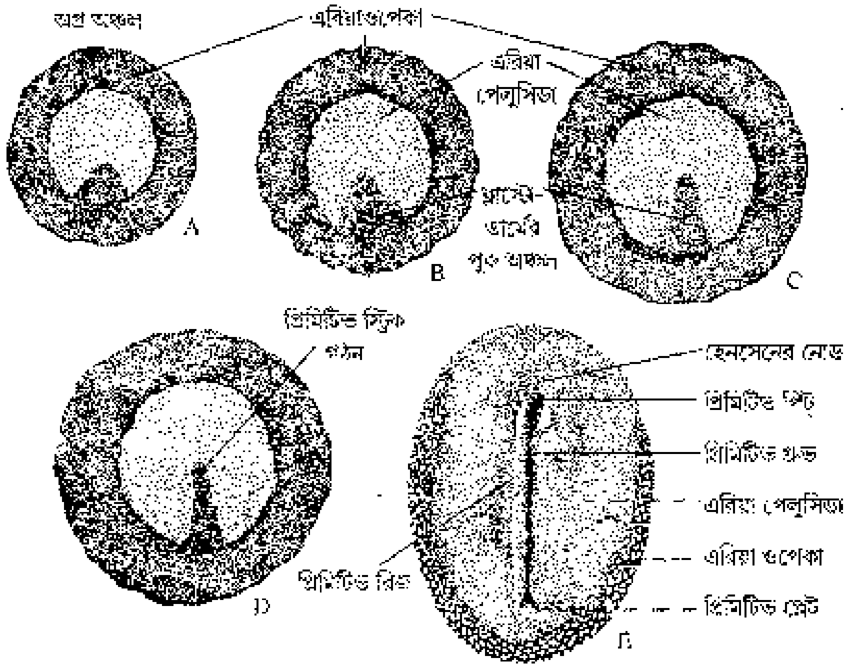

চিত্র নং 4.15 ঃ মুরগীর প্রিমিটিভ স্ট্রিক গঠনে বিভিন্ন পর্যায় (A-D)। ইনকিউবেশনের 3 থেকে 4 ঘণ্টা সময়ে (A), 5 থেকে 6 ঘণ্টা সময়ে (B), 7 থেকে 8 ঘণ্টা সময়ে (C) এবং 10 থেকে 12 ঘণ্টা সময়ের (D) দৃশ্য। ইনকিউবেশনের 16 ঘণ্টা পর মুরগীর সমগ্র ভ্রূণে প্রিমিটিভ স্ট্রিক-এর অবস্থা (E)।

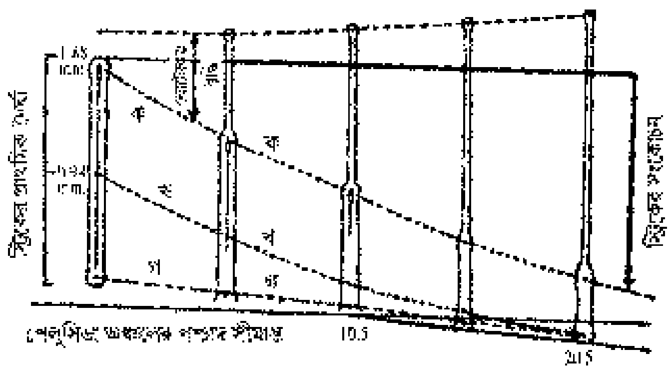

চিত্র নং 4.16 ঃ নোটোকর্ডের বৃদ্ধি ও প্রিমিটিভ স্ট্রিকের সংকোচন (লেখচিত্রের মাধ্যমে সারসংক্ষেপ দেখান হয়েছে)। লেখচিত্রের ভূমির সংখ্যাসমূহ সময়কাল (ঘণ্টায়) নির্দেশক।

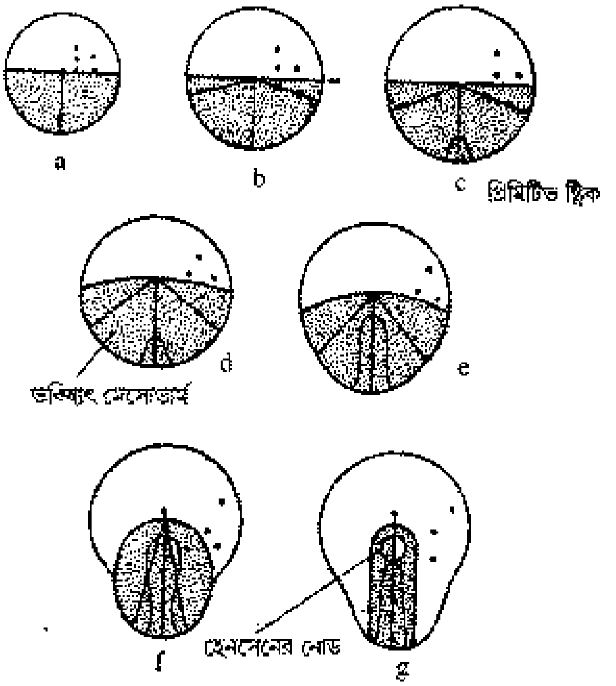

চিত্র নং 4.11 ঃ ব্লাস্টোডার্ম থেকে কোষের পরিযান প্রক্রিয়া এবং প্রিমিটিভ স্ট্রিক গঠন (a - g)।

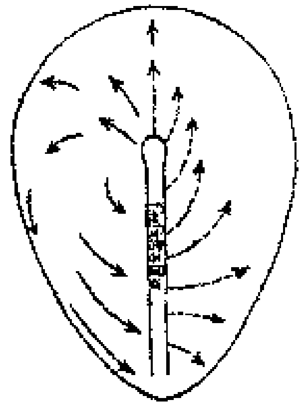

চিত্র নং 4.13 ঃ মুরগীর গ্যাস্ট্রুলেশন কালে কোষের পরিযান প্রক্রিয়া। বাম পাশে (অখণ্ড রেখা) এপিব্লাস্ট কোষের পরিযান এবং ডান পাশে (খণ্ডিত রেখা) প্রিমিটিভ স্ট্রিকের মধ্য দিয়ে উপরিতলের কোষসমূহের অভ্যন্তরে পরিযান প্রক্রিয়া চিত্র।

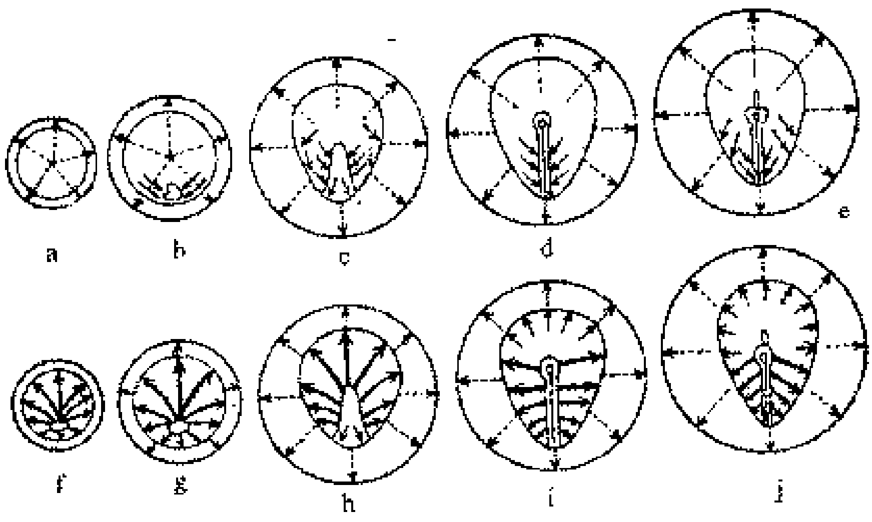

চিত্র নং 4.12 ঃ মুরগীর প্রিমিটিভ স্ট্রিক গঠনকালে ব্লাস্টোডার্মের উপরিতলে বা এপিব্লাস্টে (a - e) ও নিম্নতলে (f - j) কোষসমূহের পরিযান প্রক্রিয়ার তুলনামূলক চিত্র। কোষের পরিযান সমগ্র ব্লাস্টোডার্মের বৃদ্ধির (অখণ্ড রেখা) সঙ্গে তুলনামূলকভাবে চিহ্নিত। তুল তীর চিহ্নিত অংশ প্রিমিটিভ স্ট্রিকের অগ্রভাগ থেকে ভবিষ্যতে এন্ডোডার্ম ও মেসোডার্ম কোষসমূহের এবং হাইপোব্লাস্টের অন্তর্মুখী চলন দেখান হয়েছে (f - j)। এই সব কোষসমূহ এপিব্লাস্ট থেকে উদ্ভূত।

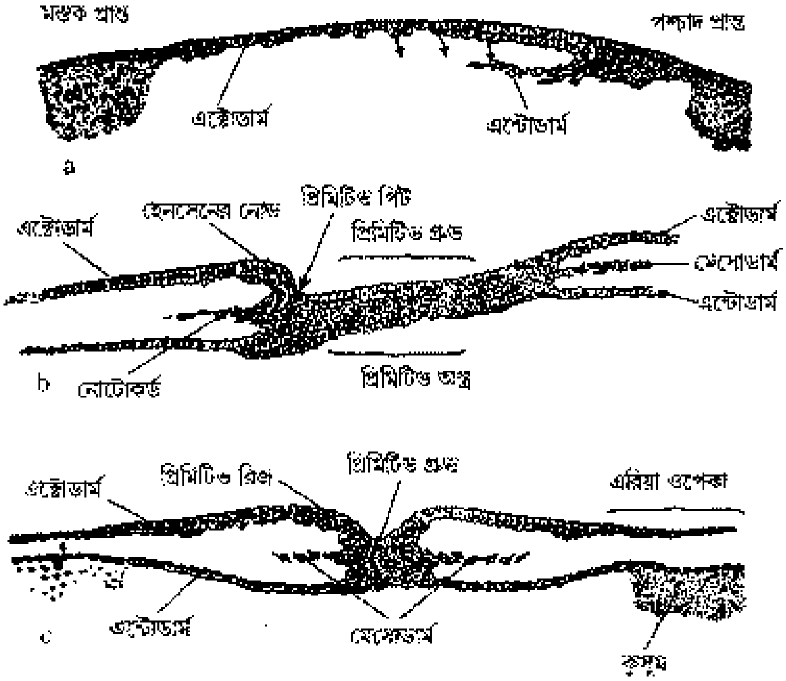

চিত্র নং 4.14 ঃ মুরগীর গ্যাস্ট্রুলেশন কালে কোষের পরিবর্তন দৃশ্যের লম্বচ্ছেদ দৃশ্য। (a - c)। প্রিমিটিভ স্ট্রিক গঠনের পূর্বে এন্টোডার্ম গঠন অবস্থা (a) এন্টোডার্ম ও এক্টোডার্মের গঠন ও হেনসেনের নোড ও প্রিমিটিভ গ্রুভ ধরে কোষসমূহের অন্তর্মুখী চলন ও মেসোডার্ম গঠন (b - c)। ইনকিউবেশনের প্রায় 17 ঘণ্টা পরের অবস্থা (b)।

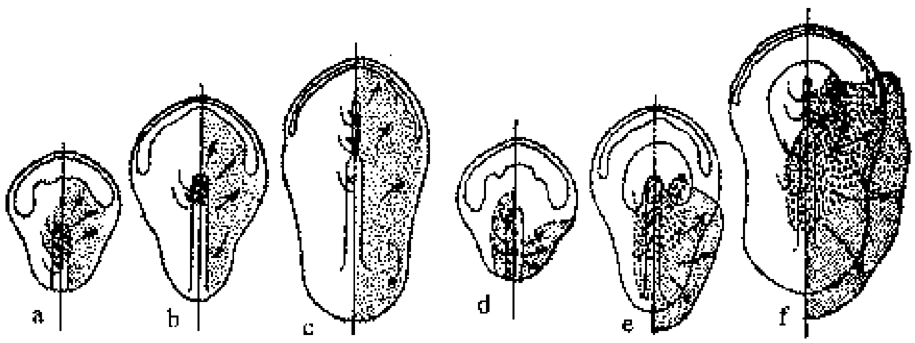

চিত্র নং 4.15 ঃ প্রিমিটিভ স্ট্রিকের মধ্য দিয়ে কোষ পরিযানের মাধ্যমে এন্টোডার্ম ও মেসোডার্ম গঠন চিত্র। এন্টোডার্ম গঠন ও কোষ পরিযান প্রক্রিয়া (a - c) এবং মেসোডার্ম স্তরের প্রসারণ এবং ক্রমশঃ ভবিষ্যৎ মেসোডার্ম অঞ্চল গঠন চিত্র (d - f)। খণ্ডিত রেখা এপিব্লাস্ট কোষসমূহের ও অখণ্ড রেখা সমূহ বিভিন্ন কোষের অন্তর্মুখী পরিযান নির্দেশক।

একক 5 □ অরগানাইজার (Organizer)

গঠন

5.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

5.2 অরগানাইজার বিশ্লেষণে ট্রানসপ্ল্যান্টেশন পরীক্ষার গুরুত্ব

5.3 নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় গ্রে ক্রিসেন্ট

5.3.1 গ্রে ক্রিসেন্টের পরিণতি

5.4 ব্লাস্টোপোরের উপরি অঞ্চলের তাৎপর্য

5.5 ভ্রূণগঠনে ইনডাকশনের গুরুত্ব

5.6 পরিস্ফুরণে ইনডাকশন ও কমপিটেনস্-এর সম্পর্ক

5.7 অরগানাইজারের সংগঠন

5.7.1 প্রাইমারী অরগানাইজার

5.8 ইনডাকশনের ক্রিয়া

5.9 ইনডাকশনের রাসায়নিক প্রকৃতি

5.10 অরগানাইজারের উদ্দীপক বস্তুর বিস্তার

5.11 সারাংশ

5.12 প্রশ্নাবলী

5.13 উত্তরমালা

5.1 প্রস্তাবনা

উচ্চতর প্রাণীদের ব্যক্তিজনিক পরিস্ফূরণ মুখ্যত এককোষী অবস্থায় আরম্ভ হয়। এই কোষটি হ'ল শুক্রাণু ও ডিম্বাণুর মিলনের ফলে উদ্ভূত জাইগোট। এই পুস্তকের আগের এককে আপনারা বিশদভাবে জেনেছেন যে, জাইগোট সমবিভাজন অর্থাৎ মাইটোসিস কোষ বিভাজন দ্বারা অসংখ্য অপত্য কোষ উৎপন্ন করে। সৃষ্ট কোষগুলিকে ব্লাস্টোমিয়ার বলে। ব্লাস্টোলেশনের সময় সমগোষ্ঠীভুক্ত ব্লাস্টোমিয়ারগুলি ব্লাস্টুলার গায়ে বিশেষ রীতিতে সজ্জিত থাকে। ব্লাস্টুলার কোষগুলির সঞ্চালনের ক্ষমতা থাকে না। বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে ভ্রূণতত্ত্ববিদগণ ব্লাস্টুলাতে কোষ গোষ্ঠীর অবস্থান নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। গ্যাসট্রুলেশন দশা আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে ব্লাস্টুলার মধ্যে নানান পরিবর্তন সূচিত হয় এবং ব্লাস্টুলা গ্যাস্ট্রুলায় রূপান্তরিত হয়। গ্যাস্ট্রুলেশনের সময় কোষগুলির সঞ্চালনের ক্ষমতা অর্জন করে এবং তাদের অবস্থান পরিবর্তন করে বিশেষভাবে বিন্যস্ত হয় ও ভাবী ভ্রূণের গঠন অনুসারে বিভিন্ন অঙ্গ সৃষ্টি করে। ফলে ভ্রূণের পরিস্ফূরণ হয় সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক।

স্বাভাবিক পরিস্ফূরণে ভ্রূণের কোষসমূহের মধ্যে নানা ধরণের প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়। ভ্রূণ গঠনের সময় কতকগুলি কোষগোষ্ঠীর স্বপরিস্ফূরণের ক্ষমতা থাকে। অর্থাৎ ঐ কোষগোষ্ঠী অন্য কোষগোষ্ঠীর প্রভাব

ছাড়াই নিজেরা তাদের নির্দিষ্ট ভাবী ভ্রূণাঙ্গ গঠনে সক্ষম হয়; কিন্তু কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। সেই সব কোষগোষ্ঠী অন্য কোষগোষ্ঠীর প্রভাব ও উদ্দীপনা ছাড়া নির্দিষ্ট ভ্রূণাঙ্গ গঠনে অক্ষম। সেক্ষেত্রে বিশেষ কোষগোষ্ঠী উদ্দীপকের কাজ করে এবং উদ্দীপিত কোষগোষ্ঠী নির্দিষ্ট ভ্রূণাঙ্গ গঠন করে। উদাহরণস্বরূপ গ্যাস্ট্রুলেশনের মধ্য দশায় এক্টোডার্ম স্তরের উল্লেখ করা যায়। সাধারণত এক্টোডার্ম স্তরের কোষ থেকে ত্বক গঠিত হয়। কিন্তু কর্ডামেসোডার্ম নামক বিশেষ কোষগোষ্ঠীর সংস্পর্শে ও প্রভাবে এক্টোডার্ম থেকে নার্ভতন্ত্র গঠিত। ভ্রূণতত্ত্বে এই ধরণের উদ্দীপককে *ইনডাকটর* (Inductor) বলে এবং এই উদ্দীপনা প্রক্রিয়াকে *ইনডাকশন* বা *আবেশ* (Induction) বলে। ইনডাকশন প্রক্রিয়া যখন শক্তিশালী ও সক্রিয় হয়ে উদ্দীপিত কোষগুলিকে একটি সম্পূর্ণ ভ্রূণাঙ্গ পরিস্ফূরণে সক্ষম তখন সেই উদ্দীপককে *অরগানাইজার* (Organizer) বলে। হ্যান্স স্পেমান (Hans Spemann) এবং তাঁহার ছাত্র ট্রাইটন (উভচর প্রাণী) গণের অন্তর্গত দুটি প্রজাতির ভ্রূণের মধ্যে প্রতিস্থাপন পরীক্ষার দ্বারা ভ্রূণ গঠনে অরগানাইজারের উপস্থিতি ও প্রভাবকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। অরগানাইজার আবিষ্কারের জন্য 1935 খ্রীষ্টাব্দে স্পেম্যান নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন। এই এককে অরগানাইজারের উপস্থিতি, প্রকৃতি ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- ব্যক্তিজনিক পরিস্ফূরণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা করতে সক্ষম হবেন।
- ভ্রূণের বিভিন্ন অঙ্গগঠনে কোষগোষ্ঠীর প্রতিক্রিয়া ও ভূমিকা নির্ধারণ করতে পারবেন।
- ভ্রূণতত্ত্ববিদ দ্বারা অনুষ্ঠিত বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে অরগানাইজারের উপস্থিতি, তার প্রকৃতি, কার্যকারিতা ও গুরুত্ব নিরূপণ করতে পারবেন।
- কোন কোন কোষগোষ্ঠী থেকে ভ্রূণের কি কি অঙ্গ সৃষ্টি হয় তা সঠিকভাবে নির্দেশ করতে পারবেন।

5.2 অরগানাইজার বিশ্লেষণে ট্রান্সপ্লান্টেশন পরীক্ষার গুরুত্ব

ট্রান্সপ্লান্টেশন বা প্রতিস্থাপন (Transplantation) পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা ভ্রূণাঙ্গের উৎপত্তি সম্বন্ধে অনেক ভ্রূণতত্ত্ববিদ্ সুস্পষ্ট বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম হয়েছেন। সব পরীক্ষার বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে তাৎপর্যপূর্ণ পরীক্ষাগুলি আলোচনা করা হয়েছে। এই ধরণের প্রতিস্থাপনের পরীক্ষা বিভিন্ন বয়সী ভ্রূণের ক্ষুদ্রাকার অংশ খণ্ডিত করে সেই খণ্ডটি সেই ভ্রূণে বা অন্য কোন ভ্রূণে ক্ষত সৃষ্টি করে সেটিকে স্থাপন করা হয়। ভ্রূণাবস্থায় এই ধরণের বস্তু সহজেই প্রতিস্থাপন করা যায়। যখন একই ভ্রূণের কোন খণ্ডিত অংশ সেই ভ্রূণের অন্য কোন স্থানে স্থাপন করা হয় তাকে *অটোপ্লাস্টিক প্রতিস্থাপন* (Autoplastic Transplantation) বলে। যখন এই ধরণের পরীক্ষা একই প্রজাতিভুক্ত ভ্রূণের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তখন তাকে *হোমোপ্লাস্টিক প্রতিস্থাপন* (Homoplastic Transplantation) বলে। যখন একই গণের অধীনে দুটি প্রজাতির ভ্রূণের মধ্যে সম্পন্ন হয়, তখন তাকে *হেটেরোপ্লাস্টিক প্রতিস্থাপন* (Heteroplastic Transplantation) বলে। অরগানাইজার বিশ্লেষণে ব্যাঙ ও স্যালামেন্ডার নামক উভচর প্রাণীদের ভ্রূণে এই ধরণের প্রতিস্থাপন পরীক্ষা-নিরীক্ষা সম্পাদনের পক্ষে খুবই উপযোগী।

প্রতিস্থাপন পরীক্ষায় যখন একটি ভ্রূণের কোন বিশেষ অংশ খণ্ডিত করে অন্য একটি ভ্রূণে স্থাপন করা হয়, তখন প্রথম ভ্রূণটিকে *দাতা* (Donor), খণ্ডিত অংশটিকে *গ্রাফট* (Graft) এবং যে ভ্রূণে গ্রাফটটি স্থাপন করা হয় তাহাকে *গ্রহীতা* (Recipient) বলে। এই ধরণের পরীক্ষায় গ্রাফট কলাকে বিশেষ ধরণের রঞ্জক পদার্থ বা সূক্ষ্ম কার্বন কণা বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ দ্বারা চিহ্নিত করা হয় এবং গ্রহীতা ভ্রূণে প্রতিস্থাপিত কলার পরিণতি এবং দাতা ভ্রূণের উপর গ্রাফ্‌ট কলার প্রভাব সঠিকভাবে নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। এই ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা অরগানাইজারের উপস্থিতি ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে অনেক তত্ত্ব জানা সম্ভব হয়েছে।

5.3 নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় গ্রে ক্রিসেন্ট

ভ্রূণতত্ত্ববিদ রুক্স্‌ (Roux) 1888 খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম উভচর প্রাণীদের নিষিক্ত ডিমে একটি অর্ধচন্দ্রাকৃতি বিশিষ্ট ধূসর অঞ্চল চিহ্নিত করেন। এই অঞ্চলটিকে *গ্রে-ক্রিসেন্ট* (Gray Crescent) আখ্যা দেন। উভচর প্রাণীদের ভ্রূণ গঠনে গ্রে-ক্রিসেন্টের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা প্রতিষ্ঠা করেন (চিত্র নং 5.1)। কৃত্রিম পদ্ধতিতে নিষিক্ত ডিমকে দুটি সমান অংশে বিভক্ত করা হয় এবং প্রতিটি অংশ গ্রে-ক্রিসেন্ট বস্তুর সমান অংশ পায় — প্রতিটি খণ্ড স্বাভাবিক পরিস্ফূরণের মাধ্যমে ভ্রূণে এবং পরিশেষে ব্যাঙাচিতে পরিণত হয়। অপর একটি পরীক্ষায় ডিমকে এমনভাবে দ্বিখণ্ডিত করা হল যেন একটি অংশে সমস্ত গ্রে ক্রিসেন্ট বস্তুটি উপস্থিত থাকে এবং অপরটিতে গ্রে ক্রিসেন্ট বস্তু অনুপস্থিত থাকে। দুটি খণ্ডকে যদি আলাদাভাবে পরিস্ফূরণের সুযোগ দেওয়া হয়, তখন দেখা যাবে যে গ্রে ক্রিসেন্ট বিহীন অংশটি একটি সরল থলির আকার ধারণ করে (অর্থাৎ পরিস্ফূরণ অস্বাভাবিক) এবং গ্রে ক্রিসেন্ট সমেত অংশ স্বাভাবিকভাবে বৃদ্ধি পায়। ক্লিভেজ দশায় পরিণত হবার আগে যদি নিষিক্ত ডিম থেকে গ্রে ক্রিসেন্ট বস্তুটি অপসারণ করা হয়, তাহলে স্বাভাবিক পরিস্ফূরণ বিঘ্নিত হবে।

5.3.1 গ্রে ক্রিসেন্টের পরিণতি

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, বিশেষ ধরণের রঞ্জক বস্তু, কয়লার সূক্ষ্ম কণা বা তেজস্ক্রিয় পদার্থ দিয়ে গ্রে ক্রিসেন্ট বস্তুটি চিহ্নিত করে তার রূপান্তর নির্ধারণ করা সম্ভব। বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, গ্রে ক্রিসেন্ট বস্তুটি গ্যাসট্রুলার প্রাথমিক দশায় ব্লাস্টোপোরের উপরের অংশে অবস্থান করে এবং পরে-গ্যাসট্রুলা যখন ভ্রূণে পরিণত হয়-ঐ বস্তু গঠনরত পৌষ্টিক নালীর পৃষ্ঠতলের এণ্ডোডার্মের উপরিভাগে নির্দিষ্ট স্থানে বিস্তৃত হয়।

অনুশীলনী - 1

(a) উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন :

1. নার্ভতন্ত্র গঠনে ______________ ইনডাকটরের কাজ করে।
2. ইনডাকটরের প্রভাবে নার্ভতন্ত্র গঠনকে ______________ বলে।
3. স্পেমান ____________ খ্রীষ্টাব্দে ______________ আবিষ্কার করেন এবং ______________ পুরস্কারে ভূষিত হন।

4. উভচর প্রাণীদের ______________ ডিমে ______________ ক্রিসেন্ট ভ্রূণ গঠনে ______________ ভূমিকা নেয়।

5. গ্রে ক্রিসেন্ট ______________ প্রাথমিক দশায় ______________ উপরের অঞ্চলে অবস্থান করে।

(b) সঠিক উত্তরটিতে (√) চিহ্ন এবং ভুলটিতে (X) চিহ্ন দিন -

1. ভ্রূণাবস্থায় সকল কোষের স্বপরিস্ফুরণের ক্ষমতা থাকে।
2. নার্ভতন্ত্র গঠনে ইনডাকটরের প্রয়োজন হয়।
3. ইয়ামাদা অরগানাইজার আবিষ্কার করেন।
4. গ্রে-ক্রিসেন্ট ব্যতীত উভচর প্রাণীদের ভ্রূণ গঠিত হয় না।
5. হোমোপ্লাস্টিক প্রতিস্থাপন একই প্রজাতিভুক্ত ভ্রূণের মধ্যে সম্পন্ন হয়।

5.4 ব্লাস্টোপোরের উপরি অঞ্চলের তাৎপর্য

গ্যাসট্রুলেশন দশায় প্রথমে গ্রে ক্রিসেন্ট ব্লাস্টোপোরের উপরের অংশে অর্থাৎ ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর (Dorsal lip of blastopore) অংশে অবস্থান করে। গ্যাসট্রুলার প্রথম অবস্থায় একটোডার্ম স্তরের কোষগুলি অনির্দিষ্ট অবস্থায় থাকে অর্থাৎ কোষগুলি নানাভাবে বিভেদিত হতে পারে। কিন্তু গ্যাসট্রুলেশন দশার শেষ অবস্থায় এক্টোডার্মের পরিস্ফূরণ সাধারণ থেকে নির্দিষ্ট দিকে স্থির হয়।

উভচর প্রাণীদের স্বাভাবিক পরিস্ফূরণে গ্যাসট্রুলার ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোরের ঠিক উপরে অবস্থিত এক্টোডার্ম থেকে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র গঠিত হয়। ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপার কর্ডা মেসোডার্ম (chorda mesoderm)কোষ দ্বারা গঠিত এবং পরে নোটোকার্ড ও মেসোডার্মে রূপান্তরিত হয়। ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোরকে সংক্ষেপে কর্ডা মেসোডার্ম (Chorda mesoderm) বলা হয়।

স্পেমান (Spemann) এবং তাঁর ছাত্ররা প্রতিস্থাপন পরীক্ষার সাহায্যে ভ্রূণের নার্ভতন্ত্র গঠনে ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোরের প্রভাব সঠিকভাবে প্রমাণ করেছেন। পরিস্ফূরণে "অরগানাইজার" (Organizer) আবিষ্কার যে পরীক্ষার ফলশ্রুতি তা নীচে বর্ণনা করা হল:

পরীক্ষার উপকরণ রূপে তাঁরা একই গণের অন্তর্গত দুটি প্রজাতির স্যালামেন্ডার নির্বাচিত করেছিলেন। *ট্রাইটন ক্রিসটেটাস* (Triton cristatus) -এর ডিমে কোন রঞ্জক কণা থাকে না - ফলে ডিমটি বর্ণহীন। কিন্তু *ট্রাইটন টিনিয়েটাস* (Triton taeniatus) -এর ডিমের সাইটোপ্লাজমে রঞ্জক কণা উপস্থিতির ফলে ডিমগুলি রঙীন হয়। ক্লিভেজ দশায় সৃষ্ট কোষগুলিতে রঞ্জক কণা উপস্থিত থাকে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে দুই প্রজাতির কোষের পার্থক্য স্পষ্ট হয়। স্পেমান পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর যদি সেই ভ্রূণে কিংবা অন্য কোন সমবয়সী ভ্রূণের একটোডার্ম স্তরে প্রতিস্থাপন করা হয়, দাতা কোষগোষ্ঠী গ্রহীতার সেই অংশে একটি অতিরিক্ত ভ্রূণাক্ষ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। চিত্র নং 5.2-এ প্রদর্শিত পরীক্ষার মত যদি ক্রিস্টেটাস প্রজাতির বর্ণহীন ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর কলা কেটে নিয়ে টিনিয়েটাস প্রজাতির সমবয়সী ভ্রূণে প্রতিস্থাপন করা হয়,

তাহলে দেখা যাবে যে, সৃষ্ট অতিরিক্ত ভ্রূণটির দেহ গ্রহীতা অর্থাৎ ট্রিনিয়েটাস কোষ থেকে গঠিত হয়। দাতার কোষ থেকে কেবলমাত্র নোটোকর্ড ও মেসোডার্ম উদ্ভূত অঙ্গসমূহ গঠিত হয়। এই পরীক্ষায় প্রমাণ হয় যে, উভচর প্রাণীদের পরিস্ফুরণে দাতা কোষসমষ্টি নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। সুতরাং পরিস্ফুরণে "অরগানাইজার"-এর উপস্থিতি সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত (চিত্র নং 5.3)।

5.5 ভ্রূণ গঠনে ইনডাকশনের গুরুত্ব

আগের বিবরণ থেকে প্রমাণিত হয়েছে যে ভ্রূণ পরিস্ফুরণে কোন বিশেষ কোষগোষ্ঠী নির্দিষ্ট গঠন ক্রিয়ায় পারিপার্শ্বিক কোষগোষ্ঠীর সহযোগিতা ও সহক্রিয়া ওপর নির্ভরশীল। উভচর প্রাণীদের ভ্রূণে নার্ভতন্ত্র গঠনে এই মত প্রমাণিত। নিউরাল প্লেট গঠন কালে ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোরের কোষসমূহ গ্যাসট্রুলেশনের সময় ভ্রূণের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এবং পরিস্ফুরণরত আরকেনটেরন বা ভাবী পৌষ্টিক নালীর পৃষ্ঠতলের উপরিভাগে অবস্থান করে। যখনই ঐ কোষগুলি ভ্রূণের এক্টোডার্মের সংস্পর্শে আসে, তখনই এক্টোডার্ম কোষসমূহ থেকে নার্ভতন্ত্র গঠনের সূত্রপাত হয়। ডরসাল লিপ ব্লাস্টোপোরের কোষ গোষ্ঠী এক্টোডার্মকে নার্ভতন্ত্র গঠনে প্রভাব বিস্তার করে। এই ধরণের আবেশ বা প্রভাবকে ভ্রূণতত্ত্বে *এম্ব্রিওনিক ইনডাকশন* বলে এবং আবেশের উৎস কলাকে আবেশকারী বা ইনডাকটর বলে। হলফ্রেটারের একসোগ্যাসট্রুলেশন পরীক্ষা (Exogastrulation experiment of Holtfreter) পরোক্ষভাবে ভ্রূণ পরিস্ফুরণের আবেশের সত্যতা প্রতিষ্ঠা করে। হলফ্রেটার 0.35 % সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণে উভচর প্রাণীর গ্যাসট্রুলা রেখে দেখিয়েছেন যে, কোষসমূহ গ্যাসট্রুলার অভ্যন্তরে প্রবেশ না করে বাইরে প্রসারিত হয়ে একটি উপবৃদ্ধি গঠন করেছে। (চিত্র নং 5.4) এবং নার্ভতন্ত্রের পরিস্ফুরণ হয় নি। এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে এক্টোডার্মের নার্ভতন্ত্র পরিবর্তনের জন্য আবেশকারী কোষের সংস্পর্শ বা প্রভাব অপরিহার্য।

5.6 পরিস্ফুরণে ইনডাকশন ও কমপিটেনস্-এর সম্পর্ক

ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর কোষের সংস্পর্শে ও প্রভাবে গ্যাসট্রুলার উপরিভাগের এক্টোডার্ম থেকে নার্ভতন্ত্র গঠিত হয়। কিন্তু ব্লাস্টুলা দশায় যদি নির্দিষ্ট এক্টোডার্ম নার্ভতন্ত্র আবেশকারী কোষগোষ্ঠীর সংস্পর্শে আসে নার্ভতন্ত্র গঠিত হয় না। কেবলমাত্র গ্যাসট্রুলা দশার মধ্য ও শেষপর্বে এক্টোডার্ম স্তর আবেশকারী কোষের প্রভাবে নার্ভতন্ত্র গঠনে সক্ষম হয়। নার্ভতন্ত্র গঠনে কোষসমূহের বিক্রিয়া গ্যাসট্রুলার প্রথম অবস্থায় কার্যকরী হয়, মধ্যদশায় শীর্ষে পৌঁছোয় এবং গ্যাসট্রুলার শেষ দশায় ক্রমশ হ্রাস পায়। এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, নার্ভতন্ত্র গঠনকারী কোষগুলি একটি বিশেষ অবস্থায় থাকে যখন আবেশকারী কোষসমূহ থেকে সৃষ্ট আবেশ বা উদ্দীপনা গ্রহণ করে নির্দিষ্ট দিকে গঠিত হয়। অর্থাৎ নার্ভতন্ত্র গঠনে এক্টোডার্মের যোগ্যতা অর্জন অপরিহার্য। এক্টোডার্মের কার্যকারিতার এই বিশেষ অবস্থাকে *কমপিটেনস* (Competence) বলে। এক্টোডার্ম স্তরের কোষসমূহে নার্ভতন্ত্র গঠনের ক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেশকারী কোষের উপস্থিতি কেবলমাত্র নার্ভতন্ত্র গঠনে সক্ষম। উপযুক্ত অবস্থা ও সময় নার্ভতন্ত্র গঠনে অপরিহার্য। এক্টোডার্ম থেকে স্বাভাবিকভাবে ত্বক ও ত্বক থেকে সৃষ্ট আনুষঙ্গিক গঠনের উদ্ভব হয়। কিন্তু আবেশকারী কোষসমূহের প্রভাবে এক্টোডার্ম নার্ভতন্ত্রের দিকে নির্দেশিত হয়।

5.7 অরগানাইজারের সংগঠন

উভচর প্রাণীদের ভ্রূণ পরিস্ফুরণ সম্বন্ধে বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষার দ্বারা ভ্রূণতত্ত্ববিদরা অরগানাইজারের প্রকৃতি ও ক্রিয়া সম্বন্ধে নানা তত্ত্ব লিপিবদ্ধ করেছেন।

গ্যাসট্রুলার প্রথম দশায় ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর (আবেশকারী কোষগোষ্ঠী) যখন একই প্রজাতির অন্য কোন সমবয়সী গ্যাসট্রুলার এক্টোডার্মে প্রতিস্থাপন করা হয়, তখন একটি সম্পূর্ণ অতিরিক্ত ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। সেইজন্য ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোরকে *প্রাইমারি অরগানাইজার* (Primary Organizer) বলে। প্রাইমারি অরগানাইজার উভচর প্রাণীদের ক্ষেত্রে নিষিক্ত ডিমের গ্রে ক্রিসেন্ট থেকে উৎপন্ন হয়।

উভচর প্রাণীদের ভ্রূণের ক্ষেত্রে 'অরগানাইজার' সমসত্ত্ব প্রকৃতির হয় না। এটা কর্ডা মেসোডার্ম দ্বারা গঠিত হয়। পরীক্ষার সাহায্যে অরগানাইজারের অঞ্চলভিত্তিক প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গ্যাসট্রুলেশনের সময় আরগানাইজার কোষসমূহ ভ্রূণের পরিস্ফুরণরত পৌষ্টিক নালী বা আরকেনটেরন (Archenteron) -এর পৃষ্ঠতলে অবস্থান করে। আরকেনটেরনের পৃষ্ঠতলের অগ্রাংশ খণ্ডিত করে সেই প্রজাতির সমবয়সী অন্য একটি ভ্রূণে প্রতিস্থাপন করলে একটি অতিরিক্ত মস্তক সৃষ্টি হয় (চিত্র নং 5.5 দ্রষ্টব্য)।

সেইজন্য আরকেনটেরনের পৃষ্ঠতলের অগ্রাংশকে হেড অরগানাইজার (Head Organizer) বলে। আরকেনটেরনের পৃষ্ঠতলের পশ্চাৎ অংশ প্রতিস্থাপন করলে দেহকাণ্ড ও লেজ গঠিত হয়। সেইজন্য পশ্চাৎ অংশকে *ট্রাঙ্ক বা স্পাইনোকর্ডাল অরগানাইজার* (Trunk or Spinocaudal) বলে। হেড অরগানাইজারের মধ্যে অঞ্চলভিত্তিক আবেশের ক্ষমতা বর্তমান। হেড অরগানাইজারের যে অংশটি অগ্রমস্তক এবং চক্ষু পরিস্ফুরণে প্রভাব বিস্তার করে তাকে *আরকেনসেফালিক অরগানাইজার* (Archencephalic Organizer) বলে এবং যে অংশটি পশ্চাৎ মস্তিষ্ক ও কর্ণ ভেসিকল গঠনে সাহায্য করে তাহাকে *ডিউটেরেনসেফালিক অরগানাইজার* (Deuterencephalic Organizer) বলে।

5.7.1 প্রাইমারী অরগানাইজার

উভচর প্রাণীদের ভ্রূণে প্রাইমারী অরগানাইজারের উপস্থিতি ও ক্রিয়া সর্বপ্রথম স্বীকৃত হয়। ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর প্রাইমারী অরগানাইজার রূপে কাজ করে। পাখীদের ক্ষেত্রে প্রিমিটিভ স্ট্রেকের অগ্রাংশ প্রাইমারী অরগানাইজার রূপে গণ্য করা হয়। আবেশ ক্রিয়ার ভিত্তিতে এটা ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোরের সমতুল্য। সরীসৃপ ও স্তন্যপায়ীদের ভ্রূণে পরিস্ফুরণকালে অরগানাইজারের সনাক্তকরণ ও প্রভাব সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত। পরীক্ষার সাহায্যে ওয়াডিংটন (Waddington) প্রমাণ করেছেন যে স্তন্যপায়ীদের ভ্রূণের ব্লাস্টোডিকসে মুরগীর ভ্রূণের প্রিমিটিভ স্ট্রেক প্রতিস্থাপন করলে নার্ভতন্ত্র গঠিত হয়। এই পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত হয় স্তন্যপায়ীদের গ্যাসট্রুলার এক্টোডার্মের নার্ভতন্ত্র সৃষ্টির ক্ষমতা বর্তমান।

5.8 ইনডাকশনের ক্রিয়া

ভ্রূণের পরিস্ফুরণকালে আরগানাইজার বা ইনডাকটরের ক্রিয়া পর্যায়ক্রমে সংঘটিত হয় এবং একটি অপরকে নির্দিষ্ট অঙ্গ গঠনে ধারাবাহিকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। প্রাইমারী অরগানাইজার বা ইনডাকটর ভ্রূণের মস্তিষ্ক

সৃষ্টিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে। মস্তিষ্ক গঠনকালে এর অগ্রভাগ মস্তকের পার্শ্বস্থ এক্টোডার্মকে প্রভাবিত করে চক্ষু গঠনে সাহায্য করে। কর্ণ গঠনেও এই একই ধরণের আবেশ ক্রিয়ার পুনরাবৃত্তি ঘটে। এইভাবে সেকেণ্ডারী ইনডাকটর (Secondary inductor), টারসিয়ারী ইনডাকটর (Tertiary inductor) এর উপস্থিতি প্রমাণিত। চক্ষুর পরিস্ফুরণে ইনডাকটর ধাপে ধাপে কাজ করে এবং পরস্পরের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে। প্রাইমারী ইনডাকটরের প্রভাবে মস্তিষ্ক গঠিত হয়। অগ্র মস্তিষ্কের পার্শ্বদেশ থেকে দুটি উপবৃদ্ধি আকার অপটিক ভেসিকল সৃষ্টি হয়। অপটিক ভেসিকলের অগ্রভাগ পার্শ্বস্থ এক্টোডার্মে স্পর্শ করলে এক্টোডার্ম থেকে অপটিক কাপ তৈরী হয়।

মস্তিষ্ক গঠন প্রাইমারী ইনডাকশনের উদাহরণ। অপটিক ভেসিকলের প্রভাবে অপটিক কাপ সৃষ্টি সেকেণ্ডারী ইনডাকশনের উদাহরণ। সৃষ্ট অপটিক কাপ উপরিভাগের এক্টোডার্মকে প্রভাবিত করে কর্ণিয়া গঠনে নির্দেশ দেয়। কর্ণিয়া গঠন টারসিয়ারী ইনডাকশনের উদাহরণ।

5.9 ইনডাক্‌শনের প্রকৃতি

উভচরদের ভ্রূণ পরিস্ফুরণে নার্ভতন্ত্র গঠনে এক্টোডার্মের উপর কর্ডামেসোডার্মের সম্পর্ক স্বীকৃত। কর্ডামেসোডার্ম কোষগোষ্ঠী গ্যাসট্রুলার অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আরকেনটেরণের পৃষ্ঠতলে প্রসারিত হয় এবং উপরিভাগে অবস্থিত এক্টোডার্ম স্তরকে নার্ভতন্ত্র গঠনে উদ্দীপিত করে। নার্ভতন্ত্র গঠনে দুই ধরণের কোষসমূহের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক বর্তমান। কর্ডামেসোডার্ম এক্টোডার্মকে উপযুক্ত উদ্দীপনা প্রদান করে- ফলে এক্টোডার্ম নার্ভতন্ত্র গঠনের দিক নির্দেশিত হয়। এই ঘটনার দুটি ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব — (a) দুটি স্তরের প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন অথবা (b) রাসায়নিক বিক্রিয়ার উপস্থিতি।

এই বিষয়ে আলোকপাত করবার জন্য অনেক ভ্রূণতত্ত্ববিদ নানা ধরণের পরীক্ষা নিরীক্ষা উপস্থাপন করেছেন।

(a) স্পিম্যান এবং ম্যানগোল্ড (Spemann and Mangold) 1932 সালে অরগানাইজার কোষগোষ্ঠীকে গরম জলে সিদ্ধ করে অ্যালকোহল কিংবা পেট্রোল / ইথার প্রয়োগ করার পরে স্বাভাবিক গ্যাসট্রুলায় প্রতিস্থাপন করেন। মৃত অরগানাইজার যথাস্থানে প্রতিস্থাপন করলে নার্ভতন্ত্র গঠিত হয়। এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ইনডাকশনের জন্য অরগানাইজার কোষের জীবিত অবস্থার কোন প্রয়োজন হয় না। মৃত কোষগুলি যথাযথ উদ্দীপনা বা প্রভাব বিস্তারে সক্ষম।

(b) স্যাক্সেন (Saxen) 1961 সালে পরীক্ষার দ্বারা রাসায়নিক বস্তুর উপস্থিতি প্রমাণ করেছেন। তিনি একটি পেট্রিডিসে বিশেষ দ্রবণে কর্ডামেসোডার্ম এবং উপযোগী এক্টোডার্ম স্থাপন করেন। কর্ডামেসোডার্ম ও এক্টোডার্ম একটি 20 মাইক্রণ মিউ mμ পুরু ফিলটার পেপার দ্বারা পৃথক করা থাকে। ফিলটার পেপারটির ছিদ্র সমূহের ক্ষেত্রফল 8mμ। 8mμ ক্ষেত্রফলযুক্ত ছিদ্রের মধ্য দিয়ে কোন কোষের অনুপ্রবেশ হয় না। সুতরাং কর্ডামেসোডার্ম কোষসমূহ থেকে ক্ষরিত কোন রাসায়নিক বস্তু ফিলটার পেপার ভেদ করে এক্টোডার্মকে নার্ভতন্ত্র গঠনে উদ্দীপিত করে।

(c) কিল্লে (Kelley) 1969 সালে ইলেকট্রন মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখিয়েছেন কর্ডামেসোডার্ম ও এক্টোডার্ম কোষস্তর দুটি প্রত্যক্ষভাবে স্পর্শ করে না এবং এদের মধ্যে 500A⁰ ফাঁক থাকে। কর্ডামেসোডার্ম কোষসমূহ থেকে ক্ষরিত অনুপ্রবেশকারী রাসায়নিক বস্তু এই ফাঁকা স্থানটি অতিক্রম করে এক্টোডার্মকে নার্ভতন্ত্রের দিকে নির্দেশিত করে।

অনুশীলনী - 2

(a) উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

1. ডরসাল লিপ অফ ________ কর্ডামেসোডার্ম কোষ দ্বারা গঠিত এবং এই কোষগোষ্ঠী থেকে ________ এবং ________ সৃষ্টি হয়।
2. টাইটন ________ ডিমে রঞ্জক কণা থাকে ________ , কিন্তু টাইটন ________ ডিমে রঞ্জক কণা ________ ।
3. কর্ডামেসোডার্মকে ________ আরগানাইজার বলে।
4. আরকেন্টেরনের পৃষ্ঠতলের অগ্রাংশকে ________ অরগানাইজার বলে।
5. আরকেন্টেরনের পৃষ্ঠতলের পশ্চাংঅংশকে ________ অরগানাইজার বলে।

(b) সঠিক উত্তরটিতে (√) চিহ্ন এবং ভুলটিতে (X) চিহ্ন দিন -

1. কর্ডামেসোডার্ম কোষ থেকে নার্ভতন্ত্র সৃষ্টি হয়।
2. চক্ষু ও কর্ণ গঠনে আরনাইজারের প্রভাব প্রয়োজন।
3. প্রিমিটিভ স্ট্রেকের অগ্রাংশ প্রাইমারী অরগানাইজাররূপে স্বীকৃত।
4. কর্ডামেসোডার্ম কোষের প্রভাব ছাড়া নার্ভতন্ত্র গঠিত হয় না।
5. ইনডাকশন ও কমপিটেন্স হল একই প্রক্রিয়ার দুটি নাম।

5.9 ইনডাকটরের রাসায়নিক প্রকৃতি

প্রচুর গবেষণা সত্ত্বেও ইনডাকটর বা অরগানাইজারের রাসায়নিক প্রকৃতি ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে ধারণা অসম্পূর্ণ। অনেক রাসায়নিক বস্তু, যথা, স্টেরল, ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন, গ্লাইকোজেন, ক্যানসার সৃষ্টিকারী রাসায়নিক পদার্থ, সিলিকা কণা, মৃতকলা ইত্যাদি নার্ভতন্ত্র গঠনে প্রভাব বিস্তার করে। কিন্তু ঐ কৃত্রিম উদ্দীপকবস্তু স্বাভাবিক উদ্দীপকের সমতুল্য নয়। কৃত্রিম উদ্দীপক বস্তুর প্রভাবে নার্ভতন্ত্র গঠনের সূত্রপাত হয় বটে, কিন্তু মস্তিষ্কের পূর্ণগঠন হয় না।

উভচর প্রাণীদের গ্যাসট্রুলা অবস্থায় বেশ কয়েকটি ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর খণ্ডিত করে বিশেষ ধরণের দ্রবণপূর্ণ পেট্রিডিসে 7 - 10 দিন এই অবস্থায় রাখার পর কোষখণ্ডগুলি আলাদা করা হল এবং দ্রবণটি বিশেষ ধরণের মিলিপোর ফিল্টার পেপারের সাহায্যে ছাঁকা হল। পরিশ্রুত দ্রবণে কোষ ছাড়া কেবল কোষসমূহ থেকে ক্ষরিত বস্তু উপস্থিত থাকবে। এই বিশেষ দ্রবণকে '*কনডিশনড মিডিয়াম*' (Conditioned medium) বলে। এই দ্রবণে গ্যাসট্রুলার প্রথম অবস্থা থেকে খণ্ডিত এক খণ্ড ভ্রূণ এক্টোডার্ম রাখা হল। এক থেকে তিন সপ্তাহের মধ্যে ভ্রূণ এক্টোডার্ম থেকে নার্ভকোষ ও রঞ্জক কোষ সৃষ্টি হয়। এই ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, ডারসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর কোষসমূহ থেকে ক্ষরিত বস্তুর উপযুক্ত উদ্দীপনার সাহায্যে এক্টোডার্ম কোষসমূহ নার্ভকোষ সৃষ্টিতে প্রভাব বিস্তার করেছে। স্পেকট্রোফটোমেট্রিক ও ইলেকট্রোফোরেটিক বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে যে,

উদ্দীপক বস্তুটি হল - বড় আকারের অণু বা *ম্যাক্রোমলিকিউইল* (Macromolecules) প্রধানতঃ *রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিন* (Ribonucleo proteins)। এখন প্রশ্ন হল, রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিনের কোন অংশ উদ্দীপনা জোগায়। কনডিশনস দ্রবণে পেপসিন কিংবা ট্রিপসিন প্রয়োগ করে প্রোটিন অংশকে জারিত করলে ইনডাকশনের ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত হয়। অপরপক্ষে রাইবোনিউক্লিয়েস উৎসেচক দিয়ে আর. এন. এ. অংশ নিষ্ক্রিয় করলে ইনডাকশন কিঞ্চিৎ বিঘ্নিত হয়। এই ধরণের পরীক্ষার সাহায্যে রাইবোনিউক্লিও প্রোটিনের শনাক্তকরণে জাপানের ইয়ামাদা (Yamada) এবং জার্মানির টিডম্যান (Tiedemann) - এর অবদান উল্লেখ্য।

ইনডাকটরের রাসায়নিক প্রকৃতি প্রধানত প্রোটিন। বিক্রিয়াশীল কোষসমূহের রূপান্তরের সময় আর. এন. এ (R.N.A), বিশেষ করে মেসেঞ্জার আর. এন. এ. (m R.N.A), সংযোজকের কাজ করে। গ্যাসট্রুলেশনের সময় জীনের ক্রিয়ার ফলে নতুন প্রোটিন সংশ্লেষিত হয়। সংশ্লেষিত প্রোটিনকে পরিস্ফুরণরত ভ্রূণের বিভিন্ন অংশে সঞ্চালন গ্যাসট্রুলেশন দশায় সংঘটিত হয়।

5.10 অরগানাইজারে উদ্দীপক বস্তুর বিস্তার

প্রাইমারী অরগানাইজারের কার্যকারিতা সম্বন্ধে নানা মতবাদ বর্তমান। ইয়ামাদা (Yamada, 1956) -এর মতে দু'প্রকার উদ্দীপক বস্তুর উপস্থিতির ফলে অরগানাইজারের ভিন্ন প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। উদ্দীপকগুলি হল - (a) *নিউরালাইজিং এজেন্ট* (Neuralising agent) এবং অপরটি (b) *মেসোডার্মালাইজিং এজেন্ট*। প্রথমটি কর্ডামেসোডার্মের উপরিভাগে অধিকমাত্রায় থাকে এবং পার্শ্বদিকে ক্রমশঃ হ্রাস পায়; দ্বিতীয়টি পশ্চাৎ দিকে অধিকমাত্রায় থাকে এবং অগ্রভাগে ক্রমশঃ হ্রাস পায়। দু'টি বস্তুর পরস্পর ক্রিয়ার ফলে পরিস্ফুরণে ভিন্নতার উদ্ভব হয়। হায়েশি (Hayashi, 1956) পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, নিউরালাইজিং বস্তুটি রাইবোনিউক্লোপ্রোটিন এবং মেসোডার্মালাইজিং বস্তুটি প্রোটিন। গ্যাসট্রুলেশনের সময় উদ্দীপকবস্তুর প্রভাবের ফলে এক্টোডার্মের বিকাশ নির্ধারিত হয়, যথা -

(a) গ্যাসট্রুলার এক্টোডার্ম + নিউরালাইজিং ফ্যাক্টর
= নার্ভতন্ত্র

(b) গ্যাসট্রুলার এক্টোডার্ম + মেসোডার্মলাইজিং ফ্যাক্টর
= মেসোডার্ম

(c) গ্যাসট্রুলার এক্টোডার্ম + উদ্দীপক ব্যতীত
= ত্বক্

স্বাভাবিক ভ্রূণগঠনে দুই ধরণের উদ্দীপক বস্তু আনুপাতিক ভারসাম্যের উপর নির্ভরশীল। গ্যাসট্রুলেশন প্রক্রিয়া চলাকালে গঠনরত আরকেনটেরনের উপরিতল কেবলমাত্র নিউরালাইজিং বস্তু ক্ষরণ করে এবং অগ্রমস্তিষ্ক গঠনে প্রভাব বিস্তার করে; নোটোকর্ড ও সোমাইট এই অংশে গঠিত হয় না। পশ্চাৎ ভাগে নোটোকর্ড ও সোমাইট গঠিত হয়। মধ্য অঞ্চলে নিউরালাইজিং এবং মেসোডার্মালাইজিং বস্তু দ্বয়ের মিশ্রণ ঘটে, ফলে মস্তিষ্কের পশ্চাৎভাগ এবং কর্ণ ভেসিকল সৃষ্টি হয়। আরো পশ্চাৎ অঞ্চলে মেসোডার্মা-লাইজিং বস্তুর উপস্থিতির ফলে নোটোকর্ড, মাংসপেশী উৎপন্ন হয় এবং নার্ভতন্ত্র কেবলমাত্র সুষুম্না কাণ্ড গঠনে সীমাবদ্ধ থাকে। অর্থাৎ ভ্রূণের বিভিন্ন অংশে নিউরালাইজিং ও মেসোডার্মলাইজিং বস্তুর ঘনত্ব ভিন্ন রূপ (চিত্র নং 5.6)।

এই এককে ভ্রূণ গঠনে অরগানাইজারের প্রকৃতি ও কাজ সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল। অরগানাইজার সম্বন্ধে আলোচনা উভচর ভ্রূণের পরিস্ফূরণ ক্রিয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ। কারণ অন্য মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ভ্রূণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা অসম্পূর্ণ ও সীমিত।

5.11 সারাংশ

ব্যক্তিজনিক পরিস্ফুরণে গ্যাসট্রুলা দশায় ভ্রূণের কোষসমূহের মধ্যে নানা ধরণের প্রতিক্রিয়া সংঘটিত হয়। ভ্রূণ গঠনের সময় কয়েকশ্রেণীর কোষ স্বপরিস্ফূরণের ফলে নির্দিষ্ট ভ্রূণাঙ্গ সৃষ্টি করে। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে এই ঘটনার ব্যতিক্রম থাকে। বিশেষ কোষগোষ্ঠীর প্রভাব ও উদ্দীপনা ছাড়া কোষসমূহ নির্দিষ্ট ভ্রূণাঙ্গ গঠনে সক্ষম হয় না। ভ্রূণের নার্ভতন্ত্র গঠনে এই ধরণের ঘটনা সুস্পষ্ট।

ভ্রূণের এক্টোডার্ম কোষস্তর থেকে স্বাভাবিকভাবে নার্ভতন্ত্র সৃষ্টি হয়। কিন্তু কর্ডামেসোডার্ম কোষের প্রভাবে ভ্রূণের একটোডার্ম নার্ভতন্ত্র গঠন করে। এই ধরণের প্রক্রিয়াকে *ইনডাকশন*, এবং কর্ডামেসোডার্মকে *ইনডাকটর* বা *অরগানাইজার* বলে। স্পেম্যান এবং তাঁর ছাত্র সর্বপ্রথম উভচর প্রাণীদের ভ্রূণে পরীক্ষা -নিরীক্ষার সাহায্যে অরগানাইজার আবিষ্কার করেন এবং 1935 খ্রীষ্টাব্দে নোবেল পুরস্কারে ভূষিত হন।

রাসায়নিক বিশ্লেষণের দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, ইনডাকটর কোষ থেকে ক্ষরিত রাসায়নিক বস্তুটি রাইবোনিউক্লিওপ্রোটিন। অরগানাইজারের রাসায়নিক প্রকৃতি প্রধানত প্রোটিন। বিক্রিয়াশীল কোষসমূহের রূপান্তরের সময় মেসেঞ্জার আর. এন. এ. সংযোজকের কাজ করে।

5.12 প্রশ্নাবলী

1. অরগানাইজার কি? ভ্রূণগঠনে অরগানাইজারের গুরুত্ব কি?
2. অরগানাইজার বিশ্লেষণে ট্রানসপ্লান্টেশন পরীক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
3. গ্রে-ক্রিসেন্ট বস্তু কোথায় থাকে ? কেন একে ভ্রূণগঠনের নিয়ন্ত্রক বলা হয়?
4. কোন পরীক্ষার দ্বারা স্পেম্যান অরগানাইজার আবিষ্কার করেন।
5. ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোরকে প্রাইমারী অরগানাইজার বলে কেন?
6. মস্তিষ্কের কোন অংশ চক্ষু গঠনে অরগানাইজারের কাজ করে?
7. অরগানাইজারের রাসায়নিক প্রকৃতি উদ্ঘাটনে সাকসেন ও কিপ্লের অবদান সম্বন্ধে আলোচনা করুন।
8. "কনডিশনড় মিডিয়াম" কাকে বলে?
9. অরগানাইজার থেকে উদ্ভূত উদ্দীপক বস্তুর রাসায়নিক প্রকৃতি কি?
10. অরগানাইজার বিশ্লেষণে ইয়ামাদা ও টিডম্যানের অবদান কি?

5.13 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1

(a) 1. কর্ডামেসোডার্ম

2. ইনডাকশন

3. 1935, অরগানাইজার, নোবেল

4. নিষিক্ত, গ্রে, নিয়ন্ত্রকের

5. গ্যাসট্রুলার, ব্লাস্টোপোরের

(b) 1. **(X)**, 2. **(√)**, 3. **(X)**, 4. **(√)**, 5. **(√)**

অনুশীলনী - 2

(a) 1. ব্লাস্টোপোর, নোটোকর্ড, মেসোডার্ম

2. ক্রিসটেটাসের, না, টিনিয়েটাসের, থাকে

3. প্রাইমারী, নেয়েঙ্ক

4. হেড

5. ট্রাঙ্ক

(b) 1. **(X)**, 2. **(√)**, 3. **(√)**, 4. **(√)**, 5. **(X)**

প্রশ্নাবলী উত্তর

1. ভ্রূণ পরিস্ফুরণে এক শ্রেণীর কোষ অন্য কোষগোষ্ঠীকে কোন একটি নির্দিষ্ট ভ্রূণাঙ্গ গঠনে সক্রিয় উদ্দীপনা জোগায়। উদ্দীপক কোষগোষ্ঠীকে ইনডাক্টর বা অরগানাইজার বলে। স্পেমান প্রথম অরগানাইজার আবিষ্কার করেন।

   অরগানাইজার ছাড়া ভ্রূণের বেশ কয়েকটি অঙ্গ সৃষ্টি হয় না। উদাহরণ স্বরূপ - নার্ভতন্ত্র, চক্ষু, কর্ণ প্রভৃতি অরগানাইজারের প্রভাব ছাড়া গঠিত হয় না।

2. এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য এই এককের 5.2 অংশ দেখুন।

3. উভচর প্রাণীদের নিষিক্ত ডিমে উপস্থিত অর্ধচন্দ্রাকৃতি বিশিষ্ট ধূসর অঞ্চলকে গ্রে-ক্রিসেন্ট বলে। গ্রে-ক্রিসেন্টের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা 5.3 অংশে বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

4. এই প্রশ্নটির উত্তরের জন্য এই এককের 5.4 এর তৃতীয় অনুচ্ছেদ দেখুন।

5. গ্যাসট্রুলার প্রথম দশায় ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোরকে সেই প্রজাতির সমবয়সী অন্য ভ্রূণে প্রতিস্থাপন করলে একটি সম্পূর্ণ অতিরিক্ত ভ্রূণ সৃষ্টি হয়। সেইজন্য একে প্রাইমারী অরগানাইজার বলে।

6. মস্তিষ্ক গঠনের সময় এর অগ্রভাগ পার্শ্বস্থ একটোডার্মকে চক্ষু গঠনে সাহায্য করে।

7. 5.8 এর তৃতীয় ও চতুর্থ অনুচ্ছেদ দেখুন।

8. 5.9 এর দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ দেখুন।

9. স্পেকট্রোফটোমেট্রিক ও ইলেকট্রোফোরেটিক বিশ্লেষণের সাহায্যে প্রমাণিত হয়েছে যে, বস্তুটি হল - ম্যাক্রোমলিকিউইল, প্রধানত রাইবো-নিউক্লিওপ্রোটিন। প্রোটিনের গুরুত্ব আর. এন. এ অপেক্ষা বেশী। আর. এন. এ. প্রোটিন সংশ্লেষে সহায়তা করে।

10. 5.9 অংশের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শেষ অংশ দেখুন।

একক - 5 এর চিত্রাবলী

চিত্র নং 5.1 - উভচর প্রাণীদের ভ্রূণ গঠনে গ্রে-ক্রিসেন্টের প্রভাব দেখানো হয়েছে। a_1 = দুইটি ব্লাস্টোমিয়ারের পৃথকীকরণ - একটি গ্রে ক্রিসেন্ট থাকে এবং অন্যটিতে থাকে না। যে ব্লাস্টোমিয়ারে গ্রে ক্রিসেন্ট অনুপস্থিত সেটি স্বাভাবিক গঠনে অক্ষম। b_1 = দুইটি ব্লাস্টোমিয়ারে গ্রে ক্রিসেন্ট সমানভাবে উপস্থিত - পরিস্ফুরণ হয় স্বাভাবিক।

চিত্র নং 5.2 - ব্যাঙের গ্যাসট্রুলার ডরসাল লিপ অফ ব্লাস্টোপোর (1-2) প্রতিস্থাপনের ফলে অতিরিক্ত ভ্রূণের উদ্ভব।

চিত্র নং 5.3 - ট্রাইটন নামক উভচর প্রাণীর গ্যাসট্রুলায় কর্ডামেসোডার্ম প্রতিস্থাপনের ফলে উদ্ভূত অতিরিক্ত ভ্রূণের উৎপত্তি। প্রস্থচ্ছেদটিতে হোস্ট নিউরাল টিউব ছাড়া প্রতিস্থাপিত কর্ডামেসোডার্মের প্রভাবে গঠিত ইনডিউজ নিউরাল টিউব দেখানো হয়েছে।

চিত্র নং 5.4 - উভচর প্রাণীদের গ্যাস্ট্রুলেশনের সময় কোষসমূহের সঞ্চালন দেখানো হয়েছে। ক- খ স্বাভাবিক অবস্থায় গ্যাসট্রুলার বাইরের দিক থেকে কোষসমূহ ব্লাস্টোপোরের মধ্যে দিয়ে অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। গ-ঘ = হলফ্রেটারের এক্সোগ্যাসট্রুলেশন পরীক্ষা।

চিত্র নং 5.5 - উভচর প্রাণীদের ভ্রূণে হেড এবং ট্রাঙ্ক অরগানাইজার।

চিত্র নং 5.6 - উভচর প্রাণীদের গ্যাসট্রুলায় নিউরোলাইজিং বস্তু (N_1 - N_6) এবং মেসোডার্মালাইজিং বস্তুর (M_1 - M_4) বিস্তার দেখানো হয়েছে।

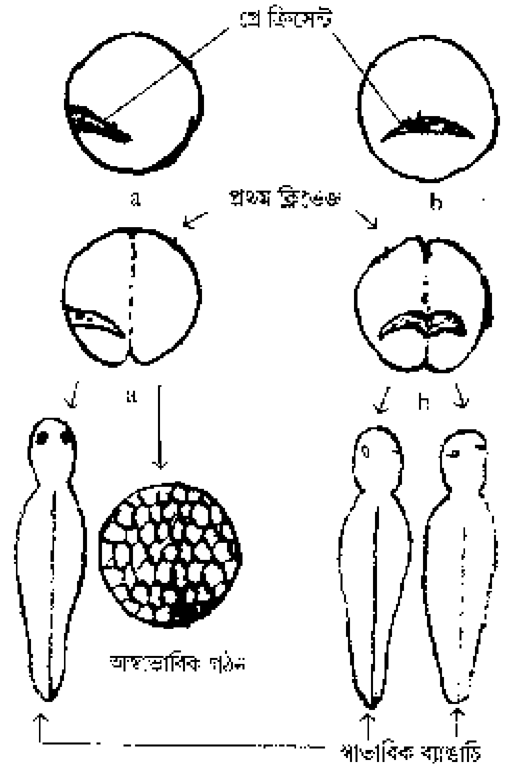

চিত্র নং 5.1

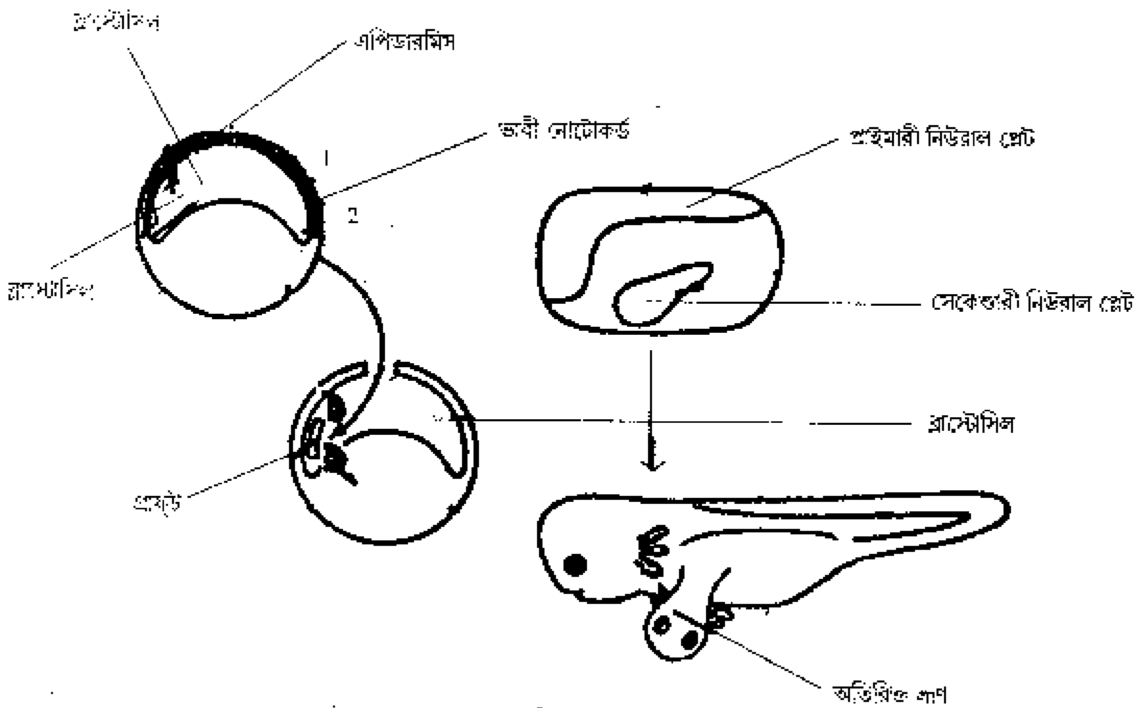

চিত্র নং 5.2

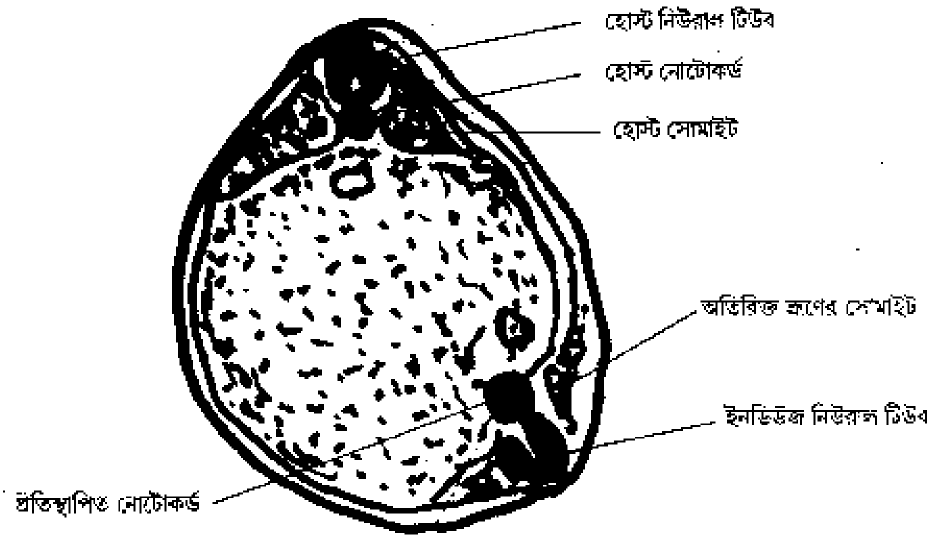

চিত্র নং. 5.3

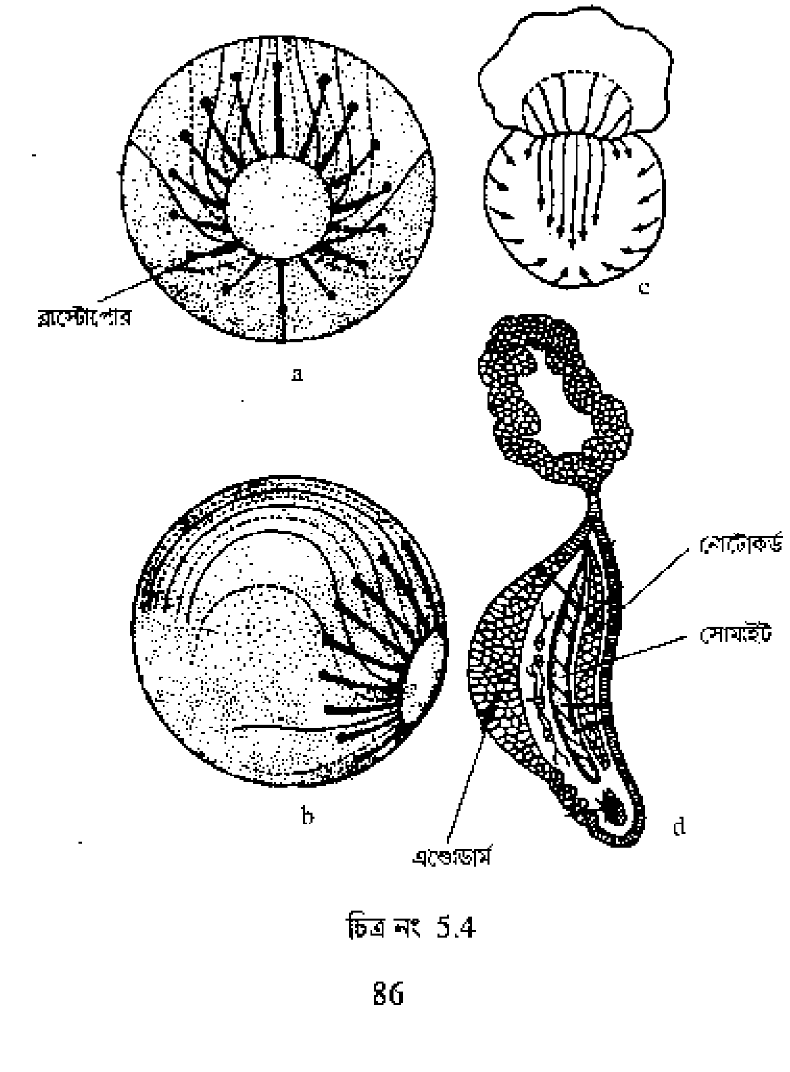

চিত্র নং 5.4

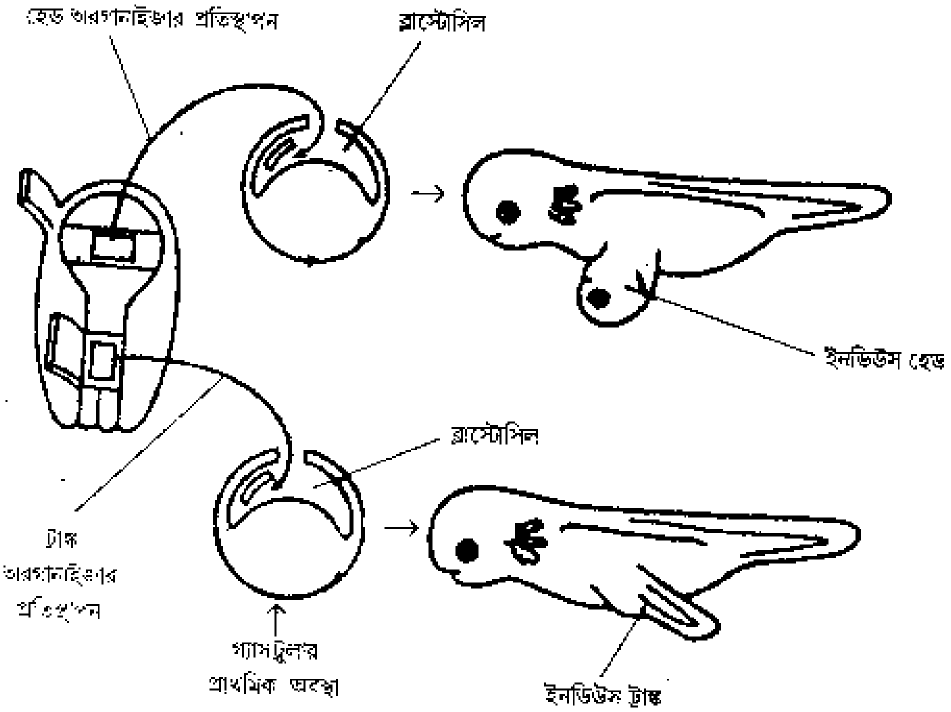

চিত্র নং 5.5

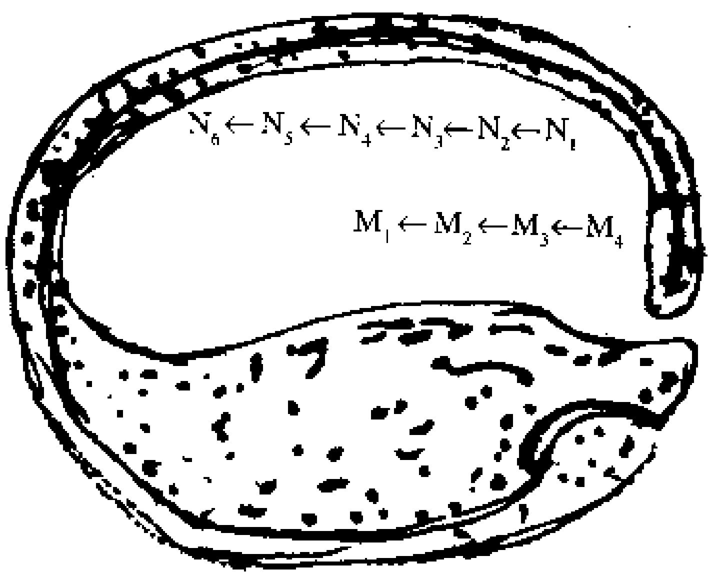

চিত্র নং 5.6

একক 6 □ মুরগীর ভ্রূণঝিল্লী (Foetal Membranes of Chick)

গঠন

6.1 প্রস্তাবনা
6.2 উদ্দেশ্য
6.3 প্রকারভেদ
6.4 কুসুমথলি
6.5 এ্যামনিয়ন ও কোরিয়ন
6.6 এ্যালানটয়েস
6.7 সারাংশ
6.8 প্রশ্নাবলী
6.9 উত্তরমালা

6.1 প্রস্তাবনা

নিষিক্ত ডিম ডাঙায় পরিস্ফুরণের উপযোগী করার জন্য ভ্রূণের চারপাশে আদ্র পরিবেশ সৃষ্টি করা, আর ভ্রূণকে যথাসম্ভব সুরক্ষিত রাখার উদ্দেশ্যে ভ্রূণের শরীর থেকে কয়েকটি কোষময় ঝিল্লী (Cellular membranes) তৈরী হয়। এই ঝিল্লী গুলি ভ্রূণের দেহ থেকে উদ্ভুত হলেও পরবর্তীকালে এগুলি ভ্রূণের দেহের বাইরেই থাকে; এইকারণে এদের ভ্রূণ বহিঃস্থ ঝিল্লী বলা হয়। এই ঝিল্লীগুলি ভ্রূণের বড় হওয়ার জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু শারীরবৃত্তিয় কাজ করে যেমন, পুষ্টি সরবরাহ, অক্সিজেন-কার্বনডাই অক্সাইড আদান-প্রদান, বর্জ পদার্থ সঞ্চয় ইত্যাদি। এছাড়াও ভ্রূণ ঝিল্লীর মধ্যে জলীয় পরিবেশে সুরক্ষিত থাকে। তাই এই ঝিল্লীগুলি ছাড়া ভ্রূণের পরিস্ফুরণ সম্ভব নয়। এই ঝিল্লীগুলি অবশ্য ভ্রূণের গঠনে কোনও অংশগ্রহণ করে না আর ডিম ফোটার সময় এগুলিও সম্পূর্ণভাবে কিংবা আংশিকভাবে পরিত্যক্ত হয়।

6.2 উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- ভ্রূণঝিল্লী কি এবং এদের গঠনের প্রয়োজনীয়তা কি তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ঝিল্লীগুলি ভ্রূণের বৃদ্ধিতে সহায়ক হলেও এরা ভ্রূণের পরিস্ফুরণে সাহায্য করে না, যদিও এদের ছাড়া ভ্রূণের অস্তিত্বও সম্ভব নয়- এই তথ্যটির তাৎপর্য্য বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- ভ্রূণঝিল্লী কিভাবে স্তন্যপায়ী প্রাণীতে অমরা গঠনে সাহায্য করে তা নির্দেশ করতে পারবেন।

6.3 প্রকারভেদ ঃ

মুরগীর ভ্রূণে চারটি ঝিল্লী দেখা যায়। ঝিল্লীগুলি যথাক্রমে কুসুমথলি (Yolk sac), এ্যামনিয়ন (Amnion), কোরিয়ন (Chorion) বা সেরোসা (Serosa) ও এ্যালানটয়েস (Allantois)।

মুরগীর গ্যাসট্রুলেশনের (gastrulation) শেষের দিকে পার্শ্বীয় মেসোডার্ম (lateral mesoderm) বিভক্ত হয়ে সোমাটিক মেসোডার্ম (somatic mesoderm) ও সপ্ল্যাংকনিক্ মেসোডার্ম (splanchnic mesoderm) সৃষ্টি করে। এর অল্প সময় পরই সোমাটিক মেসোডার্ম-এর কাছের একটোডার্মের সঙ্গে মিলে সোমাটোপ্লুরা (somatopleura) ও সপ্ল্যাংকনিক্ মেসোডার্ম এণ্ডোডার্মের সঙ্গে জুড়ে সপ্ল্যাংকনোপ্লুরা (splanchnopleura) তৈরী করে। এই সোমাটোপ্লুরা ও সপ্ল্যাংকনোপ্লুরার সীমানা প্রথম দশায় ভ্রূণের মধ্যে নির্দিষ্ট থাকলেও পরবর্তীকালে ভ্রূণের আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের বাইরেও প্রসারিত হয়। ফলে ভ্রূণস্থ ও ভ্রূণবহিঃস্থ কোষগুলি পরস্পরের সঙ্গে অবিচ্ছিন্নভাবে যুক্ত থাকে। কিন্তু ক্রমে দেহভাঁজ দেখা দেয় এগুলি ভ্রূণকে একটা সুনির্দিষ্ট আকার পেতে সাহায্য করে আর ভ্রূণস্থ ও ভ্রূণবহিঃস্থ কোষের মধ্যে সীমানা তৈরী করে। এই দেহভাঁজগুলির সঙ্গে তিনটি কোষস্তরও যুক্ত থাকে। দেহভাঁজ গুলি যথাক্রমে মস্তক ভাঁজ (cephalic head fold), পার্শ্বীয় ভাঁজ (lateral folds) ও পশ্চাৎ ভাঁজ (caudal fold)। মস্তক ভাঁজ ইনকিউবেশনের 30 ঘন্টার মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। এই ভাঁজটি মাথার সামনে ও নিচের দিকে প্রসারিত হয়ে দেহের সামনের ভাগকে (যেমন মাথা ইত্যাদি) কুসুম থেকে পৃথক করে। এই ভাবেই দেহের দুই পাশে পার্শ্বীয় ভাঁজ তৈরী হয় ও এরা দুই পাশে কুসুম থেকে ভ্রূণকে বিচ্ছিন্ন করে। ইনকিউবেশনের তৃতীয়দিনে পশ্চাৎ ভাঁজ দেখা যায়। এই ভাঁজ ভ্রূণের লেজের অংশকে কুসুম থেকে আলাদা করে। (চিত্র নং 6.1 a, b)।

6.4 কুসুমথলি ঃ

সপ্ল্যাংকনোপ্লুরার প্রসারণে ইনকিউবেশনের 24 ঘন্টার মধ্যেই কুসুমথলি (Yolk sac) তৈরী লক্ষ্য করা যায়। এইসময় আদিম অন্ত্রটির (Primitive gut) শুধুমাত্র ওপরের দিকে (পৃষ্ঠদেশে) কোষ থাকে। নিচের দিকে কুসুম সাময়িকভাবে মেঝে (floor) হিসাবে কাজ করে। সপ্ল্যাংকনোপ্লুরার ভ্রূণের বাইরে (বহিঃস্থ ভ্রূণে) প্রসারণের ফলে কুসুমটি থলির আকার ধারণ করে, আর ভ্রূণের মধ্যে এটি অন্ত্রগঠনে কাজ করে। সপ্ল্যাংকনোপ্লুরা দিয়ে গঠিত হওয়ার জন্য এর ভিতরের কোষ এণ্ডোডার্ম এবং বাইরের কোষ সপ্ল্যাংকনিক মেসোডার্ম দিয়ে তৈরী। মস্তক ভাঁজ ও পার্শ্বীয় ভাঁজের উৎপত্তির ফলে ভ্রূণের মাথা ও গলার অংশ নিচের কুসুম থেকে বিচ্ছিন্ন হয় এবং এই অঞ্চলে অধঃমস্তিষ্ক খাঁজ বা পকেট (subcephatic pocket) দেখা যায়। ভাঁজ সৃষ্টি এবং এর পিছনদিকে প্রসারণের ফলে এণ্ডোডার্ম নলাকার হয় ও অগ্রঅন্ত্র (foregut) তৈরী করতে সক্ষম হয়। একইভাবে ইনকিউবেশনের তৃতীয়দিনে ভ্রূণের শরীরের পিছনদিকে অধঃপশ্চাৎ অন্ত্র (hindgut) তৈরী হয়। অন্ত্রের এখনও অনির্মিত অংশ মধ্যঅন্ত্র (midgut) এটি কুসুমের সঙ্গে যুক্ত থাকে। ক্রমশঃ অধঃমস্তিষ্ক ও অধঃপশ্চাৎ খাঁজ দুটির প্রসার ঘটে এবং কুসুমের সঙ্গে ভ্রূণের যোগের অংশও সঙ্কুচিত হয়, আর অগ্র ও পশ্চাৎ অন্ত্র আকারে বড় হয়। শেষে কুসুমথলির সঙ্গে মধ্যঅন্ত্রের যোগ একটি ছিদ্রপথের রূপ নেয় এবং এটিকে কুসুমনালী (Yolk duct) ও এর প্রাচীরকে কুসুমবৃন্ত (Yolk stalk) বলা হয়। কুসুমথলির প্রাচীরের সঙ্গে কুসুমবৃন্তের মাধ্যমে অন্ত্রের যোগ থাকলেও ভ্রূণের সপ্ল্যাংকনোপ্লুরা এবং ভ্রূণ বহিঃস্থ সপ্ল্যাংকনোপ্লুরার সীমা কুসুমবৃন্ত পর্যন্তই নির্দিষ্ট থাকে।

কুসুমবৃন্তের মাধ্যমে ভাইটেলাইন ধমনী বা ওমফালোমেসেনটারিক ধমনী (Vitelline or omphalomesenteric arteries) আর ওমফালোমেসেনটারিক শিরা (omphalomesenteric vein) পাশাপাশি থাকে আর কুসুমথলির সপ্ল্যাংকনোপ্লুরার রক্তজালিকা সৃষ্টি করে। এরফলে কুসুমথলি মধ্যঅন্ত্র থেকে ভাইটেলাইন চাপ বা রক্তসংবহন চাপের (vitelline arc or circulatory arc) মাধ্যমে ঝুলতে থাকে।

পাখীর ডিমে কুসুমের পরিমাণ খুব বেশী হলেও কুসুম কিন্তু সরাসরি অন্ত্রে পৌঁছায় না। এখানে উল্লেখ্য যে স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিমে কুসুম না থাকলেও কুসুমথলি বর্তমান থাকে। কুসুম সপ্ল্যাংকনোপ্লুরার এণ্ডোডার্ম কোষ নিঃসৃত উৎসেচকে (enzyme) পাচ্য হয়ে দ্রবীভূত তরল পদার্থে পরিণত হয়। এরপর রক্তজালিকা বাহিত হয়ে ভাইটেলাইন শিরায় শোষিত হয় ও ভ্রূণের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ভ্রূণের বৃদ্ধির সঙ্গে কুসুমথলির মধ্যেও অনেক খাঁজ দেখা যায়। এগুলি কুসুমথলির আয়তন বাড়ায় আর শোষণ সহজ করে। (চিত্র নং 6.2)।

পরিস্ফুরণের সময় এ্যলবুমেন (albumen) থেকে জলীয় অংশ নিঃসৃত হয় এবং এরও পরিমাণ খুব তাড়াতাড়ি কমতে থাকে। এই সময় এ্যালানটয়েস (allantois) (আর একটি ভ্রূণ বহিঃস্থ ঝিল্লী) ঝিল্লীর দ্রুত বৃদ্ধির চাপে এ্যলবুমেন কুসুম থলির প্রান্তে সরে আসে। ক্রমে কুসুমথলির সপ্ল্যাংকনোপ্লুরা প্রসারিত হয়ে এ্যলবুমেনকে ঘিরে ফেলে এবং ভ্রূণ বহিঃস্থ রক্তনালিকা এ্যলবুমেন শোষণ করে ভ্রূণ বৃদ্ধিতে সহায়তা করে।

ভ্রূণের বৃদ্ধির শেষের দিকে (19 দিন) শোষণের পর বাকী কুসুম থলিসমেত ভ্রূণের মধ্য অন্ত্রের মধ্যে নীত হয় এবং ডিমফুটে বাচ্চা হবার 6 দিনের মধ্যেই এই কুসুম এবং কুসুমথলির প্রাচীর পূর্ণশোষিত হয়ে নিঃশেষ হয়।

6.5 এ্যামনিয়ন ও কোরিয়ন (Amnion and Chorion)ঃ

ভ্রূণ বহিঃস্থ সোমাটোপ্লুরা থেকেই এই দুটি ঝিল্লী সৃষ্টি হয়। ডিমে তা (incubation) দেবার প্রায় 30 ঘন্টার মধ্যে এ্যামনিয়ন সৃষ্টির সম্ভাবনা দেখা যায়।

আগেই বলেছি বৃদ্ধির সময় ভ্রূণের মাথার অংশ নীচে কুসুমের মধ্যে নেমে যেতে থাকে। এই সময় ভ্রূণ বহিঃস্থ সোমাটোপ্লুরা একটি ভাঁজ সৃষ্টি করে - একে এ্যমনিয়টিক মস্তক ভাঁজ (amniotic head fold) বলে। প্রথম দশায় এটি দেখতে অর্ধচন্দ্রাকার এবং ভ্রূণের মাথার অংশ সোমাটোপ্লুরা দিয়ে তৈরী এই দুইস্তর যুক্ত ভাঁজের মধ্যে রক্ষিত হয়। ক্রমশঃ এই ভাঁজ পাশের দিকেও বাড়তে থাকে (lateral amniotic fold)। ভ্রূণ বৃদ্ধির তৃতীয়দিনে এ্যমনিয়টিক মস্তক ভাঁজের মতন আর একটি দ্বি-স্তরযুক্ত ভাঁজ ভ্রূণের লেজের অংশে দেখা যায়। এই পশ্চাৎ ভাঁজ (amniotic tail fold) বিপরীতমুখী অর্থাৎ সামনের দিকে প্রসারিত হয়। মস্তক, পার্শ্বীয় ভাঁজ আর পশ্চাদ ভাঁজের ক্রমান্বয় বৃদ্ধির ফলে এগুলি ভ্রূণের দেহের উপরের দিকে পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয়ে ভ্রূণকে ঢেকে ফেলে। প্রথম অবস্থায় এই ঝিল্লীগুলির একে অপরের সঙ্গে সংযোগ স্থানে একটি চিহ্ন থাকে। একে সেরো-এ্যমনিয়টিক সংযোগ (sero-amniotic raphe) বলে। এই ভাঁজগুলির মিলনের ফলে দেহের উপরের দিকে দুটি আবরণের সৃষ্টি হয়। প্রথমটি এ্যমনিয়ন (Amnion) ও অন্যটি সেরোসা বা কোরিয়ন (Chorion)। ভ্রূণ বহিঃস্থ সোমাটোপ্লুরা থেকে সৃষ্টি হলেও কোষ সজ্জায় এ্যামনিয়ন সেরোসা পরস্পরের বিপরীত। এ্যামনিয়নের বাইরে থাকে সোমাটিক মেসোডার্ম ও ভিতরে একটোডার্ম। কিন্তু সেরোসার ভিতরের স্তর সোমাটিক মেসোডার্ম

ও বাইরের আবরণ এক্টোডার্ম দিয়ে তৈরী। এই একটোডার্ম কুসুমথলির বৃন্ত ও এ্যালানটয়িক বৃন্ত অংশে ভ্রূণের একটোডার্মের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন থাকে। (চিত্র নং 6.1 a,b)।

ভ্রূণ ও এ্যামনিয়নের মাঝের অংশকে এ্যামনিয়টিক গহ্বর (amniotic space) বলা হয়। এটি এ্যামনিয়টিক তরলে (amniotic fluid) পূর্ণ থাকে।

এ্যামনিয়নের কাজ ঃ

1. এ্যামনিয়ন সৃষ্টির ফলে ভ্রূণ শুষ্কতা থেকে রক্ষা পায় (দ্রষ্টব্য ঃ এ্যামনিয়ন সরীসৃপ, পাখী ও স্তন্যপায়ী প্রাণীতে দেখা যায় – তাই এদের সম্মেলকভাবে এ্যামনিওটা (amniota) বলে।)
2. এটি ভ্রূণকে বাইরের আঘাত থেকে রক্ষা করে।
3. এ্যামনিয়নের পেশীর সঙ্কোচন ও প্রসারণের জন্য ভ্রূণটি সবসময় আন্দোলিত হতে থাকে। ফলে এ্যামনিয়নের দেওয়ালে লেগে ঘর্ষণজনিত আঘাত থেকে রক্ষা করে।

এ্যামনিয়ন ও কোরিয়নের মাঝখানের অঞ্চলটিকে বহিঃস্থভ্রূণীয় দেহগহ্বর (extra-embryonic coelom) বলে। তা দেওয়ার 15 দিনের মধ্যে এটি অনেক বড় হয় আর কুসুমথলি ও এ্যালবুমেন থলিকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলে। ক্রমে এ্যালানটয়েস ও কোরিয়নের মধ্যেই বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় (চিত্র নং 6.2 ও 6.3)।

কোরিয়নের কাজ ঃ

1. ভ্রূণকে রক্ষা করা।
2. কোরিয়ন এ্যালানটয়েসের সঙ্গে মিলে শ্বসনে সাহায্য করে।
3. এ্যালবুমেন শোষণ করে ভ্রূণের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে।

6.6 এ্যালানটয়েস (Allantois) ঃ

ডিমে তা দেবার তৃতীয় দিনে পশ্চাৎ পৌষ্টিক নালীর অঙ্কদেশে থেকে একটা উপবৃদ্ধি (diverticulum) হিসাবে এ্যালানটয়েসের সৃষ্টি। উৎপত্তি হিসাবে এজন্য এটি এ্যামনিয়ন, কুসুমথলি বা কোরিয়ন থেকে আলাদা। এর বৃদ্ধিও খুব তাড়াতাড়িই হয়। ইনকিউবেশনের চতুর্থ দিনে এ্যালানটয়েস যথেষ্ট বড় হয়। এর মূল ভ্রূণের মধ্যে থাকলেও দূরবর্তী অংশটি বহিঃভ্রূণীয় সিলোমের মধ্যে ঢুকে পড়ে আর কোরিয়ন, এ্যামনিয়ন ও কুসুমথলির সঙ্গে বড় হয়। ইনকিউবেশনের দশম দিনে এটি পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় এবং এইসময় এটিকে দেখতে বেলুনের মতন লাগে। ভ্রূণের অন্ত্রের উপবৃদ্ধি থেকে উৎপন্ন হওয়ার জন্য এটি ভ্রূণের সপ্ল্যাংকনোপ্লুরা দিয়ে তৈরী অর্থাৎ এর ভেতরের দেওয়াল এণ্ডোডার্ম ও বাইরে সপ্ল্যাংকনিক মেসোডার্ম থাকে। এ্যালানটয়েস একটি সরু নালী দিয়ে ভ্রূণের সঙ্গে যোগাযোগ রাখে। এটিকে এ্যালানটয়িক বৃন্ত (allantoic stalk) এবং বেলুনের মতন বড় অংশটিকে এ্যালানটয়িক ভেসিকল বা থলি (allantoic vesicle) বলে। এ্যালানটয়েসের বেশ কিছু অংশ কোরিয়নের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কোরিও এ্যালানটয়েস (Chorio-allantois) গঠন করে। এই জায়গাটি বিশেষভাবে রক্ত সমৃদ্ধ থাকে। মুরগী খোলস ভেঙ্গে বাইরে না আসা পর্যন্ত এ্যালানটয়েস অটুট থাকে। শাবক বাইরে আসার সময় এ্যালানটয়িক বৃন্ত ছিন্ন হয়। সঞ্চিত বর্জপদার্থে পূর্ণ এ্যালানটয়েসকে খোলসের গায়ে একটা শুকনো ঝিল্লী হিসাবে লেগে থাকতে দেখা যায় (চিত্র নং 6.2 ও 6.3)।

এ্যালানটয়েসের কাজ ঃ

1. এ্যালানটয়েস ভ্রূণের শ্বসন কাজ করে থাকে। রক্তবাহী নালীগুলি (allantric blood vessels) ভ্রূণকে অকসিজেন সরবরাহ করে ও ভ্রূণকে কার্বন-ডাই-অক্সাইড মুক্ত করে।

2. এটি ভ্রূণের মূত্রথলির কাজ করে। ভ্রূণের দেহে যে সব বর্জ্য পদার্থ তৈরী হয় খোলস দিয়ে ঢাকা থাকার জন্য সেগুলি দেহের বাইরে নিক্ষিপ্ত হতে পারে না। আবার দেহে সেগুলি ঠিকমতন না রাখতে পারলে অধিবিষ বিক্রিয়া (toxic effect) অবশ্যম্ভাবী। এ্যালানটয়েসের মধ্যে ভ্রূণ সৃষ্টির প্রথম দশায় ইউরিয়া, পরে ভ্রূণের বড় হওয়ার সঙ্গে ইউরিক অ্যাসিড (uric acid) সঞ্চিত হয়।

3. ভ্রূণের শরীরে হাড় তৈরীর কাজের জন্য এ্যালানটয়েসের রক্তনালী ডিমের খোলস থেকে ক্যালসিয়াম শোষণ করে।

4. কোরিও-এ্যালানটয়েস এ্যালবুমেন শোষণ করে।

5. এ্যালানটয়েসের মেসোডার্ম ও কোরিয়নের মেসোডার্ম মিলে ভ্রূণের পেশীতন্ত্র তৈরীতে সাহায্য করে।

6.7 সারাংশ ঃ

নিষিক্ত ডিম থেকে উৎপন্ন ভ্রূণ কতকগুলি ঝিল্লীময় পর্দার দ্বারা আবৃত থাকে। এরিয়া ওপেকার বহিঃভ্রূণস্থ সোমাটোপ্লুরা বা সপ্ল্যাংকনোপ্লুরা অঞ্চলের কোষ দিয়ে এরা তৈরী। উৎপত্তির সময় হিসাবে এরা যথাক্রমে কুসুমথলি, এ্যামনিয়ন, সেরোসা বা কোরিয়ন ও এ্যালানটয়েস। এই চারটি ঝিল্লী ভ্রূণ গঠনের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হলেও এরা কিন্তু ভ্রূণ গঠনে অংশ গ্রহণ করে না। এজন্য এদের ভ্রূণবহিঃস্থ ঝিল্লী বলা হয়।

ইনকিউবেশনের 24 ঘন্টার মধ্যে কুসুমথলি সৃষ্টির সূচনা লক্ষ্য করা যায়। ব্লাস্টোডার্মের কিনারার সপ্ল্যাংকনোপ্লুরা বিস্তৃত হয়ে ডিমের কুসুম অংশকে বেষ্টন করে। পাখীর ডিমে কুসুমের পরিমাণ বেশী। ভ্রূণে পৌষ্টিকনালী তৈরী সম্পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত কুসুম ভ্রূণের বৃদ্ধিতে খাদ্য সরবরাহ করে।

তা দেওয়ার 30 ঘন্টার মধ্যে বর্দ্ধনশীল ভ্রূণের সামনে 'মস্তক ভাঁজ' দেখা যায়। ইনকিউবেশনের 48 ঘন্টার মধ্যে অনুরূপ আর একটি 'লেজ ভাঁজ' দেহের পিছনদিকে দেখা যায়। এগুলি ভ্রূণ বহিঃস্থ সোমাটোপ্লুরার বিস্তৃতিতে তৈরী হয়। তা দেওয়ার চতুর্থদিনে মস্তক ও লেজভাঁজ পরস্পরের সঙ্গে মিলে ভ্রূণের দেহের উপরে দুইটি সম্পূর্ণ থলির মতন আবরণ সৃষ্টি করে। ভিতরেরটি এ্যামনিয়ন। এ্যামনিয়নের মধ্যের এ্যামনিয়টিক তরলে নিমজ্জিত থাকায় ভ্রূণ বাইরের আঘাত ও শুষ্কতা থেকে রক্ষা পায়।

এ্যামনিয়নের বাইরের আবরণটি সেরোসা। কোষসজ্জায় এ্যামনিয়ন ও সেরোসা বিপরীত। এ্যামনিয়ন ও সেরোসার মধ্যের গহ্বরকে বহিঃভ্রূণাস্থ দেহগহ্বর বলে। এটি ভ্রূণস্থ দেহঃগহ্বরের সঙ্গে যুক্ত।

ইনকিউবেশনের তৃতীয়দিনে পৌষ্টিক নালীর উপবৃদ্ধিরূপে এ্যালানটয়েস দেখা দেয়। ক্রমশঃ সপ্ল্যাংকনোপ্লুরার বিস্তৃতিতে এটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় ও বহিঃভ্রূণাস্থ দেহ গহ্বরের মধ্যে প্রসারিত হয়। এ্যালানটয়েস ভ্রূণের শ্বসন অঙ্গ হিসাবে কাজ করে। আবার প্রথমে ইউরিয়া ও পরে ইউরিক এ্যাসিড জমা রেখে ভ্রূণের মূত্রাশয় হিসাবেও কাজ করে। এ্যালবুমিন শোষণেও এর ভূমিকা আছে।

পাখীর ভ্রূণ খোলস ত্যাগের সময় এই চারটি ভ্রূণ বহিঃস্থ ঝিল্লীও পরিত্যক্ত হয়।

6.8 প্রশ্নাবলী

1. দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(i) ভ্রূণ বহিঃস্থ ঝিল্লী কয়প্রকার ? মুরগীর ভ্রূণ বহিঃস্থ ঝিল্লীগুলির বিন্যাস ও প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করুন।

(ii) মুরগীর ভ্রূণে এ্যামনিয়ন ও এ্যালানটয়েসের উৎপত্তি ও কাজ বর্ণনা করুন।

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন ঃ

(i) ভ্রূণ বহিঃস্থ ঝিল্লী বলতে কি বোঝ ? এদের সঙ্গে ভ্রূণস্থ ঝিল্লীর পার্থক্য কি ?

(ii) মুরগীতে এ্যামনিয়ন ও কোরিয়নের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

(iii) কুসুমথলির উৎপত্তি ও কাজ সম্বন্ধে লিখুন।

6.9 উত্তরমালা

অনুশীলনী -

1. (i) — 6.3
   (ii) — 6.5; 6.6

2. (i) — 6.3
   (ii) — 6.5
   (iii) — 6.4

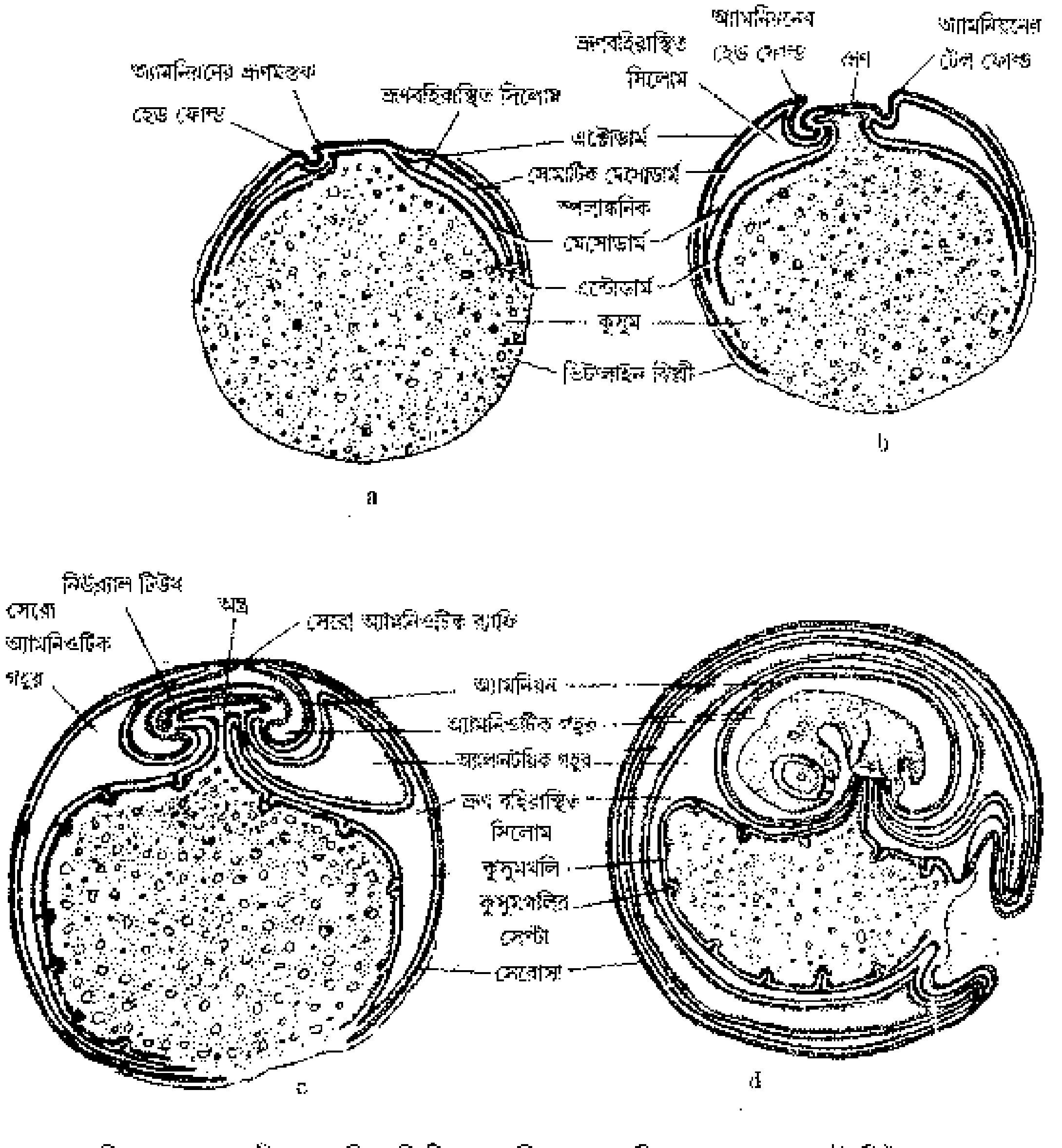

চিত্র নং ৬.১ ঃ মুরগীর ভ্রূণ বহিঃস্থ ঝিল্লীসমূহের চিত্ররূপ। ভ্রূণটির লম্বচ্ছেদ দৃশ্য। a) ইনকিউবেশনের দ্বিতীয় দিনের শুরুতে ভ্রূণের চিত্র, b) ইনকিউবেশনের তৃতীয় দিনের শুরুতে চিত্র c) পঞ্চম দিনের ও d) ইনকিউবেশনের নবম দিনের ভ্রূণের চিত্র।

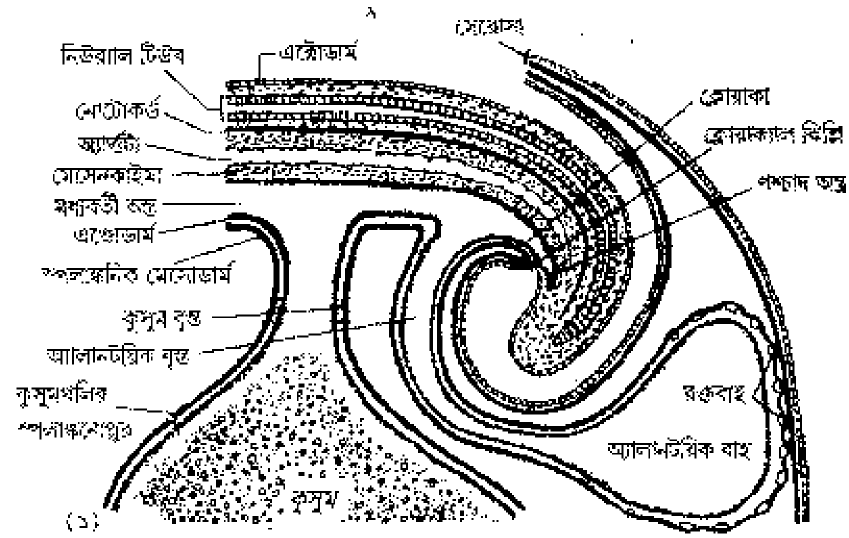

চিত্র নং 6.2 ঃ মুরগীর ভ্রূণের কডাল অংশের শীর্ষচ্ছেদের পরিকল্পনীয় চিত্রে অ্যালানটয়েসের গঠন দেখানো হয়েছে।

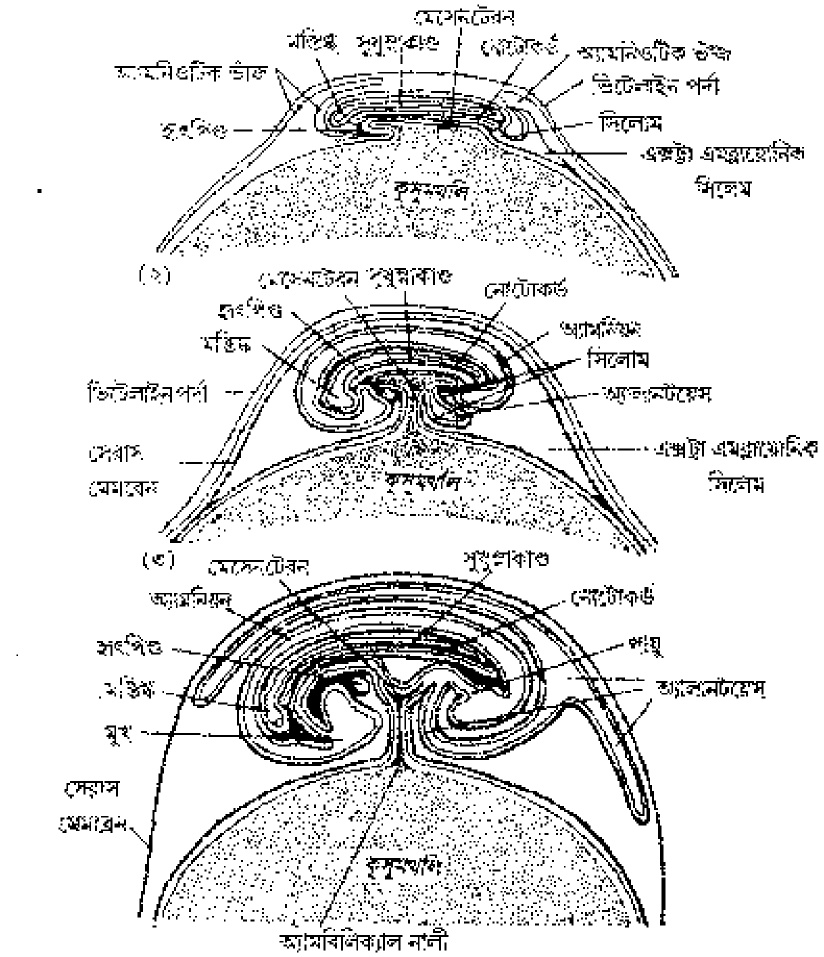

চিত্র নং 6.3 ঃ মুরগীর ভ্রূণ বহিস্থ পর্দার গঠনের বিভিন্ন পর্যায়।

একক 7 □ অমরা (Placenta)

গঠন

7.1 প্রস্তাবনা

7.2 উদ্দেশ্য

7.3 সংজ্ঞা

7.4 অমরার উদ্ভব ও প্রয়োজনীয়তা

7.4.1 শ্রেণীবিভাগ

7.5 খরগোসের অমরা গঠন ও পরিস্ফুরণ

7.6 অমরার বাধা

7.7 অমরার কাজ

7.8 সারাংশ

7.9 প্রশ্নাবলী

7.10 উত্তরমালা

7.1 প্রস্তাবনা

নিম্নশ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীর (মৎস বা উভচর শ্রেণীর) ডিম্বাণু কুসুমযুক্ত হয় এবং এদের নিষেক সংঘটিত হয় জলে। ফলে বহু ডিম্বাণু ধ্বংসপ্রাপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অধিক সংখ্যায় উৎপাদনের জন্য এদের বংশবিলোপ ঘটে না। এইসব ডিম্বাণু ও ভ্রূণের বৃদ্ধি স্বাধীনভাবে হয়, কোনও রকমেই জনিতার ওপর নির্ভরশীল থাকে না।

ক্রমবিবর্তনের পরবর্তী পর্যায়ে উন্নতশ্রেণীর মেরুদণ্ডী প্রাণীর নিষিক্ত ডিম্বাণু স্থলে পরিত্যক্ত হয়। এই নূতন অভিযোজনের জন্য ভ্রূণের পরিস্ফুরণ, বৃদ্ধি, গঠন এবং সংরক্ষণের প্রক্রিয়াও জটিলরূপ ধারণ করে এবং ডিম্বাণুর সংখ্যাও কম থাকে। বংশরক্ষার জন্য এই অল্পসংখ্যক ডিম্বাণুর রক্ষণাবেক্ষণ এবং ভ্রূণের উদ্বর্তনের (survival) সম্ভাবনাকে নিশ্চিত করতে মেরুদণ্ডী প্রাণীর মধ্যে জনিতৃ পরিচর্যার (parental care) প্রবণতা দেখা যায়। এই জনিতৃ পরিচর্যা চরম উৎকর্ষতা লাভ করে স্তন্যপায়ী প্রাণীর মধ্যে। মোনোট্রিমাটা (Monotremata) ব্যতিত সব স্তন্যপায়ী প্রাণীর নিষেক জনন তন্ত্রের মধ্যেই ঘটে থাকে। এদের ডিম্বাণুতে কুসুমসঞ্চয় খুবই কম থাকে। ভ্রূণের পরিস্ফুরণ, বৃদ্ধি এবং অন্যান্য বিপাকীয় প্রয়োজনীয়তার জন্য এরা সম্পূর্ণভাবে মাতার উপর নির্ভরশীল। সুষ্ঠুভাবে মাতৃজরায়ুর গাত্রসংলগ্ন (implantation) হবার জন্য ভ্রূণের বহিঃস্থ মেমব্রেণ (বা ঝিল্লী) সমূহের সঙ্গে জরায়ুর প্রাচীরের বিক্রিয়া ও সংযোগ ঘটে। ভ্রূণের সঙ্গে মাতৃকলার এই সংযোগকারী অংশকে প্লাসেন্টা বা অমরা বলা হয়।

গ্রীক ভাষায় প্ল্যাসেন্টা শব্দটির অর্থ চ্যাপ্টা 'কেক' (flat cake)। মানুষের অমরা চ্যাপ্টা এবং দেখতেও চাকতির মতন। ইংরাজী শব্দ প্ল্যাসেন্টা বাংলা পরিভাষায় আবার অমরা (বা ফুল) বলে অভিহিত।

7.2 উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- অমরা কোন শ্রেণীর প্রাণীতে পাওয়া যায় তা নির্দিষ্ট করতে পারবেন।
- অমরার গঠন ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- স্তন্যপায়ী প্রাণীতে কত ধরণের অমরা দেখা যায় তা নির্দেশ করতে পারবেন।
- খরগোসের অমরার বিবরণ দিতে সক্ষম হবেন এবং যেহেতু এই অমরা গঠনে মানুষের অমরার সঙ্গে অনেক মিল দেখা যায় সেই কারণে মানুষের অমরা গঠন সম্বন্ধেও ধারনা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

7.3 ভ্রূণবিদ্যা বিশারদগণ প্রদত্ত অমরার সংজ্ঞা ঃ

টোরি ও ফেডিসিয়া (Torry and Fedducia) ঃ অমরা প্রাথমিকভাবে একটি গঠনমূলক প্রক্রিয়া। এটি শারীরবৃত্তিয় আদান-প্রদানের জন্য ভ্রূণের বহিঃস্থ ঝিল্লীর সঙ্গে মাতৃজরায়ুর মিউকোসা ঝিল্লীর সংযোগ বা মিলনের দ্বারা সৃষ্ট।

ব্যালিনিস্কি প্রদত্ত সংজ্ঞা অনুযায়ী অমরা মাতৃকলা ও ভ্রূণকলা দ্বারা গঠিত একটি ক্ষণস্থায়ী অঙ্গ যার প্রধান কাজ মাতার দেহ থেকে পুষ্টি, অক্সিজেন ইত্যাদি ভ্রূণকে সরবরাহ করা এবং ভ্রূণের দেহ থেকে বিপাকীয় বর্জন পদার্থ নিকাশ করা।

প্যাটেন, কার্লসন প্রদত্ত সংজ্ঞা ব্যালিনিস্কির সংজ্ঞার অনুগামী।

দ্রষ্টব্য ঃ স্তন্যপায়ী শ্রেণীভুক্ত ছাড়াও প্রাণীজগতে (Arthropoda) পর্বভুক্ত পেরিপেটাস (Peripatus), নিম্নকর্ডাটা সালপা (Salpa), এক শ্রেণীর হাঙ্গর (Mustelus laevis) এবং এক ধরণের গিরগিটিতেও অমরা দেখা যায়।

7.4 অমরার উদ্ভব ও প্রয়োজনীয়তা ঃ

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে স্তন্যপায়ী প্রাণীর ডিমে কুসুমের পরিমাণ অত্যন্ত নগণ্য। নিষিক্ত ভ্রূণ জরায়ুতে প্রবেশ করলে জোনা পেলুসিডা (Zona pellucida) আবরণ দ্রবীভূত হয়। ভ্রূণ এইসময় ব্লাস্টোসিস্ট দশায় (Blastocyst stage) থাকে এবং জরায়ু নিঃসৃত তরলে নিমজ্জিত থাকে। জরায়ুর তরলে দ্রবীভূত জৈব পদার্থ ভ্রূণের পুষ্টির জন্য অপরিহার্য। ভ্রূণ প্রাথমিক দশায় এপিথিলিয়াম আবরণীর সাহায্যে এই পুষ্টিরস শোষণ করে। কিন্তু বৃদ্ধির সঙ্গে ভ্রূণের খাদ্যের চাহিদাও বাড়তে থাকে। পদার্থসমূহের সরবরাহের পরিমাণ নিশ্চিত ও পর্য্যাপ্ত করার জন্য ভ্রূণকলা ও মাতৃকলার মধ্যে ঘনিষ্টতার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী। এই কারণে কোরিয়নের বহিঃপ্রাচীর বা ট্রফোব্লাস্ট (Trophoblast) পুরু হয় এবং ভিলাই তৈরী করতে সক্ষম হয়। ভিলাইগুলি ক্রমশঃ জরায়ুর প্রাচীরে প্রবেশ করে। এই সময় জরায়ুর প্রাচীরও অবস্ফিত (hypertrophied) হয়।

ব্লাস্টোসিস্টের গাত্রতল থেকে আঙুলের মতন প্রবর্দ্ধনগুলি উদ্ভব হয়ে জরায়ুর গায়ে উপবিষ্ট হয় এবং সংযোগ ঘনিষ্ঠতর করে। প্রথমস্তরে এই প্রবর্দ্ধন সমূহ ব্লাস্টোসিস্টের এপিথিলিয়াম স্তর ট্রফোব্লাস্ট দিয়ে গঠিত হয়। ক্রমশঃ সংযোগ কলা (connective tissue) এবং রক্তবাহকলাও এইসঙ্গে যুক্ত হয়। এই প্রবর্দ্ধনগুলিকে কোরিয়নিক ভিলাই (villi) বলা হয়। ভিলাইযুক্ত কোরিয়ন ও মাতার জরায়ুর প্রাচীরকলা মিলিতভাবে অমরা তৈরী করে। অমরা গঠনে অংশ গ্রহণকারী জরায়ুকে ডেসিডুয়া (decidua) বলা হয়।

7.4.1 অমরার শ্রেণীবিভাগ ঃ

স্তন্যপায়ী প্রাণীতে প্রধানত ঃ দুই ধরণের অমরা দেখা যায়।

1. *ইয়কথলি অমরা* ঃ সাধারণত ক্যাঙ্গারু ইত্যাদি মারসুপিয়াল প্রাণীতে দেখা যায়। এই ধরণের অমরায় জরায়ুর গাত্রের সঙ্গে কোরিয়নের যার ভিতরের দিকে ভাইটেলাইন রক্তবাহযুক্ত কুসুমথলি থাকে, সংযোগ স্থাপিত হয়।

2. *এ্যালানটয়িক অমরা বা প্রকৃত অমরা* ঃ উন্নত স্তন্যপায়ী প্রাণীতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে মাতৃজঠরের সঙ্গে এ্যালানটয়েজ রক্তবাহযুক্ত কোরিয়ন মিলিত হয়ে অমরা সৃষ্টি করে। (চিত্র নং 7.1)

দ্রষ্টব্য ঃ ইয়কথলি অমরা অনেক উন্নত স্তন্যপায়ীতে অস্থায়ী বা স্থায়ীভাবে থাকে এবং অমরা গঠনে গৌণ ভূমিকা পালন করে।

7.4.2 সংযোগের ঘনিষ্ঠতায় অমরার প্রকারভেদ ঃ

1. *নন ডেসিডুয়াস অমরা* ঃ সাধারণতঃ গবাদি পশু ও শূকরে দেখা যায়। প্রসবের সময় কোরিয়ন ভিলাইগুলি মাতার জরায়ুর নিম্নখাঁজগুলির থেকে সহজেই আলগা হয় - ফলে জরায়ুর কোনও ক্ষতি হয় না।

2. *ডেসিডুয়াস অমরা* ঃ উন্নততর স্তন্যপায়ী প্রাণীতে মাতার জরায়ুর সঙ্গে ভ্রূণকলার যোগ অনেক নিবিড়। টফোব্লাস্টের বৃদ্ধির ফলে ভ্রূণকলা জরায়ুর মধ্যে অনুপ্রবেশ করে। এরফলে জরায়ুর গাত্রতল বিভিন্নভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত (eroded) হয় এবং ভ্রূণ ও মাতৃকোষের মধ্যে প্রয়োজনীয় পদার্থসমূহের বিনিময় সহজ হয়। প্রসবকালে কোরিয়ন মেমব্রেণ অপসারণের সময় জরায়ুর কোষকলার ক্ষতি হয় এবং অনেকক্ষেত্রে জরায়ুর গাত্রতল থেকে প্রচুর পরিমাণ রক্তপাতও হয়ে থাকে।

3. *কন্ট্রা-ডেসিডুয়াস অমরা* ঃ ভ্রূণ ও মাতার মধ্যে বন্ধন দৃঢ় হওয়া স্বত্বেও প্রসবের সময় ক্ষতিগ্রস্ত জরায়ুর কোনও অংশ মাতৃদেহের বাইরে আসে না। উদাহরণ - পেরামিলিস (Perameles)

7.4.3 ভিলাই-এর সজ্জাবিন্যাস অনুযায়ী অমরার প্রকারভেদ ঃ

1. *পরিব্যাপ্ত বা ডিফিউস অমরা* ঃ কোরিয়নের গায়ে সর্বত্র অসংখ্য ভিলাই ছড়ানো থাকে। উদাহরণ - ঘোড়া, শূকর।

2. *গুচ্ছাকার বা কটিলিডওনারি অমরা* ঃ এ্যালানটোকোরিয়নের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে ছোট ছোট গুচ্ছের আকারে ভিলাই অবস্থান করে। উদাহরণ - গরু প্রভৃতি রোমন্থনকারী প্রাণী।

3. *আঞ্চলিক বা জোনারী অমরা* ঃ ভিলাইগুলি ব্লাস্টোসিস্টের মধ্যাঞ্চলে প্রশস্ত ফিতার মতন সজ্জিত থাকে। উদাহরণ - মাংসাশী প্রাণী।

4. *চাকতি বা ডিসকয়ডাল অমরা* ঃ অমরা গঠনের প্রথমদশায় ভিলাই কোরিয়নের গায়ে ছড়ানো অবস্থায় থাকে। পরবর্তীকালে ভিলাই ভ্রূণের অংকীয় অংশে একটি চাকতি বা ডিসকের আকারে সীমাবদ্ধ থাকে। উদাহরণ - মানুষ, বনমানুষ, ইঁদুর, খরগোস।

5. *দ্বি-চাকতি বা বাইডিসকয়ডাল অমরা* ঃ অমরা দুইটি গোলাকার অঞ্চলে ভিলাই নিয়ে গঠিত হয়। উদাহরণ - বাঁদর। (চিত্র নং 7.2)

7.4.4 অমরা গঠনে অংশগ্রহণকারী কলাসমূহ ঃ

মাতৃকলা ঃ -

1. মাতার রক্তস্রোত
2. মাতার রক্তবাহের এণ্ডোথিলিয়াল প্রাচীর
3. মাতার যোগকলা
4. জরায়ুর এপিথিলিয়াম।

ভ্রূণকলা ঃ -

1. কোরিয়নের এপিথিলিয়াম।
2. কোরিয়নের যোগকলা
3. কোরিয়নের রক্তবাহের এণ্ডোথিলিয়াল প্রাচীর
4. ভ্রূণের রক্ত

7.4.5 অমরা বিন্যাস ঃ

ভ্রূণ ও জরায়ুর হৃদাতার প্রকারভেদের জন্য স্তন্যপায়ী প্রাণীতে অমরা অংশগ্রহণকারী কলাসমূহের অংশগ্রহণে ও পার্থক্য দেখা যায় (চিত্র নং 7.3)।

1. *এপিথিলিও কোরিয়াল অমরা* ঃ এক্ষেত্রে ভ্রূণের এপিথিলিয়াম ও জরায়ুর এপিথিলিয়াম পরস্পরের সংস্পর্শে আসে। ভিলাই গুলি ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে জরায়ুর প্রাচীরের অন্তঃস্তরের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসলেও প্রসবের সময় জরায়ুর অন্তঃস্তরকে কোনওভাবেই ক্ষতিগ্রস্থ করে না। উদাহরণ - শূকর, ঘোড়া।

2. *সিনডেসমো কোরিয়াল অমরা* ঃ ভ্রূণ ও মাতার কোষের যোগাযোগ অপেক্ষাকৃত নিবিড় হওয়ায় ফলে জরায়ুর এপিথিলিয়াম স্তরটি বিনষ্ট হয় এবং কোরিয়ন জরায়ুর যোগকলার সংস্পর্শে আসে। উদাহরণ – হরিণ, ভেড়া, গরু।

3. *এণ্ডোথিলিও কোরিয়াল অমরা* ঃ জরায়ুর কোষকলার আরও ভাঙ্গন ঘটে এবং কোরিয়নের এপিথিলিয়ামের সঙ্গে জরায়ুর রক্তবাহের এণ্ডোথিলিয়াল প্রাচীরের যোগ স্থাপিত হয়। উদাহরণ-বিড়াল, কুকুর।

4. *হিমোকোরিয়াল অমরা* ঃ মাতার জরায়ুর প্রাচীরের আরও উল্লেখযোগ্য ভাঙ্গন দেখা যায় এবং ভ্রূণের কোরিয়ন মাতৃরক্তে স্নাত হয়। এরফলে পুষ্টি এবং গ্যাস ইত্যাদি আদান প্রদান অনেক সহজ হয়। উদাহরণ- মানুষ।

5. *হিমোএণ্ডোথিলিয়াল অমরা* ঃএই ধরণের অমরা গঠনে মাতার জরায়ু হিমোকোরিয়াল অমরার মতনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ভ্রূণের ট্রফোব্লাস্টিক এপিথিলিয়ামও নষ্ট হয়। ফলে শুধুমাত্র ভ্রূণের এণ্ডোথিলিয়াম মাতা ও ভ্রূণের রক্তপ্রবাহকে পৃথক রাখে। উদাহরণ- খরগোস।

চিত্র ঃ অমরা গঠনে অংশগ্রহণকারী ভ্রূণকলা ও মাতৃকলার সম্পর্ক এবং সেই অনুযায়ী অমরার প্রকারভেদ-

	মাতৃকোষ			ভ্রূণকোষ					
	এণ্ডোথি-লিয়াম	যোগ কলা	এপিথি-লিয়াম	এপিথি-লিয়াম	যোগ কলা	এণ্ডোথি-লিয়াম	অমরার আকৃতি	এণ্ডো-থিলিয়াম	উদাহরণ
এপিথিলিও কোরিয়াল	+	+	+	+	+	+	ডিফিউস	ননডেসি-ডুয়াস	শূকর ঘোড়া
সিনডেসমো কোরিয়াল	+	?	○	+	+	+	কটি লিডনারি	মধ্যবর্তী (transitional)	গরু ভেড়া
এণ্ডোথিলিও কোরিয়াল	+	○	?	+	-	·	জোনারি থেকে ডেসিডুয়াস	ডেসিডুয়াস	বিড়াল কুকুর
হিমোকোরিয়াল	○	○	○	+	+	+	জোনারি অথবা ডিসকয়ডাল	ডেসিডুয়াস	মানুষ বনমানুষ ইঁদুর খরগোস

+ = কলা বর্তমান ; ○ = কলা অবর্তমান

7.5 খরগোসের অমরা গঠন ও পরিস্ফুরণ ঃ (Formation of Placenta in Rabbit)

পরিস্ফুটনের প্রাথমিক অবস্থায় অর্থাৎ ব্লাস্টোসিস্ট দশায় থাকাকালীন ভ্রূণ জরায়ুতে প্রবেশ করে। এই সময় ভ্রূণের জোনা পেলুসিডা (zona pellucida) আবরণটি নষ্ট হয় এবং জরায়ুর সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের জন্য ট্রফোব্লাস্টে দুইটি নির্দিষ্ট স্তর দেখা যায়। 1) ভিতরের স্তরটিতে কোষীয় প্রকৃতি (cellular nature) বজায় থাকে –এটিকে

বলা হয় *সাইটোট্রফোব্লাস্ট* (Cytotrophoblast)। 2) মাতৃকলার সংলগ্ন ট্রফোব্লাস্টের দ্রুত বৃদ্ধির ফলে এখানে বহু কোষ একত্র মিলিত হয়ে সিনসিটিয়াম (Syncitium) তৈরী করে এবং এই কারণেই ট্রফোব্লাস্টের বাইরের স্তরকে *সিনট্রফোব্লাস্ট* (Syntrophoblast) বলা হয়। অনুমান করা হয় মাতৃকলার সংস্পর্শে ট্রফোব্লাস্টের এই বৃদ্ধিকে উদ্দীপ্ত করে কারণ সদ্য সংলগ্নীকৃত (implanted) ভ্রূণের যে অংশ জরায়ুর গহ্বরে অনাবৃত থাকে সে অংশের ট্রফোব্লাস্ট এককোষ স্তর (single cell layer) দ্বারা গঠিত থাকে।

সংলগ্ন হবার সময় ট্রফোব্লাস্ট জরায়ুর মিউকোসার ক্ষতি করে পরে ক্রমশঃ এপিথিলিয়াম, যোগকলা ও এণ্ডোথিলিয়াম - এই তিনটি স্তরই ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ভ্রূণ ব্যাপন প্রক্রিয়ায় (diffusion) জরায়ুর থেকে পুষ্টিরস শোষণ করে। এই সময় প্রসারণশীল সিনট্রফোব্লাস্ট স্তরের মধ্যে অসংখ্য গহ্বর (lacunae) দেখা যায় এবং এগুলি জরায়ুর ক্ষয়প্রাপ্ত রক্তবাহের রক্তে পূর্ণ হয়ে রক্তময় ল্যাকুনির (blood lacunae) সৃষ্টি করে। ট্রফোব্লাস্ট থেকে নিঃসৃত পদার্থ রক্ত তঞ্চনে (blood coagulation) বাধা দেয়। প্রসারণরত ট্রফোব্লাস্ট এণ্ডোমেট্রিয়ামের ক্ষয়প্রাপ্ত অঞ্চলে মাতৃরক্ত ও লসিকা (lymph) রসে সংপৃক্ত (saturated) থাকে।

ইমপ্লানটেসনের পরবর্তী দশায় ট্রফোব্লাস্টে ভিলাই সৃষ্টি হতে দেখা যায়। তরুণ অবস্থায় এই ভিলাই বা অভিক্ষেপগুলি শুধুমাত্র এপিথিলিয়াম দ্বারা তৈরী হয়। এগুলিকে *প্রাথমিক ভিলাই* (primary villi) বলা হয়। ক্রমে কোরিয়ন এর পরিবর্তীস্তর এ্যালানটয়েসের সঙ্গে মিলিত হয়ে কোরিও এ্যালানটয়েস গঠন করে। এরফলে এ্যালানটয়েসের রক্তবাহ ও মেসোডার্ম প্রসারিত হয় ও ভিলাই তৈরীতে অংশগ্রহণ করে। এ্যালানটয়েসের মেসোডার্ম কোষের থেকে উদ্ভূত যোগকলা সংযোগে ভিলাইগুলি সমৃদ্ধ হয়। এগুলিকে *সেকেণ্ডারী ভিলাই* (secondary villi) বলে। সেকেণ্ডারী ভিলাই শাখান্বিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রূণের রক্তবাহগুলিও এই অঞ্চলে একত্রিত হয়ে *টারশিয়ারী ভিলাই* (tertiary villi) গঠন করে। ইতিমধ্যে জরায়ু জালময় কোষকলা সম্বলিত হয়ে নতুন রূপ ধারণ করে। একে *ট্রফোস্পঞ্জিয়া* (trophospongia) বলা হয়। ভ্রূণের ট্রফোব্লাস্ট ও মাতার ট্রফোস্পঞ্জিয়ার মধ্যে শারীরবৃত্তিয় মিলন ঘটে। এরফলে শোষণ ও অন্যান্য আদান-প্রদান অনেক সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় (চিত্র নং 7.4 ও 7.6)।

জরায়ুর এণ্ডোমেট্রিয়ামের ভ্রূণের উপর প্রসারিত অংশকে *ডেসিডুয়া ক্যাপসুলারিস* (decidua capsularis) এবং এণ্ডোমেট্রিয়ামের যে অংশ জরায়ুর পেশী ও প্রবিষ্টমান ভিলাই-এর মধ্যে অবস্থিত তাকে *ডেসিডুয়া বেসালিস* (decidua basalis) বলে। এই দুই অংশ বাদ রেখে এণ্ডোমেট্রিয়ামের বাকী অঞ্চলকে *ডেসিডুয়া পেরাইটালিস* (decidua parietalis) বলা হয়।

কোরিয়নিক ভিলাই কোরিয়নিক ভেসিকলের সর্বত্র গঠিত থাকলেও শুধুমাত্র ডেসিডুয়া বেসালিস সংস্পর্শে যেগুলি থাকে তাদেরই বৃদ্ধি হয়। এই ভিলাইযুক্ত এলাকাকে *কোরিয়ন ফ্রণ্ডোসাম* (chorion frondosum) বলে। ভিলাইমুক্ত কোরিয়নকে *কোরিয়ন লিভি* (chorion leave) বলা হয়। অতএব বলা যায় যে, কোরিয়ন ফ্রণ্ডোসাম ও ডেসিডুয়া বেসালিস মিলিতভাবে অমরা গঠন করে।

পরিস্ফুরণের ভিত্তিতে খরগোসের অমরাকে কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করা যায়। এগুলি যথাক্রমে এপিথিলিওকোরিয়াল, সিনডেসমোকোরিয়াল, এণ্ডোথিলিওকোরিয়াল, হিমোকোরিয়াল ও হিমোএণ্ডোথিলিয়াল দশা। আবার ভ্রূণবিজ্ঞানী এণ্ডার্স (Enders, A. C., 1965) এর মতে খরগোসের কোরিয়নের দুটি স্তর অত্যন্ত ক্ষয়প্রাপ্ত অবস্থায় থাকে, একেবারে বিনষ্ট হয় না। এই কারণে খরগোসের অমরা হিমোএণ্ডোথিলিয়াল নয়, *হিমোডাইকোরিয়াল* (Hemodichorial) প্রকৃতির। চিত্র নং 7.7, 7.8, 7.9)।

7.6 অমরার বাধা (Placental barrier) ঃ

উন্নতশ্রেণীর স্তন্যপায়ী প্রাণীতে ভ্রূণ ও মাতার মধ্যে সম্পর্ক খুব নিবিড় হওয়া স্বত্বেও কোনও সময়ই ভ্রূণ ও মাতৃরক্তের প্রত্যক্ষ সংমিশ্রণ ঘটে না। ভ্রূণের এপিথিলিয়াল কলা এক্ষেত্রে বাধা স্বরূপ থাকে। একেই অমরা বা প্লাসেন্টার বাধা (Placental barrier) বলা হয়। এই বাধা দ্বি-মুখী প্রবাহে বিঘ্ন ঘটায় না -ভ্রূণের দেহের বর্জ পদার্থ পরিত্যাগ ও মাতার দেহ থেকে পুষ্টি ভ্রূণের দেহে সরবরাহ অব্যাহত থাকে।

7.7 অমরার কাজ (Functions of Placenta) ঃ

অমরার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ উল্লেখ করা হল ঃ

1. অমরার মাধ্যমে ভ্রূণ মাতার জরায়ু সংলগ্ন হওয়ার ফলে সুরক্ষিত থাকে।
2. অমরা মধ্য দিয়ে ব্যাপন (diffusion) প্রক্রিয়ায় ভ্রূণ মাতার দেহ থেকে অক্সিজেন, বিভিন্নপ্রকার জৈব এবং অজৈব আয়ন (ion) গ্রহণ করে। আবার ভ্রূণের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় বিভিন্নপ্রকার শর্করা, প্রোটিন, লিপিড ইত্যাদি সক্রিয় সংবহনের (active transport) মাধ্যমে মাতার দেহ থেকে ভ্রূণের দেহে সরবরাহ হয়। হরমোন, অ্যান্টিবডি ইত্যাদি মাতার দেহ থেকে ভ্রূণে পরিবহন পিনোসাইটোসিস (pinocytosis) প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ঘটে থাকে।
3. ভ্রূণের দেহে অপচিতিমূলক কাজের ফলে উৎপন্ন বিভিন্ন প্রকার বর্জ পদার্থ, যেমন - কার্বন-ডাই-অকসাইড, ইউরিয়া, ইলেকট্রোলাইট ইত্যাদি মাতার দেহে পরিবাহিত হয়।
4. অমরা ভ্রূণের দেহে জীবাণুর প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করে।
5. অমরা স্টেরয়েড হরমোন ইস্ট্রোজেন (estrogen) ও প্রোজেস্টেরন (progesterone) নিঃসরণ করে। এই হরমোনগুলি ভ্রূণের জরায়ুর গাত্র-সংলগ্ন (implantation) হওয়া ও বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। প্রোটিন হরমোন লুটিওট্রপিন ((luteotropin) স্তনগ্রন্থিকে সক্রিয় করে তুলতে সাহায্য করে। (চিত্র নং7.5)

7.8 সারাংশ ঃ

প্ল্যাসেন্টা বা অমরা শব্দটির অর্থ 'চ্যাপ্টা কেক'। মনোট্রিমাটা ব্যতিরেকে এটি স্তন্যপায়ী প্রাণীর এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

অমরা একটি অস্থায়ী গঠন যা কেবল ভ্রূণ মাতৃজরায়ুতে থাকাকালীন ভ্রূণকলা ও মাতৃকলার সংযোগে তৈরী হয়। এর মাধ্যমে ভ্রূণ মাতার দেহ থেকে পুষ্টি, অক্সিজেন ইত্যাদি গ্রহণ করে, ভ্রূণের বৃদ্ধি সাধিত হয়। অপরদিকে এর মাধ্যমে ভ্রূণের দেহ থেকে অপচিতিমূলক বর্জ পদার্থ যেমন কার্বন-ডাই-অকসাইড, নাইট্রোজেন বিপাকীয় বর্জ মাতার দেহে পরিবাহিত হয়। এই অমরার মাধ্যমে ভ্রূণ জরায়ুর গাত্র-সংলগ্ন হয়ে সুরক্ষিত অবস্থায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

উৎপত্তি অনুযায়ী অমরা দুই প্রকার - 1) কুসুমথলি অমরা, 2) এ্যালানটয়িক অমরা।

অমরা গঠনের প্রকারভেদ এবং ভ্রূণ ও মাতার ঘনিষ্ঠতার গভীরতার ভিত্তিতে অমরা পাঁচ প্রকার। যথা- 1) এপিথিলিও-কোরিয়াল 2) সিনডেসমো-কোরিয়াল 3) এণ্ডোথিলিও-কোরিয়াল 4) হিমোকোরিয়াল 5) হিমোএণ্ডোথিলিয়াল।

ভ্রূণ ও মাতার বন্ধনের ভিত্তিতে অর্থাৎ সন্তান প্রসবের সময় মাতার জরায়ুর ক্ষতির পরিমাণের ভিত্তিতে অমরা তিন প্রকার ঃ - 1) নন-ডেসিডুয়াস 2) ডেসিডুয়াস 3) কনট্রা ডেসিডুয়াস।

ভিলাই-এর সজ্জাবিন্যাস অনুযায়ী অমরা কয়েকপ্রকার 1) পরিব্যাপ্ত 2) গুচ্ছাকার 3) আঞ্চলিক 4) চাকতি ও 5) দ্বি-চাকতি।

খরগোসের অমরা অত্যন্ত উন্নত প্রকৃতির। ভ্রূণ ও মাতার মধ্যে দ্রুত ও সুদৃঢ় সংযোগ স্থাপনের জন্য ভ্রূণের ট্রফোব্লাস্ট বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে জরায়ুর এপিথিলিয়াম, যোগকলা ও রক্তবাহের এণ্ডোথিলিয়াল প্রাচীর ক্ষতিগ্রস্ত করে এবং রক্তময় ল্যাকুনার সৃষ্টি হয়। পরবর্তী পর্য্যায়ে ভ্রূণের এণ্ডোথিলিয়াম মাতা ও ভ্রূণের রক্তপ্রবাহ পৃথক রাখে। প্রসবের সময় মাতৃজরায়ুর অন্তঃস্তরে কোনও রক্তক্ষরণ হয় না বা জরায়ু কোনওভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় না।

7.9 প্রশ্নাবলী ঃ

1. তুলনা করুন ঃ -
   - (i) কুসুমথলি অমরা ও এ্যালানটয়িক অমরা
   - (ii) নন্‌ডেসিডুয়াস অমরা ও ডেসিডুয়াস অমরা
   - (iii) সাইটোট্রফোব্লাস্ট ও সিনট্রফোব্লাস্ট
   - (iv) ডেসিডুয়া বেসালিস ও ডেসিডুয়া পেরাইটালিস
   - (v) হিমোকোরিয়াল ও হিমোএণ্ডোকোরিয়াল অমরা

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ
   - (i) কোরিয়ন ফ্রন্ডোসাম কাকে বলে? এর কাজ কি?
   - (ii) ট্রফোব্লাস্ট ভিলাই-এর প্রকারভেদ ও কাজ।
   - (iii) অমরা বিন্যাস কয় প্রকার?
   - (iv) অমরা গঠনে অংশগ্রহণকারী ভ্রূণকলা ও মাতৃকলা।
   - (v) অমরার কাজ।
   - (vi) ট্রপোস্পঞ্জিয়া কি?

3. **দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

(i) অমরা কি? খরগোসের অমরা বর্ণনা করুন ও সংক্ষেপে অমরার কার্যাবলী লিখুন।

(ii) ভিলাই-এর বিন্যাস অনুযায়ী অমরা কয়প্রকার? চিত্র ও উদাহরণ সহযোগে লিখুন।

4. **শূণ্যস্থান পূরণ কর ঃ**

(i) _______________ প্রাণীতে অমরা থাকে না।

(ii) মারসুপিয়াল প্রাণীতে _______________ অমরা দেখা যায়।

(iii) অমরা মাতার _______________ ও ভ্রূণের _______________ সংযোগে গঠিত একটি _______________ গঠন।

(iv) খরগোসের সন্তান প্রসবের সময় মাতৃজরায়ুর অন্তঃস্তরের কোনও _______________ হয় না।

(v) অমরা নিঃসৃত _______________ ও _______________ হরমোন ভ্রূণের ক্রমবর্দ্ধনে সহায়তা করে।

7.10 উত্তরমালা

1. (i) 7.4.1
   (ii) 7.4.2
   (iii) 7.5
   (iv) 7.5
   (v) 7.4.5

2. (i) ভিলাইযুক্ত এলাকা
   (ii) 7.5
   (iii) 7.4.5
   (iv) 7.4.4
   (v) 7.7
   (vi) ট্রপোস্পঞ্জিয়া - টারশিয়ারী -ভিলাই তৈরীর সময় জরায়ুর শ্লেষকলার রূপান্তর।

3. (i) 7.1; 7.5; 7.7

   (ii) 7.4.3

4. (i) মনোট্রিমাটা

   (ii) ইয়কথলি প্লাসেন্টা

   (iii) ডেসিডুয়া, ট্রপোব্লাস্ট, ক্ষণস্থায়ী

   (iv) ক্ষয়

   (v) ইস্ট্রোজেন, প্রোজেসটেরন।

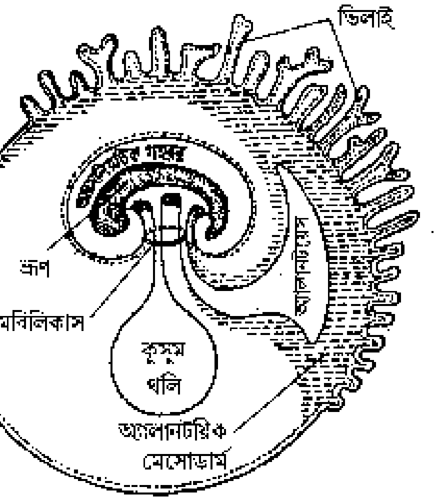

চিত্র নং 7.1 ঃ প্লাসেন্টাল স্তন্যপায়ীর ভ্রূণের চারিপাশে বিভিন্ন প্রকার বহিঃভ্রূণীয় ঝিল্লি

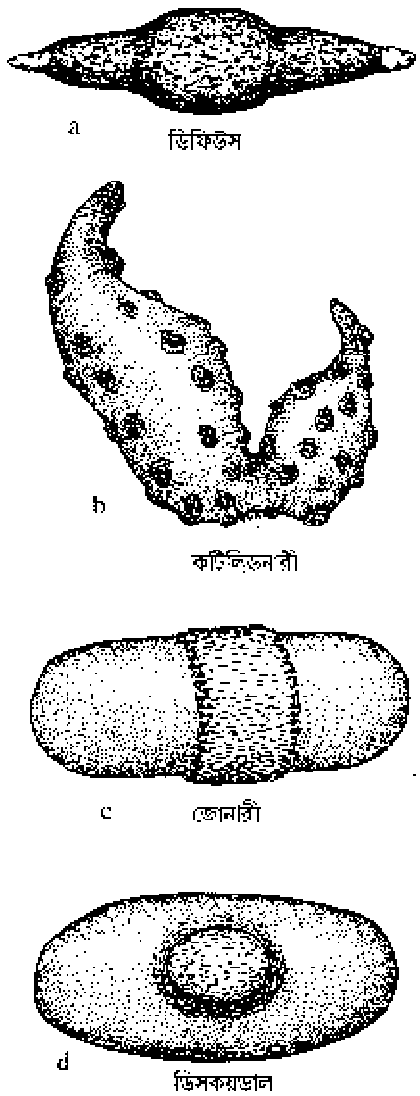

চিত্র নং 7.2 ঃ বিভিন্ন স্তন্যপায়ীর অমরা

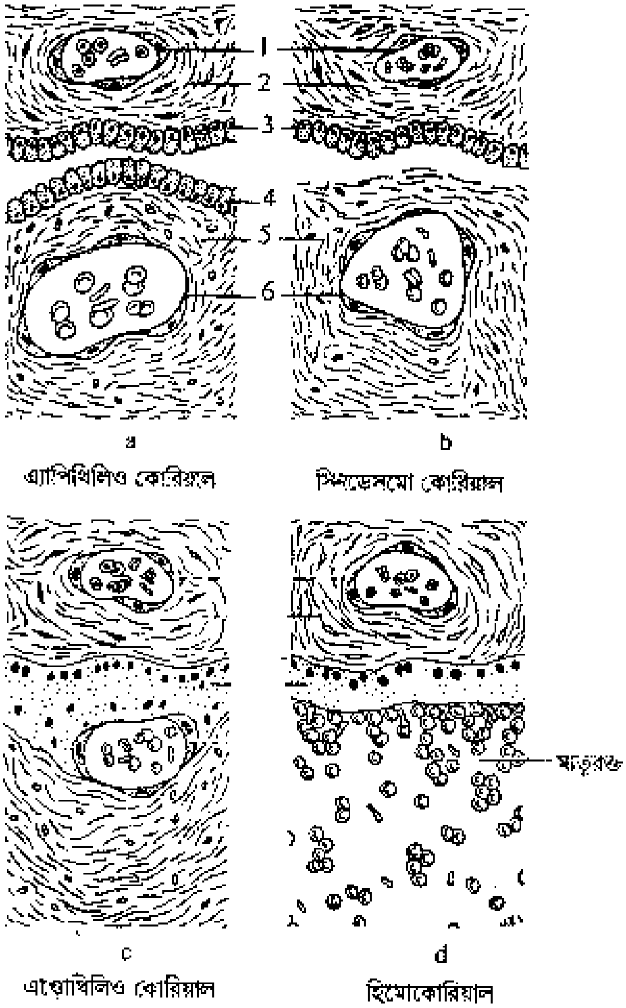

চিত্র নং 7.3 : a - d

কোরিয়ন ও জরায়ুর মধ্যে বিভিন্ন ধরণের সম্পর্কের চিত্ররূপ।

1 - কোরিয়নিক রক্তবাহ; 2 - কোরিয়নিক সংযোগ কলা; 3 - কোরিয়নিক এ্যাপিথিলিয়াম; 4 - জরায়ু - এ্যাপিথিলিয়াম; 5 - জরায়ুর সংযোগ কলা; 6- জরায়ু - রক্তবাহ।

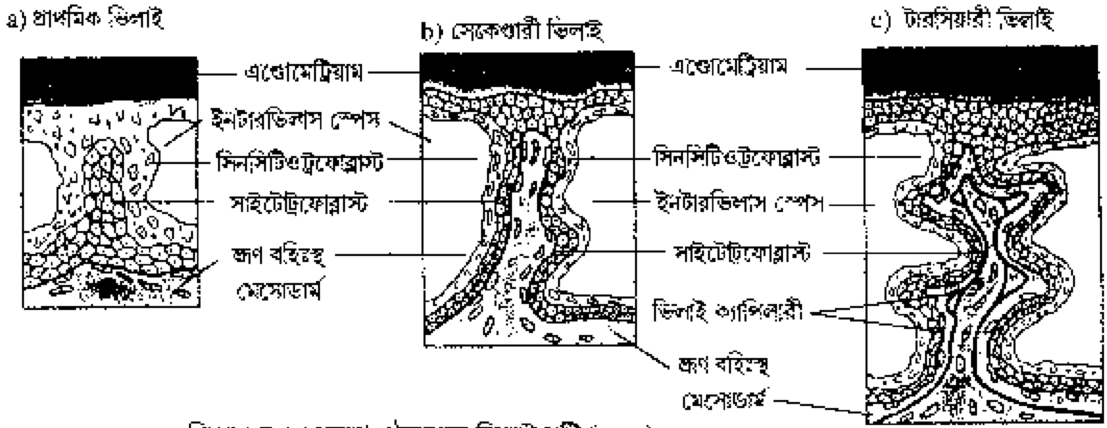

চিত্র নং 7.4 ঃ অমরা গঠনকালে ভিলাই সৃষ্টি (a - c)

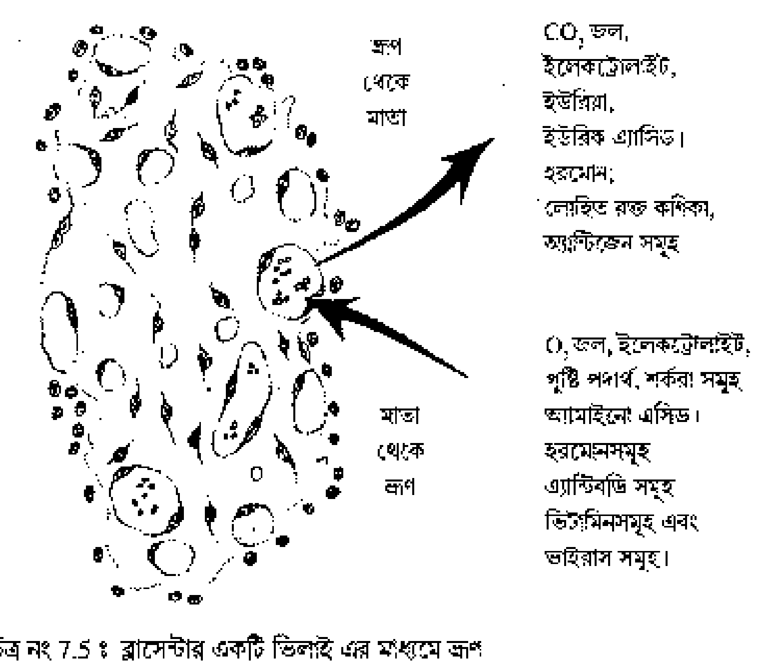

চিত্র নং 7.5 ঃ প্লাসেন্টার একটি ভিলাই এর মাধ্যমে ভ্রূণ ও মাতার মধ্যে প্রধান বস্তু সমূহের বিনিময়ের চিত্ররূপ।

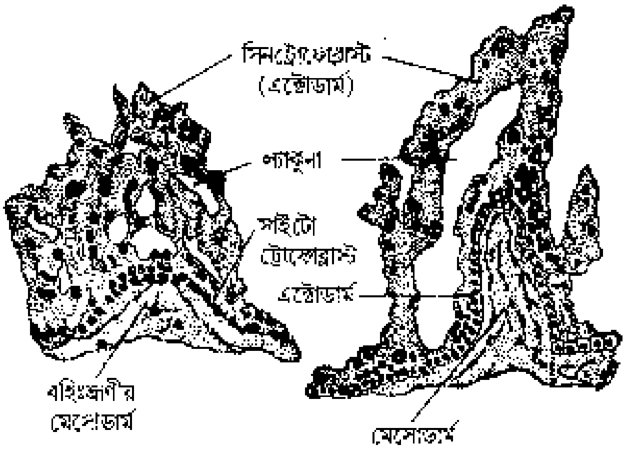

চিত্র নং 7.6 ঃ খরগোশের মৃত্ত জরায়ু প্রাচীরে সৃষ্ট অমরার প্রাথমিক ও গৌণ ভিলাই ও ল্যাকুনা সৃষ্টি।

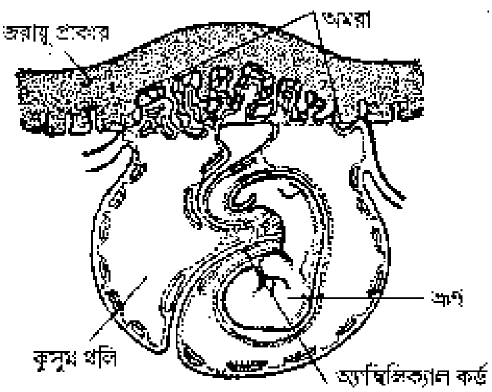

চিত্র নং 7.9 ঃ ভাঁজ সৃষ্টি হয়ে খরগোশের অমরা সৃষ্টির পরবর্তী দশা
(চিত্ররূপ মসম্যানের অনুকরণে)

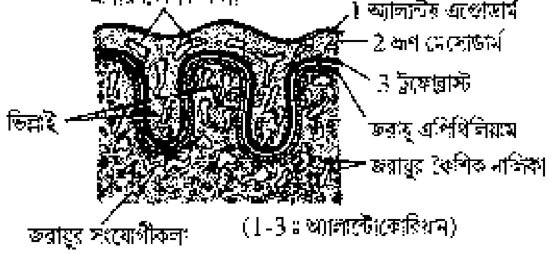

চিত্র নং 7.7 ঃ খরগোশের অমরার ছেদে মাতৃজরায়ু ও বহিঃভ্রূণীয় পর্দার সম্মিলনের চিত্ররূপ।

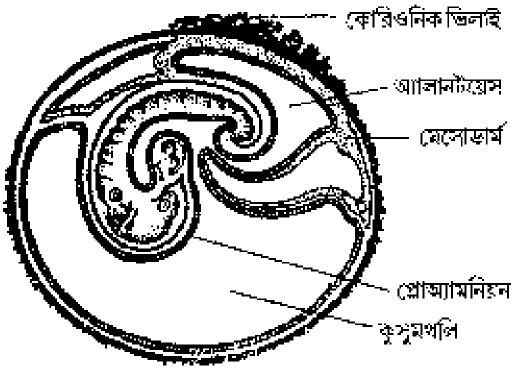

চিত্র নং 7.8 ঃ খরগোশের ভ্রূণ বৃদ্ধির দশম দিনের শেষে অমরার চিত্ররূপ (খুব কালো দাগ এক্টোডার্ম)

একক 8 □ মুরগীর মস্তিষ্কের পরিস্ফুরণ (Development of Brain in Chick)

গঠন

8.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

8.2 নিউরুলেশন - মস্তিষ্ক গঠনের প্রারম্ভিক দশা

8.2.1 নিউরুলেশনের প্রকারভেদ

8.3 মুরগীর ভ্রূণে মস্তিষ্কের পরিস্ফুরণ

8.3.1 মুরগীর ভ্রূণে নিউরুলেশন

8.3.2 নিউর‍্যাল টিউব থেকে মস্তিষ্কের রূপান্তর

8.3.3 মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চল গঠন

8.4 মস্তিষ্ক পরিস্ফুরণে কলাস্থানিক রূপান্তর

8.5 নার্ভকোষ ও নার্ভতন্তুর উৎপত্তি

8.6 মস্তিষ্ক পরিস্ফুরণে অরগানাইজারের প্রভাব

8.7 নিউর‍্যাল ক্রেস্ট কোষের উৎপত্তি ও পরিণতি

8.8 সারাংশ

8.9 প্রশ্নাবলী

8.10 উত্তরমালা

8.1 প্রস্তাবনা

এই পুস্তকটির চতুর্থ এককে ভ্রূণের পরিস্ফুরণকালে গ্যাসট্রুলেশন প্রক্রিয়ার অপরিসীম গুরুত্ব বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। জটিল ঘটনাসমন্বিত এই প্রক্রিয়ায় তিনটি প্রাথমিক জারমিনাল বা জনিতৃ কোষস্তরের সৃষ্টি হয়। তিনটি কোষস্তরের নাম – এক্টোডার্ম এণ্ডোডার্ম এবং মেসোডার্ম। উক্ত তিনটি কোষস্তর থেকে ভ্রূণের বিভিন্ন অঙ্গ উৎপাদনকারী কোষগুলি স্থান পরিবর্তন ও পুনবিন্যস্ত হয়ে ভাবী ভ্রূণের যথোপযুক্ত অঙ্গসংস্থানিক অঞ্চল দখল করে এবং ক্রমে নির্দিষ্ট অঙ্গ গঠন করে। ফলে বিশেষ প্রজাতির নির্দিষ্ট ছক অনুযায়ী ভ্রূণের স্বাভাবিক পরিস্ফুরণ সম্ভব হয়। অর্থাৎ গ্যাসট্রুলেশন দশায় ভাবী ভ্রূণের অঙ্গসংস্থানিক "ব্লু -প্রিন্ট" বা ছক প্রতিস্থাপিত হয়।

গ্যাসট্রুলেশন পর্ব সম্পন্ন হবার পরে প্রথম কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের (Central Nervous System) পরিস্ফুরণ আরম্ভ হয়। একটি সরল নলাকার নার্ভকোষ নির্মিত গঠনরূপে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের সূত্রপাত হয়। ক্রম পরিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যমে নলাকার নিউর‍্যাল টিউব জটিল প্রধানত মস্তিষ্ক (Brain) এবং সুষুম্না কাণ্ড (Spinal Cord) গঠন করে। পঞ্চম এককে প্রাইমারী অরগানাইজারের প্রভাবে একটোডার্ম থেকে নার্ভতন্ত্র গঠন ক্রিয়া বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

8.1 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- মস্তিষ্কের পরিস্ফুরণ সম্বন্ধীয় বিশেষ কতগুলি বিষয়ে আলোচনা করতে সক্ষম হবেন।
- ভ্রূণের অঙ্গ পরিস্ফুরণে বিভিন্ন কোষসমূহের প্রতিক্রিয়া ও পার্শ্বক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- একটোডার্ম নামক প্রাথমিক জারমিনাল কোষস্তর থেকে সরল নার্ভটিউবের উদ্ভব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জটিল মস্তিষ্ক গঠনে কি কি পরিবর্তন ও রূপান্তর সাধিত হয় তা নির্ধারণ করতে পারবেন।

8.2 নিউরুলেশন - মস্তিষ্ক গঠনের প্রারম্ভিক দশা

মস্তিষ্কের পরিস্ফুরণ প্রক্রিয়াটি খুবই জটিল। এই প্রক্রিয়ার প্রারম্ভে এক্টোডার্ম থেকে নার্ভবস্তুর পৃথকীকরণ ঘটে। স্বাভাবিকভাবে এক্টোডার্ম থেকে ত্বক ও ত্বক উদ্ভূত বিভিন্ন গঠনের সৃষ্টি হয়। কিন্তু বিশেষ একশ্রেণীর কোষগোষ্ঠীর (প্রাইমারি অরগানাইজার) প্রভাবে এক্টোডার্ম কোষ থেকে নার্ভবস্তুর উৎপত্তি হয়। ভ্রূণের উপযুক্ত অংশে নার্ভবস্তুর সমাবেশের ফলে *নার্ভপ্লেট* সৃষ্টি হয়। নার্ভপ্লেট থেকে ক্রমপরিবর্তন ও রূপান্তরের ফলে *নিউরাল টিউব* গঠিত হয়। নিউর্যাল প্লেট গঠন থেকে নিউরাল টিউবের সৃষ্টি প্রক্রিয়াকে *নিউরুলেশন* (Neurulation) বলে এবং এই অবস্থায় ভ্রূণকে *নিউরুলা* (Neurula) বলে। নিউরাল টিউব থেকে মস্তিষ্ক এবং সুষুম্না কাণ্ড সৃষ্টি হয়। নিউরাল টিউব গঠনের সময় এর পৃষ্ঠদেশের দুই পাশে এক বিশেষ ধরণের কোষগোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। এদের নিউর্যাল *ক্রেস্ট কোষ* (Neural Crest Cell) বলে। নিউর্যাল ক্রেস্ট কোষসমূহের পরিস্ফুরণ ক্ষমতা বহুমুখী। মস্তিষ্ক গঠনের সঙ্গে ঐ কোষসমূহের কোন সম্পর্ক নেই।

8.2.1 নিউরুলেশনের প্রকারভেদ

বিভিন্ন মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মস্তিষ্ক দু'ভাবে গঠিত হয়। যথা - (a) *থিকেণ্ড কিল মেথড* (Thickened Keel Method) এবং (b) নিউর্যাল ফোল্ড মেথড (Neural fold Method)।

(a) *থিকেণ্ড কিল মেথড* ঃ এই প্রক্রিয়ায় মস্তিষ্ক পরিস্ফুরণ অস্থিময় মাছ ও সাইক্লোস্টোম জাতীয় মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই ধরণের মস্তিষ্ক পরিস্ফুরণে মস্তিষ্ক গঠনকারী কোষগুলি একত্রিত হয়ে পরিস্ফুরণরত ভ্রূণের পৃষ্ঠতলের মধ্যরেখা বরাবর একটি নিরেট ভাঁজ সৃষ্টি করে। পরে নিরেট ভাঁজটি উপরিভাগের একটোডার্ম স্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। নিরেট ভাঁজটির মধ্যে ক্রমে গহ্বর সৃষ্টি হয়ে ফাঁপা নলের আকার ধারণ করে।

(b) *নিউর্যাল ফোল্ড মেথড* ঃ এই ধরণের মস্তিষ্কের পরিস্ফুরণ অধিকাংশ মেরুদণ্ডী প্রাণীদের ক্ষেত্রে দেখা যায়। এই ধরণের মস্তিষ্ক গঠনে নার্ভ কোষগুলি একত্রিত হয়ে পরিস্ফুরণরত ভ্রূণের পৃষ্ঠতলের মধ্যরেখা বরাবর একটি স্থূল *নিউর্যাল প্লেট* বা *মেডুলারী প্লেট* (Neural or Medullary Plate) কিংবা *নিউর্যাল প্ল্যাকোড* (Neural Placode) তৈরী করে। কয়েকটি প্রক্রিয়ার একত্রিত ক্রিয়ার ফলে নিউর্যাল প্লেটের উৎপত্তি হয়। প্রক্রিয়া দুটি -(a) পরিস্ফুরণরত ভ্রূণের পৃষ্ঠতলের সমান্তরালভাবে ভাবী নার্ভকোষগুলি প্রলম্বিত হওয়া এবং (b) উপরিতল ও অঙ্কদেশের উন্মুক্ত তল সংকুচিত হওয়ার ফলশ্রুতি। নিউর্যাল প্লেটটির অগ্রাংশটি প্রশস্ত এবং

পশ্চাৎ অংশটি ক্রমশঃ সরু হয়ে আসে অর্থাৎ ডিম্বাকৃতি বিশিষ্ট হয়। নিউর‍্যাল প্লেটের এই আকৃতিবিশিষ্ট গঠন মস্তিষ্ক পরিস্ফুরণের জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। নিউর‍্যাল প্লেট অঞ্চলের কোষসমূহের আঞ্চলিক সংকোচনের ফলে নিউর‍্যাল প্লেটটি বিশেষ আকৃতি ধারণ করে। সৃষ্ট নিউর‍্যাল প্লেটের মধ্যরেখা বরাবর একটি অনুদৈর্ঘ্য খাঁজের উদ্ভব হয় এবং খাঁজটি নীচের দিকে বিস্তৃত হয়ে একটি *নিউর‍্যাল* বা *মেডুলারী* গ্রুভ সৃষ্টি করে। নিউর‍্যাল গ্রুভ সৃষ্টির সঙ্গে নিউর‍্যাল প্লেটের পার্শ্বীয় কিনারায় এক্টোডার্ম স্তরটির মধ্য ও পৃষ্ঠদিকে পরিযান সংযোজিত হয়। উদ্ভুত খাঁজটির উপরি প্রান্তদ্বয় সংযুক্ত হয়ে একটি নলাকার গঠন সৃষ্টি করে। নার্ভকোষ নির্মিত নলটি উপরিতলের এক্টোডার্ম স্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নোটোকর্ডের ঠিক উপরে অবস্থান করে। সৃষ্ট নলটিকে নিউর‍্যাল টিউব বলে (চিত্র নং 8.1)।

8.3. মুরগীর ভ্রূণে মস্তিষ্কের পরিস্ফুরণ

মুরগীর ভ্রূণে ক্লিভেজ দশার প্রথম অবস্থায় ব্লাস্টোডার্ম কয়েকটি কোষস্তর সমন্বিত হয়। ব্লাস্টোডার্ম নিচের সাবজারমিনাল গহ্বরের উপরে অবস্থান করে। ব্লাস্টোডার্ম ক্রমে দু'টি অঞ্চলে বিভেদিত হয় - কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি স্বচ্ছ এবং এই অঞ্চলটিকে *এরিয়া পেলুসিডা* (Area Pellucida) বলে। এরিয়া পেলুসিডার পরিবৃত অঞ্চলটি অস্বচ্ছ এবং *এরিয়া অপেকা* (Area Opaca) নামে অভিহিত। ক্রমশ এরিয়া পেলুসিডা অঞ্চলটি সম্মুখভাগে প্রসারিত হয়। এই অঞ্চলের কোষগুলি কুসুম পরিত্যাগ করে স্বচ্ছ হয়। কিন্তু এরিয়া অপেকার কোষগুলি কুসুমমুক্ত হয় না, ফলে কোষগুলি অস্বচ্ছ থাকে। এরিয়া পেলুসিডা থেকে ভ্রূণ গঠিত হয় এবং এরিয়া অপেকা আনুষঙ্গিক উপাঙ্গ গঠনে সাহায্য করে।

8.3.1 মুরগীর ভ্রূণে নিউরুলেশন

মুরগীর মস্তিষ্ক অন্য সকল মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মত নিউর‍্যাল টিউব থেকে গঠিত হয়। নিউর‍্যাল টিউব গঠনে তিনটি পর্যায় দেখা যায়। যথা- নিউর‍্যাল প্লেট, নিউর‍্যাল গ্রুভ এবং নিউর‍্যাল টিউব সৃষ্টি পর্ব:

মুরগীর গ্যাসট্রুলেশন অবস্থায় ভাবী এক্টোডার্ম গঠনকারী কোষসমূহ এরিয়া পেলুসিডার অগ্র ও পার্শ্বদিকে অবস্থান করে। এই অবস্থায় নোটোকর্ড অঞ্চলের সম্মুখভাগে ভাবী নার্ভতন্ত্র সৃষ্টি কোষঅঞ্চল অর্ধচন্দ্রাকার (চিত্র নং 8.2) অঞ্চলরূপে অবস্থান করে। গ্যাসট্রুলেশন প্রক্রিয়ার শেষ অঙ্কে যখন প্রিমিটিভ স্ট্রেক পশ্চাৎ দিকে সংকোচিত হয়, সেই সময় হেনসেন বর্ণিত নোডের সম্মুখে অবস্থিত নার্ভতন্ত্র মধ্যরেখা বরাবর প্রসারিত হয়ে নিউর‍্যাল প্লেট গঠনের সূত্রপাত করে। নার্ভবস্তু একত্রিত হয়ে একটি পুরু প্লেট সদৃশ *নিউর‍্যাল প্লেট* সৃষ্টি করে। নিউর‍্যাল প্লেটের অগ্রাঞ্চলটি প্রশস্ত এবং পশ্চাৎ অঞ্চলটি ক্রমশ সংকীর্ণ হওয়ায় নিউর‍্যাল প্লেটটি ডিম্বাকৃতি বিশিষ্ট হয়।

সৃষ্ট নিউর‍্যাল প্লেটের মধ্যরেখা বরাবর একটি অনুদৈর্ঘ্য অবতল খাঁজের উদ্ভব হয়। খাঁজটি নিম্নগামী হয়ে একটি গ্রুভ উৎপন্ন করে। একে *নিউর‍্যাল গ্রুভ* বলে। উক্ত গ্রুভের পরিবর্তন মুখ্যত নিউর‍্যাল প্লেটের নীচে অবস্থিত নোটোকর্ডের পার্শ্বস্থ সোমাটিক মেসোডার্ম কোষস্তরের পার্শ্বদিকে স্থানান্তকরণের ফলে সম্ভব হয়। স্থানান্তরণের ফলে উদ্ভুত জায়গায় নিম্নগামী নিউর‍্যাল গ্রুভটি প্রতিস্থাপিত হয়। নিউর‍্যাল গ্রুভটি নিম্নগামী হওয়ায় এর পার্শ্বীয় উত্থিত অনুদৈর্ঘ্য *নিউর‍্যাল ফোল্ড* প্রথমে কাছাকাছি আসে এবং পরিশেষে সম্পূর্ণ রূপে সংযুক্ত হয়। সংযোজন

প্রক্রিয়া প্রথমে আরম্ভ হয় সম্মুখভাগে এবং ক্রমে তা পশ্চাৎ দিকে প্রসারিত হয়। সংযুক্তির পর উপরে অবস্থিত নার্ভকোষ নির্মিত গঠনটি উপরে অবস্থিত ভ্রূণের এক্টোডার্ম স্তর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বতন্ত্র নলাকার গঠনে রূপান্তরিত হয় (চিত্র নং 8.3)। ঐ গঠনটিকে *নিউর‍্যাল টিউব* (Neural tube) বলে। নিউর‍্যাল টিউবের মধ্যের গহ্বরটিকে *নিউরোসিল* (Neurocoel) বলে। নিউরোসিলের অগ্রভাগটি প্রশস্ত এবং *নিউরোপোর* (Neuropore) নামক ছিদ্রপথে বাইরে উন্মুক্ত হয়। কিন্তু পরে ছিদ্রপথটি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে নিউরাল টিউবটি একটি আবদ্ধ নলাকার গঠনরূপে পরিণত হয়। এক বিশেষ ধরণের তরল দ্বারা নিউরোসিলটি পূর্ণ থাকে। তরলটিকে *সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইড* (Cerebrospinal fluid) বলে। নানা পরিবর্তন ও রূপান্তরের মাধ্যমে সরল নিউর‍্যাল টিউব থেকে পূর্ণগঠিত মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কাণ্ডের উৎপত্তি হয়।

অনুশীলনী - 1

(a) সঠিক উত্তরটিতে (√) চিহ্ন এবং ভুলটিতে (X) চিহ্ন দিন -

1. এণ্ডোডার্ম থেকে নার্ভতন্ত্র গঠিত হয়।
2. নিউর‍্যাল টিউব থেকে কেবলমাত্র সুষুম্না কাণ্ডের উৎপত্তি হয়।
3. নিউর‍্যাল টিউব নিউর‍্যাল প্লেট থেকে সৃষ্টি হয়।
4. নিউর‍্যাল টিউবের গহ্বরকে সিলোম বলে।
5. এরিয়া অপেকা থেকে মুরগীর ভ্রূণ গঠিত হয়।

(b) উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

1. নিউর‍্যাল টিউব থেকে ______________ ও ______________ কাণ্ড সৃষ্টি হয়।
2. নিউর‍্যাল প্লেট থেকে নিউর‍্যাল টিউব সৃষ্টিকে ______________ বলে।
3. ব্লাস্টোডার্ম ____________ গহ্বরের উপরে অবস্থিত।
4. এরিয়া ______________ থেকে ______________ গঠিত হয়।
5. নিউর‍্যাল টিউবের গহ্বরকে ______________ বলে এবং ______________ নামক ছিদ্র পথে বাইরে উন্মুক্ত থাকে।

8.3.2 নিউর‍্যাল টিউব থেকে মস্তিষ্কের রূপান্তর

ভ্রূণের পরিস্ফুরণকালে সরল নিউর‍্যাল টিউব থেকে মস্তিষ্ক ও সুষুম্নাকাণ্ড গঠনে কয়েকটি বাহ্য ও অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া কার্যকরী হয়। নিউর‍্যাল টিউবের অগ্রভাগের এবং তৃতীয় অংশ স্ফীত হয়ে মস্তিষ্ক এবং অবশিষ্ট পশ্চাৎ ভাগটি প্রলম্বিত হয়ে *সুষুম্না কাণ্ড* গঠন করে। অগ্রভাগের প্রশস্ত মস্তিষ্ক অংশটি পশ্চাতের সুষুম্না কাণ্ডের সঙ্গে একটি সংকীর্ণ সংকুচিত অংশ দ্বারা যুক্ত থাকে। মস্তিষ্ক রূপান্তরকালে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। এই পরিবর্তনে তিনটি প্রক্রিয়া সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে, যথা - (a) নিউর‍্যাল টিউবের প্রাচীরে অসম

কোষ-বিভাজনের হার এবং প্রাচীরের অসমান পুরুত্ব অর্জন, (b) নিউর‍্যাল টিউবের প্রাচীর গাত্র থেকে উদ্ভূত উপবৃদ্ধি এবং (c) বিভিন্ন ধরণের বক্রতা ও ভাঁজের সৃষ্টি। মস্তিষ্ক গহ্বরে আবদ্ধ সেরিব্রোস্পাইনাল ফ্লুইডের অভ্যন্তরীণ চাপ এবং প্রাচীর গাত্রের অঞ্চলভিত্তিক বৃদ্ধির সহক্রিয়ার প্রভাবে মস্তিষ্ক বিশেষ গঠন ও আকার ধারণ করে।

8.3.3 মস্তিষ্কের বিভিন্ন অঞ্চল গঠন

আপনি আগেই জেনেছেন যে, নিউর‍্যাল টিউবের অগ্রাংশ স্ফীত ও প্রশস্ত হয়। এই ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে দু'টি সুস্পষ্ট সংকোচন দৃষ্ট হয়। সংকোচন ক্রমে গভীরতর হয় এবং সরল ঋজু মস্তিষ্ক অংশটি তিনটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়, যথা-প্রথম অঞ্চলটির নাম *প্রোসেনসেফালন* (Prosencephalon), মধ্যমাঞ্চলটির নাম *মেসেনসেফালন* (Mesencephalon) এবং পশ্চাৎ অঞ্চলটি *রম্বেনসেফালন* (Rhombencephalon) (চিত্র নং 8.4)। মেসেনসেফালন অঞ্চলটি অবিভক্ত থাকে এবং পূর্ণগঠিত মস্তিষ্কের অবটিক লোব গঠন করে। কিন্তু প্রোসেনসেফালন ও রম্বেনসেফালন পুণরায় সংকোচনের দ্বারা প্রতিটি দু'ভাগে বিভক্ত হয়। চিত্র নং 8.5 এবং 8.6 চিত্রে মুরগীর ভ্রূণের বিভিন্ন দশা দেখানো হয়েছে। প্রোসেনসেফালন বিভেদিত হয়ে টিলেনসেফালন ও ডাইয়েনসেফালন উৎপন্ন করে। টিলেনসেফালন থেকে সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার ও অলফ্যাকটরি লোব সৃষ্টি হয়। মেসেনসেফালন থেকে অপটিক লোব গঠিত হয়। রম্বেনসেফালনটি মেটেনসেফালন ও মায়েলেনসেফালনে বিভক্ত হয়ে যথাক্রমে সেরিবেলাম ও মেডালা অবলংগাটা গঠন করে (চিত্র নং 8.5)।

করোটির মধ্যস্থ করোটিক-গহ্বরে অবস্থানের জন্য সমান্তরাল ঋজু প্রাথমিক মস্তিষ্ক নির্দিষ্টভাবে বক্রতা অর্জন করে। এই ধরণের বক্রতাকে *ফিসার* (Fissure) বলে। প্রথম বক্রতা মেসেনসেফালনের অঙ্কতলে সংঘটিত হয় এবং *ক্রেনিয়াল* (Cranial) ফিসার নামে অভিহিত। দ্বিতীয় বক্রতা মস্তিষ্ক ও সুষুম্না কাণ্ডের সংযোগস্থলে। এই বক্রতাকে *সারভাইকাল* (Cervical) ফিসার বলে। তৃতীয় বক্রতা *পনটাইন* (Pontine) ফিসার সেরিবেলাম ও মেডালা অবলংগাটার অঙ্কতলে দৃষ্ট হয় (চিত্র নং 8.6)।

8.4 মস্তিষ্ক পরিস্ফুরণে কলাস্থানিক রূপান্তর

চিত্র নং 8.7 - এ 29-সোমাইট দশার মুরগীর ভ্রূণের নিউর‍্যাল টিউবের প্রাচীরের কলা বিন্যাস দেখানো হয়েছে। ওই কলার কোষ থেকে নার্ভকোষের উৎপত্তি হয়। প্রারম্ভিক অবস্থায় নিউর‍্যাল টিউবের প্রাচীর গাত্র সিউডোএপিথিলিয়াম কলা দ্বারা গঠিত। গহ্বর সংলগ্ন কোষসমূহে মাইটোটিক কোষ বিভাজন দেখা যায়। উল্লেখ্য চিত্রে দু'টি অপত্যকোষের অর্থাৎ *জারমিনাল কোষের* (Germinal Cells) রূপান্তর দেখানো হয়েছে। গহ্বরের নিকটবর্তী অপত্য কোষটি জারমিনাল কোষরূপে কাজ করে এবং বাইরের দিকের অপত্য কোষটি জারমিনাল অঞ্চল অতিক্রম করে কর্টেকস-এর দিকে চলে আসে এবং এর বিভাজন ক্ষমতা লোপ পায়। পরিশেষে উদ্ভূত কোষটি একমেরুবিশিষ্ট (Unipolar) এবং *দ্বিমেরুবিশিষ্ট* (Bipolar) নার্ভকোষের মাধ্যমে বহু *মেরুবিশিষ্ট* (Multipolar) নার্ভকোষে পরিণত হয়। নিউরিলিমা কোষ ক্রমে অ্যাকসনে এবং পরিশেষে মায়েলিনসিথ-এ সংযোজিত হয় (চিত্র নং 8.7)।

8.5 নার্ভকোষ ও নার্ভতন্তুর উৎপত্তি

টিসু কালচার পদ্ধতির সাহায্যে নিউরাল টিউবের প্রাচীরে অবস্থিত জনিতৃ কোষ থেকে নিউরোব্লাস্ট কোষ উৎপন্ন করে তার থেকে নার্ভকোষ গঠন করা যায়। নিউরোব্লাস্ট থেকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ আকারবিশিষ্ট *নার্ভকোষ* বা *নিউরোন* (Neurone) উৎপত্তি একটি লক্ষ্যণীয় ঘটনা। চিত্র নং 8.8 এ প্রদর্শিত ছক অনুযায়ী একটি বায়ুরুদ্ধ আর্দ্র পাত্রে তঞ্চিত রক্তের মধ্যে নিউর‍্যাল টিউবের গাত্র থেকে খণ্ডিত ক্ষুদ্রাকার অংশ রাখা হল (a)। প্রথমে টিসু কালচার পাত্রে নিউরোব্লাস্ট কোষগুলি বিচ্ছিন্ন হয়ে আলাদা হয়ে যায়। চিত্রে প্রদত্ত একটি নিউরোব্লাস্ট থেকে কিভাবে নার্ভকোষের রূপান্তর সম্পন্ন হয় দেখানো হয়েছে। প্রথমে নিউরাস্ট এর এক প্রান্ত থেকে একটি উপবৃদ্ধির সৃষ্টি হয়। সৃষ্ট উপবৃদ্ধির অগ্রপ্রান্তটি থেকে *বর্ধনশীল শঙ্কু* (Growth Cone) উৎপন্ন হয়। শঙ্কুটি দুই বা দুইয়ের অধিক শাখায় বিভক্ত হয়ে অতিরিক্ত বর্ধনশীল শঙ্কু গঠন করে। এইভাবে নার্ভতন্তুর উদ্ভব হয়।

8.6 মস্তিষ্ক পরিস্ফুরণে অরগানাইজারের প্রভাব

মস্তিষ্ক পরিস্ফুরণ অরগানাইজারের ক্রিয়ার উপর নির্ভরশীল। ভ্রূণের এক্টোডার্ম থেকে স্বাভাবিকভাবে ত্বক গঠিত হয়। কিন্তু প্রাইমারী অরগানাইজার (কর্ডামেসোডার্ম) এর প্রভাবে এক্টোডার্ম নার্ভতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়। এই প্রক্রিয়াকে ইনডাকশন বলে। পঞ্চম এককে মস্তিষ্ক গঠনে অরগানাইজারের প্রভাব ক্রিয়া ও প্রকৃতি বিশদভাবে আলোচিত হয়েছে।

অনুশীলনী - 2

(a) সঠিক উত্তরটিতে (√) চিহ্ন এবং ভুলটিতে (X) চিহ্ন দিন -

1. মস্তিষ্কের প্রোসেনসেফালন হইতে অপটিক লোব সৃষ্টি হয়।
2. নিউরোব্লাস্ট থেকে নার্ভকোষের উৎপত্তি হয়।
3. নার্ভকোষের অপর নাম নিউরোণ।
4. কর্ডামেসোডার্ম নার্ভতন্ত্র গঠনে অরগানাইজাররূপে কাজ করে।
5. মেসেনসেফালনের অঙ্কতলে সৃষ্ট বক্রতাকে পনটাইন ফিসার বলে।

(b) উপযুক্ত শব্দ দ্বারা শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

1. মস্তিষ্কের তিনটি প্রাথমিক বিভাগের নাম হল ______________, মেসেনসেফালন এবং ______________ ।
2. মেসেনসেফালন থেকে ______________ লোব উৎপন্ন হয়।
3. নার্ভকোষ ______________ থেকে গঠিত হয়।
4. ______________ প্রভাবে ______________ থেকে ______________ সৃষ্টি হয়।
5. মস্তিষ্কের ______________ ফিসার প্রথম সংঘটিত হয়।

8.7 নিউর‍্যাল ক্রেস্ট কোষের উৎপত্তি ও পরিণতি

পরিস্ফুরণরত নিউর‍্যাল টিউব গঠনের সাথে সাথে এক গুচ্ছ বিশেষ ধরণের কোষ নিউর‍্যাল টিউব গঠনকারী কলা থেকে পৃথক হয়ে নিউর‍্যাল টিউবের দুই পাশে অনুদৈর্ঘ্য সারিতে অবস্থান করে। এই কোষগুলিকে *নিউর‍্যাল ক্রেস্ট কোষ* (Neural Crest Cells) বলে। নিউর‍্যাল ক্রেস্ট কোষগুলির পরিযানের ক্ষমতা আছে। ফলে পরিস্ফুরণের অগ্রগতির সময়ে উক্ত কোষগুলি ভ্রূণের অন্যান্য স্থানে স্থানান্তরিত হয়ে বিভিন্নভাবে প্রকাশিত হয়। এদের পরিস্ফুরণ ক্ষমতা বহুমুখী। নিউর‍্যাল ক্রেস্ট কোষ থেকে (ক) সুষুম্না কাণ্ড ও সিম্প্যাথেটিক গ্যাংলিয়ার নিউরোব্লাস্ট কোষ, (খ) নার্ভের মায়েলিন আবরণ উৎপাদনকারী সোয়ান কোষ (গ) নার্ভতন্তুর নিউরিলেমা আবরণ, (ঘ) রঞ্জক উৎপাদনকারী মেলানোব্লাস্ট (Melanoblast), (ঙ) অ্যাড্রিন্যাল গ্রন্থির মেডালার ক্রোমাফিন (Chromaffin) কলা, (চ) মস্তিষ্কের বহিরাবরণ, (ছ) নিম্ন চোয়ালের তরুণাস্থি প্রভৃতির উৎপত্তি হয়। 1963 সালে ওয়েস্টন নামে এক বৈজ্ঞানিক তেজস্ক্রিয় পদার্থের সংযোজনের সাহায্যে নিউর‍্যাল ক্রেস্ট কোষের পরিযান ও পরিণতি সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন।

8.8 সারাংশ

ভ্রূণ গঠনে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্র প্রথম সৃষ্টি হয়। গ্যাস্ট্রুলেশনের সময় প্রাথমিক অরগানাইজারের প্রভাবে এক্টোডার্ম থেকে কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের উৎপত্তি হয়। কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের প্রধান অংশ হল মস্তিষ্ক। মুরগীর মস্তিষ্কের গঠন খুবই জটিল। প্রাথমিক অবস্থায় মস্তিষ্ক একটি সরল গঠনের নিউর‍্যাল টিউব থেকে উদ্ভূত হয়। নিউর‍্যাল টিউবটির অগ্রাংশ বিশেষভাবে রূপান্তরিত হয়ে জটিল মস্তিষ্কে পরিণত হয় এবং পশ্চাৎ অংশটি অপেক্ষাকৃত শীর্ণ সুষুম্না কাণ্ড রূপে থাকে। মস্তিষ্ক পরিস্ফুরণে প্রথমে দু'টি সংকোচনের ফলে সরল মস্তিষ্ক তিনটি অঞ্চলে বিভেদিত হয়, যথা- প্রোসেনসেফালন, মেসেনসেফালন ও রম্বেনসেফালন। প্রোসেনসেফালন পুণরায় দু'ভাবে বিভেদিত হয়ে টিলেনসেফালন ও ডাইয়েনসেফালন গঠন করে। টিলেনসেফালন থেকে মস্তিষ্কের প্রধান ও গুরুত্বপূর্ণ অংশ সেরিব্রাল হেমিস্ফিয়ার উৎপন্ন হয়। মেসেনসেফালন অবিভক্ত থাকে এবং অপটিক লোবে পরিণত হয়। রম্বেনসেফালন ক্রমে মেটেনসেফালন ও মায়েলেনসেফালনে রূপান্তরিত হয়। করোটিক গহ্বরে অবস্থানের জন্য মস্তিষ্কে কয়েকটি নির্দিষ্ট কৌণিক বক্রতা বা ফিসারের সৃষ্টি হয়। যথা- ক্রেনিয়াল, সারভাইকাল ও পনটাইন।

আকৃতিগত পরিবর্তন ছাড়াও কোষস্তরে রূপান্তর তাৎপর্যপূর্ণ। গঠনকালে নিউর‍্যাল টিউবের গাত্র সিউডোএপিথিলিয়াম কলা দ্বারা গঠিত থাকে। এই কলার কোষ থেকে সৃষ্ট নিউরোব্লাস্ট বিশেষ আকৃতি বিশিষ্ট নার্ভকোষে রূপান্তরিত হয়।

8.9 প্রশ্নাবলী

(a) নিউরুলেশন কাহাকে বলে ? নিউরুলেশন প্রক্রিয়াটি চিত্রসহ বর্ণনা করুন।

(b) নিউরুলেশন প্রক্রিয়ার প্রকারভেদ বর্ণনা করুন।

(c) নিউর‍্যাল টিউব থেকে মস্তিষ্কের রূপান্তর প্রক্রিয়ার সচিত্র বিবরণ দিন।

(d) ফিসার কাহাকে বলে? চিত্র সহ মস্তিষ্কের বিভিন্ন ফিসারের উৎপত্তি বর্ণনা করুন।

(e) নিউরেশন কাহাকে বলে? চিত্র সংযোগে নিউরোব্লাস্ট থেকে নিউরোণের সৃষ্টি পর্ব বর্ণনা করুন।

(f) নিউর‌্যাল ক্রেস্ট কোষের উৎপত্তি এবং ক্রমিক পরিণতি সম্বন্ধে আলোচনা করুন।

8.10 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1

(a) 1 = **(X)**, 2 = **(X)**, 3 = **(√)**, 4 = **(X)**, 5 = **(X)**

(b) 1 = মস্তিষ্ক, সুষুম্না;

2 = নিউরুলেশন;

3 = সাবজারমিনাল;

4 = পেল্লুসিডা, ভ্রূণ;

5 = নিউরোসিল, নিউরোপোর।

অনুশীলনী - 2

(a) 1 = **(X)**, 2 = **(√)**, 3 = **(√)**, 4 = **(√)**, 5 = **(X)**

(b) 1 = প্রোসেনসেফালন, রম্বেনসেফালন।

2 = অপটিক।

3 = নিউরোব্লাস্ট।

4 = অরগ্যানাইজারের, একটোডার্ম, নার্ভতন্ত্র।

5 = ক্রেনিয়াল।

প্রশ্নাবলীর উত্তর

(a) মস্তিষ্ক গঠনে নিউর‌্যাল প্লেট থেকে নিউর‌্যাল টিউবের গঠন পর্বকে নিউরুলেশন বলে। দ্বিতীয় অংশের জন্য 8.2.1 এর (খ) অংশ দেখুন।

(b) উত্তরটির জন্য 8.2.1 অংশ দেখুন।

(c) 8.3.2 ও 8.3.3 অংশটি দেখুন।

(d) করোটিক গহ্বরে অবস্থানের জন্য সমান্তরাল ঋজু প্রাথমিক মস্তিষ্ক নির্দিষ্টভাবে বক্রতা অর্জন করে। এই ধরণের বিশেষ বক্রতাকে ফিসার বলে।

বাকী অংশটির জন্য 8.3.3 এর শেষ অনুচ্ছেদ এবং চিত্র নং 8.6 দেখুন।

(e) কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রের গঠনগত ও ক্রিয়াগত একককে নিউরোণ বা নার্ভকোষ বলে। উত্তরের বাকী অংশটির জন্য 8.5 এবং চিত্র নং 8.8 দেখুন।

(f) উত্তরটি 8.7 অংশে বর্ণিত আছে।

একক 8 -এর চিত্রাবলী

চিত্র নং 8.1 - (a-c) নিউরুলেশনের বিভিন্ন দশা।

চিত্র নং 8.2 - গ্যাসট্রুলেশন দশার প্রারম্ভিক অবস্থায় মুরগীর ভ্রূণের ব্লাস্টোডার্মের সংগঠন। বিভিন্ন ভ্রূণাঙ্গ গঠনকারী কোষগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট অবস্থান দেখানো হয়েছে।

চিত্র নং 8.3 - মুরগীর ভ্রূণের পরিস্ফূরণের বিভিন্ন দশার প্রস্থচ্ছেদের সাহায্যে নিউরুলেশন দেখানো হয়েছে। ক = প্রিমিটিভ স্টেক গঠন খ = নিউর‍্যাল প্লেটের অবস্থান গ = নিউর‍্যাল টিউব গঠন এবং ঘ = নিউর‍্যাল টিউবের অঙ্গসংস্থানিক অবস্থান।

চিত্র নং 8.4 - 33 ঘন্টা বয়সী মুরগীর ভ্রূণে গঠনরত মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদ।

চিত্র নং 8.5 - মুরগীর ভ্রূণে মস্তিষ্ক গঠনের বিভিন্ন পর্যায়। a = 30 ঘন্টা বয়সী ভ্রূণের পার্শ্বদৃশ্য। b = 30 ঘন্টা বয়সী ভ্রূণের লম্বচ্ছেদ। নিউর‍্যাল টিউবের সংযুক্তি অসম্পূর্ণ। নিউরোপোর বর্তমান। মস্তিষ্কের প্রাথমিক বিভাজন সুরু। c = 55 ঘন্টা বয়সী ভ্রূণে মস্তিষ্কের বিভিন্ন অংশ সুস্পষ্ট। d = 72 ঘন্টা বয়সী ভ্রূণের পার্শ্বদৃশ্য। e = 8 দিনের ভ্রূণের পূর্ণগঠিত মস্তিষ্কের লম্বচ্ছেদ।

চিত্র নং 8.6 - মুরগীর ভ্রূণে মস্তিষ্কের রূপান্তরের বিভিন্ন ফিসারের উৎপত্তি ঃ a = 24 ঘন্টা, b = 72 ঘন্টা, c = 4 দিন ও e = 8 দিন।

চিত্র নং 8.7 - নিউর‍্যাল টিউবের প্রাচীরের চিত্ররূপ এবং নার্ভকোষের উৎপত্তি। a = 29 সোমাইট যুক্ত ভ্রূণের নিউর‍্যাল টিউবের প্রাচীরের কলাস্থানিক দৃশ্য। b = 50 জনিতৃ কোষ থেকে নার্ভকোষের উৎপত্তি।

চিত্র নং 8.8 - নিউরোব্লাস্ট থেকে নার্ভকোষ ও নার্ভতন্তুর সৃষ্টি দশা। a = বিশেষভাবে প্রস্তুত প্রকোষ্ঠে তঞ্চিত রক্তে নিউর‍্যাল টিউবের প্রাচীরের ক্ষুদ্র খণ্ড স্থাপন। b = নার্ভকোষের রূপান্তর ও নার্ভতন্তুর সৃষ্টি।

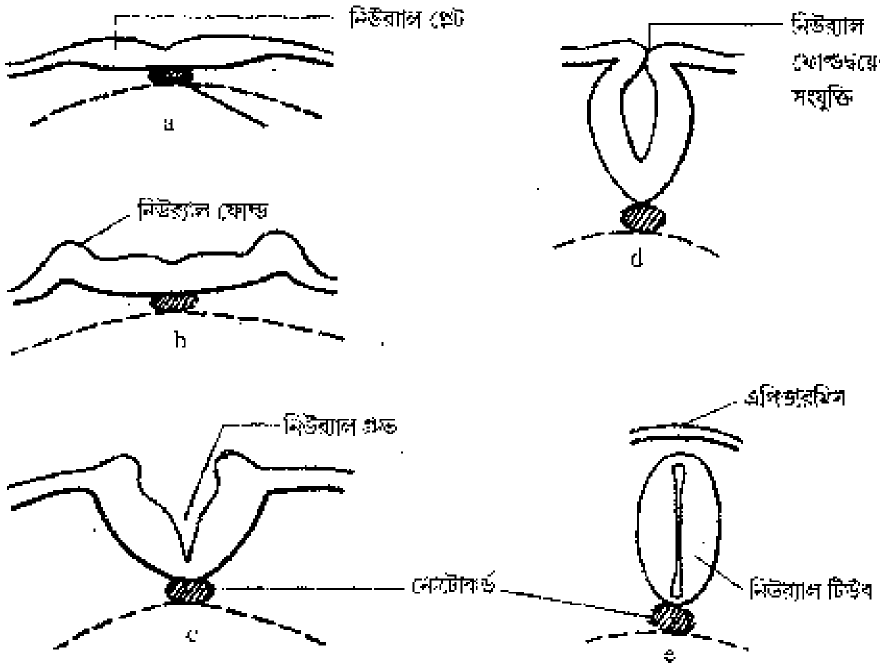

চিত্র নং ৪.1 ঃ নিউরাল

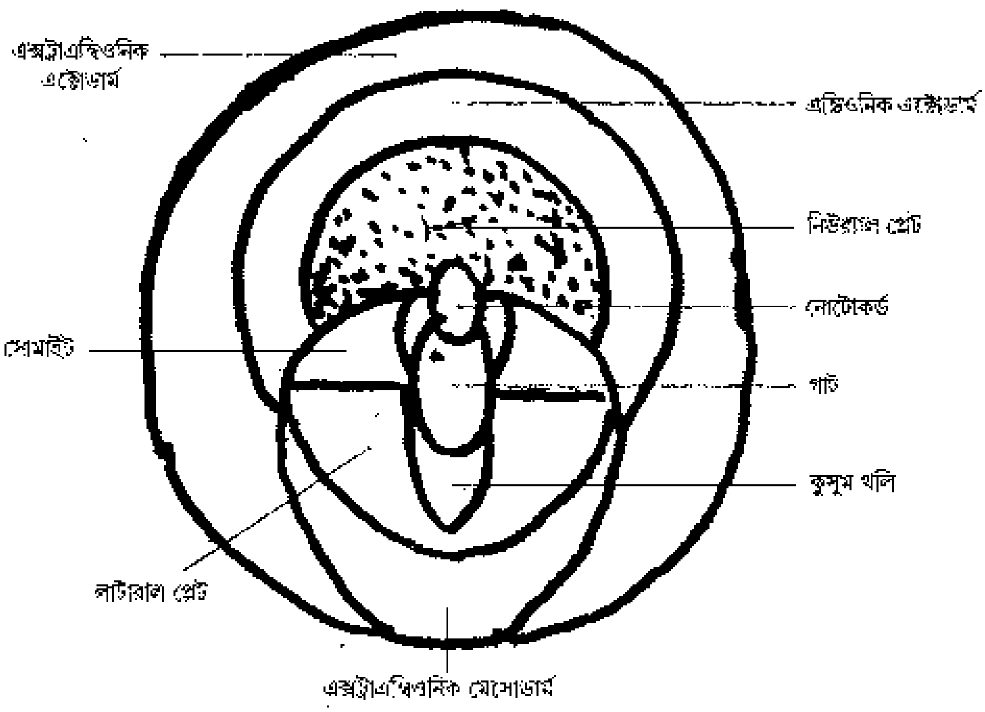

চিত্র নং ৪.2 ঃ

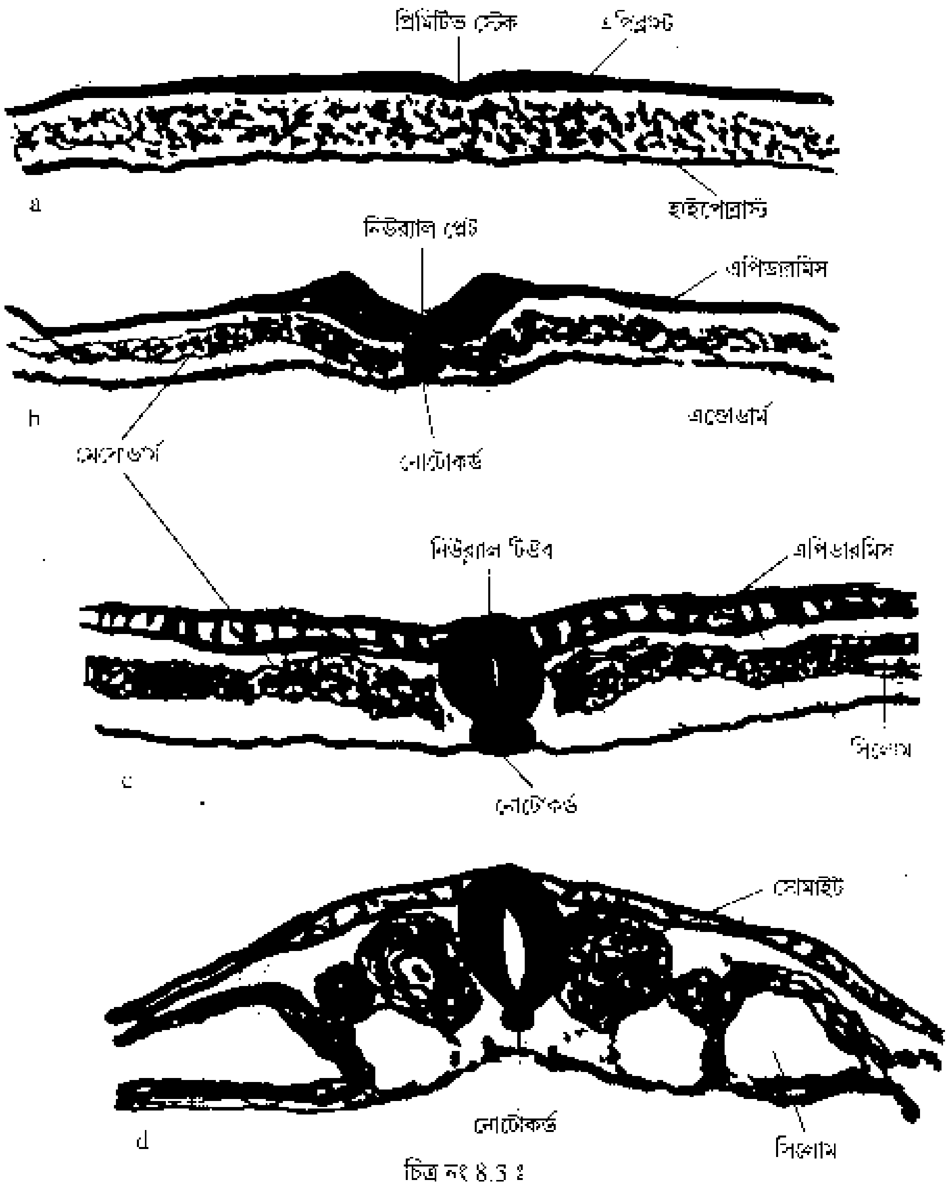

চিত্র নং ৪.৩ ঃ

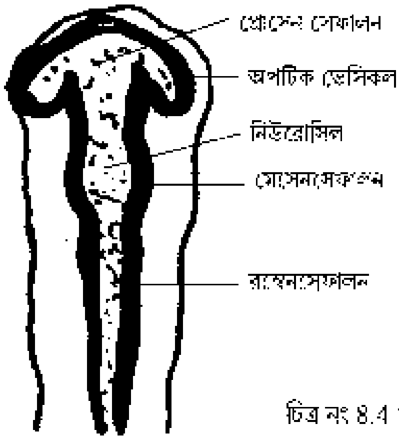

চিত্র নং ৪.৪ ঃ

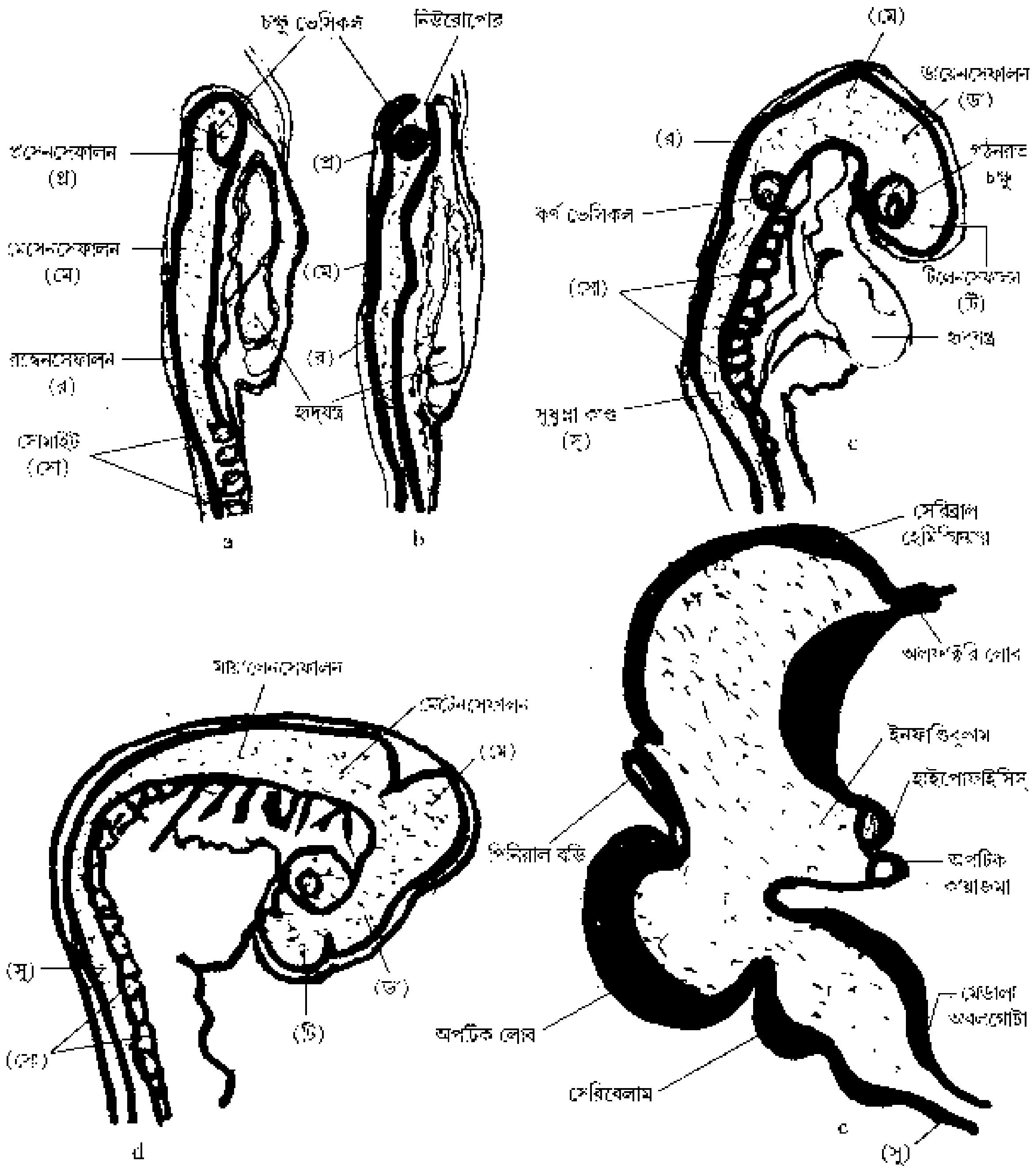
চক্ষু ভেসিকল
নিউরোপোর
প্রসেনসেফালন
(প্র)
মেসেনসেফালন
(মে)
রম্বেনসেফালন
(র)
সোমাইট
(সো)
(প্র)
(মে)
(র)
হৃদযন্ত্র
a
b
(মে)
ডায়েনসেফালন
(ডা)
(র)
গঠনরত
চক্ষু
কর্ণ ভেসিকল
টেলেনসেফালন
(টে)
(সো)
হৃদপিণ্ড
সুষুম্না কাণ্ড
(সু)
c
সেরিব্রাল
হেমিস্ফিয়ার
অলফ্যাক্টরি লোব
মায়েলেনসেফালন
মেটেনসেফালন
(মে)
ইনফান্ডিবুলাম
হাইপোফাইসিস
পিনিয়াল বডি
অপটিক
কায়াজমা
(সু)
(সো)
(ডা)
(টে)
অপটিক লোব
মেডালা
অবলংগাটা
সেরিবেলাম
d
e
(সু)

চিত্র নং ৪.5 ঃ

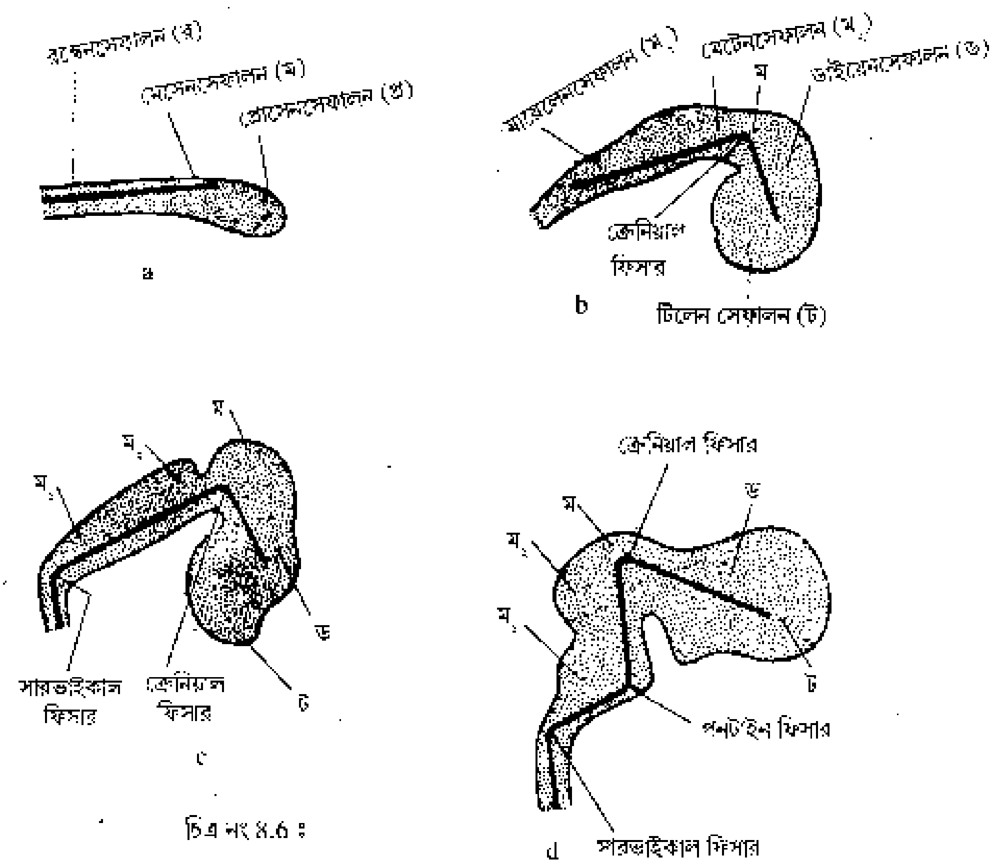

চিত্র নং ৪.6 ঃ

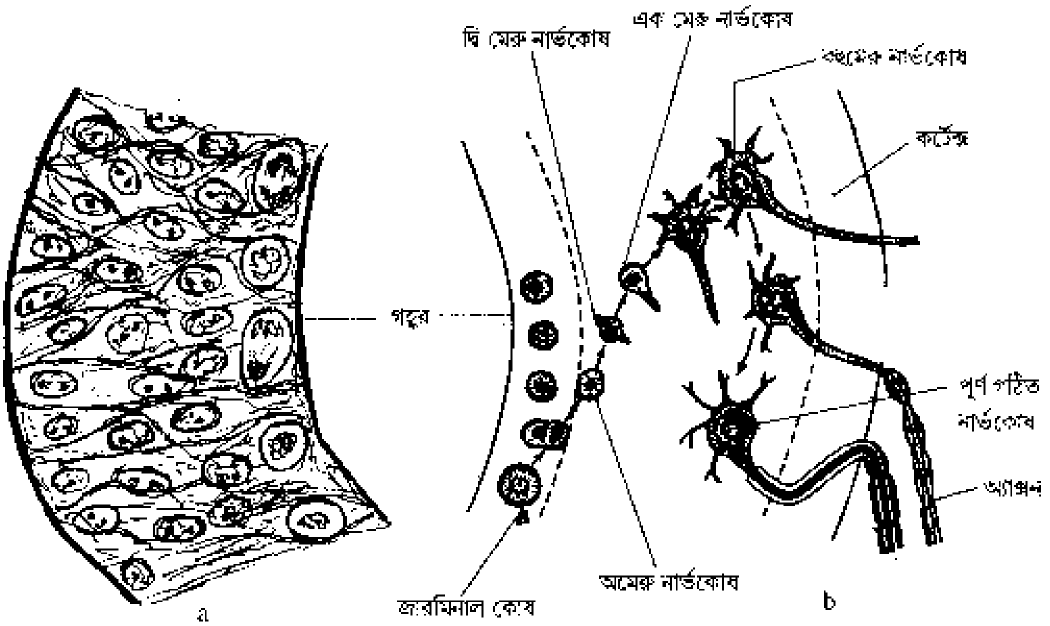

চিত্র নং ৪.7 ঃ

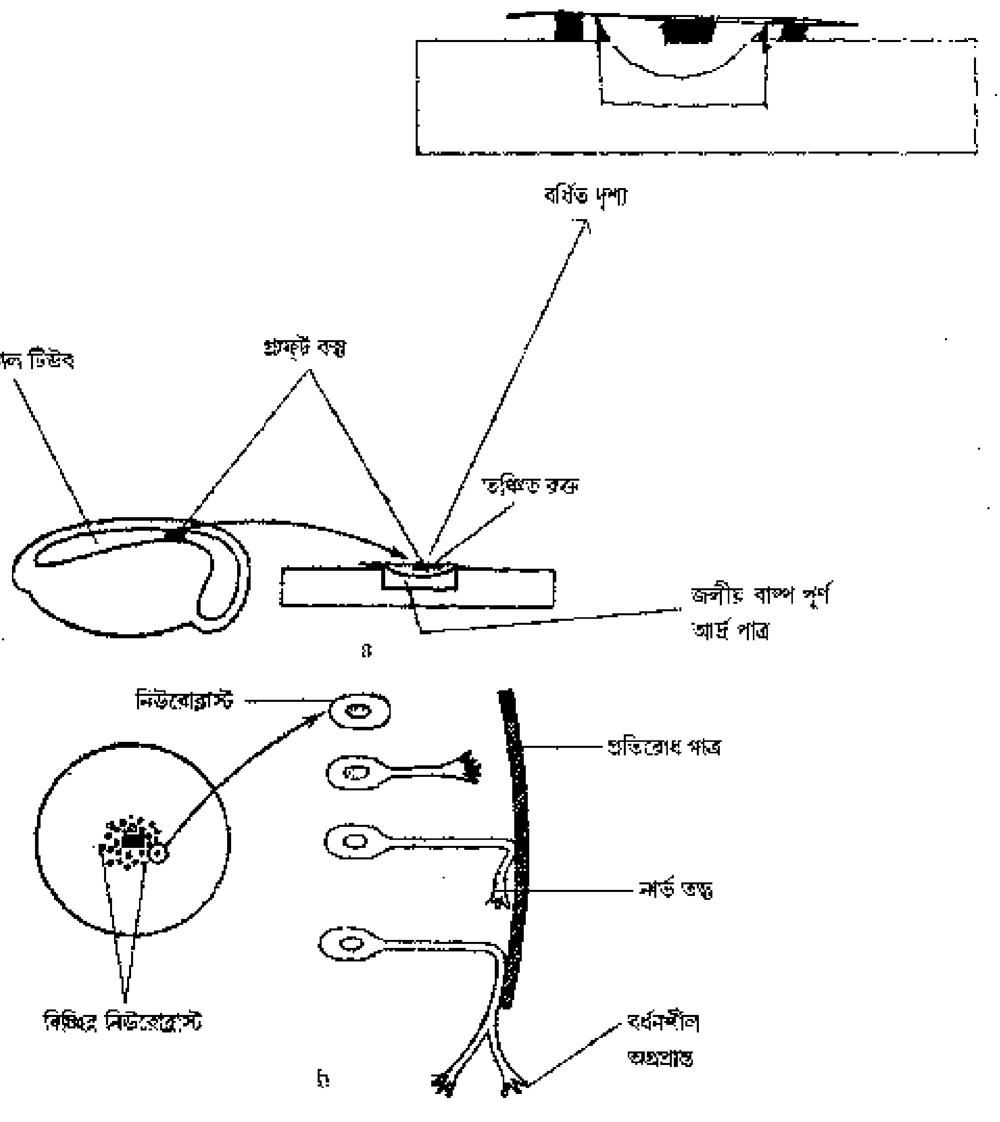
বর্ধিত দৃশ্য
নিউর‍্যাল টিউব
গ্রাফ্ট বস্তু
তঞ্চিত রক্ত
জলীয় বাষ্প পূর্ণ
আর্দ্র পাত্র
ক
নিউরোব্লাস্ট
প্রতিরোধ পাত্র
নার্ভ তন্তু
বিচ্ছিন্ন নিউরোব্লাস্ট
বর্ধনশীল
অগ্রপ্রান্ত
খ

চিত্র নং ৪.৪

একক 9 □ প্রাণী আচরণতত্ত্ব ঃ মুখবন্ধ

গঠন

9.1	প্রস্তাবনা
	উদ্দেশ্য
9.2	আচরণতত্ত্বের মুখবন্ধ
9.3	আচরণগত বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি
9.4	সহজাত আচরণ ও শিক্ষিত আচরণ
9.5	জিন, পরিবেশ ও আচরণতত্ত্ব
9.6	সারাংশ
9.7	প্রশ্নাবলী
9.8	উত্তরমালা

9.1 প্রস্তাবনা

অস্তিত্ব রক্ষার তাগিদেই মানুষ আদিম অবস্থা থেকেই পারিপার্শ্বিক প্রাণীদের আচার-আচরণ সম্পর্কে স্বাভাবিক ভাবেই আগ্রহী। শিকারের জন্য গুহাবাসী মানব বিভিন্ন প্রাণীর আচার-আচরণের গতি প্রকৃতি চিত্রিত করে রাখতো গুহাগাত্রে। এইভাবে উত্তর পুরুষের কাছে পৌছে দেওয়া হতো শিকার বিদ্যার সূত্রগুলি। শুধু শিকার সংগ্রহ নয়, নিজেকে জীব-জন্তুর হাত থেকে রক্ষার প্রয়োজনে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে অনুসন্ধান করতে হয়েছে শত্রুর আচার-ব্যবহার। বৈজ্ঞানিক আচরণতত্ত্বের (Ehtology) জন্মদাতা হিসাবে বিশেষভাবে কোন ব্যক্তিকে চিহ্নিত করা অসম্ভব তবে অভিব্যক্তিবাদ, বংশগতি বিদ্যা, পরিস্ফূরণ তত্ত্ব বাস্তব্যবিদ্যা (Ecology) এবং শারীরবিদ্যার মিলিত জ্ঞান ভাণ্ডারই আচরণতত্ত্বের চালিকা শক্তি। জ্ঞানের দ্রুত অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে আচরণ তত্ত্বের বর্তমান কলেবর যথেষ্টই বড় - তা সত্ত্বেও এই বিষয়ের অনেক কিছুই এখনও অজানা।

প্রকৃতি এবং প্রাণীজগতের আচার আচরণের পারস্পরিক সম্বন্ধের ক্ষেত্রে 'Ethology' কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ফরাসী প্রাণীবিদ Geoffroy Saint Hilaire (1805-61)। গ্রীক শব্দ ethos (বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা চরিত্র) এবং logo (অধ্যয়ন) এই দুটি শব্দের মিলিত রূপ হল ethology।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি

- প্রাণীদের আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগুলি বিবৃত করতে পারবেন।
- আচারণগত বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- প্রাণীদের আচরণে জিন ও পরিবেশের প্রভাব যুক্তিদ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে পারবেন।

9.2 আচরণতত্ত্বের মুখবন্ধ

অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য প্রাণীদের মধ্যে কতগুলি গুরুত্বপূর্ণ আচার আচরণ লক্ষ্য করা যায়। এই ধরণের আচার-আচরণগুলি যেমন একই প্রজাতির প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায় (যেমন-প্রজনন ঘটিত আচরণ, জনিতৃযত্ন, দলগত যোগাযোগ, খাদ্য গ্রহণ সংক্রান্ত আচরণ, বাসস্থান নির্মাণ ও নির্বাচন সংক্রান্ত আচরণ) — আবার বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে সম্পর্কের ফলস্বরূপও হতে পারে (যেমন - খাদ্য-খাদক সম্পর্ক, পরজীবি-পোষক সম্পর্ক ইত্যাদি), অথবা পরিবেশের অজৈব উপাদানের সঙ্গে সম্পর্কিতও হতে পারে (যেমন - তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতাজনিত আচরণ)।

আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগুলিকে মূলতঃ দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে- *Ultimate factors* বা মৌল উপাদান যেমন - বংশগতি, পরিস্ফুরণ এবং শারীরবৃত্তীয় উপাদান; এবং *Proximate factors* বা ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত উপাদান যা কিনা মূলতঃ পরিমণ্ডলগত উপাদান - যেমন প্রাণীর পরিবেশের তাপমাত্রা, আর্দ্রতা, ঋতুচক্রের পরিবর্তন, খাদ্য, খাদক, পরজীবী ইত্যাদি।

পাখির খাদ্যগ্রহণ সংক্রান্ত আচরণতত্ত্ব সাধারণভাবে বিশ্লেষণ করলে সমগ্র বিষয়টি আপনাদের কাছে পরিষ্কার হবে। চঞ্চুর আকার-আকৃতি, পৌষ্টিক তন্ত্রের গঠন ও পাচন পদ্ধতি প্রভৃতি বংশগত এবং শারীরবৃত্তিয় বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন পাখির আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রিত করে তেমনই একইভাবে প্রজনন ঋতুর আগমনের আগে পর্যাপ্ত খাদ্যের সন্ধানে অনুকূল পরিবেশে পরিযানও (Migration) খাদ্যগ্রহণ সংক্রান্ত আচরণতত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত (চিত্র -1)। প্রজনন ঋতুর আগমনের আগে পরিযানের ঘটনাটি প্রজনন নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন, দিবালোকের স্থায়িত্বের তারতম্য এবং তাপমাত্রা ইত্যাদি উপাদানের দ্বারা প্রভাবিত হয়।

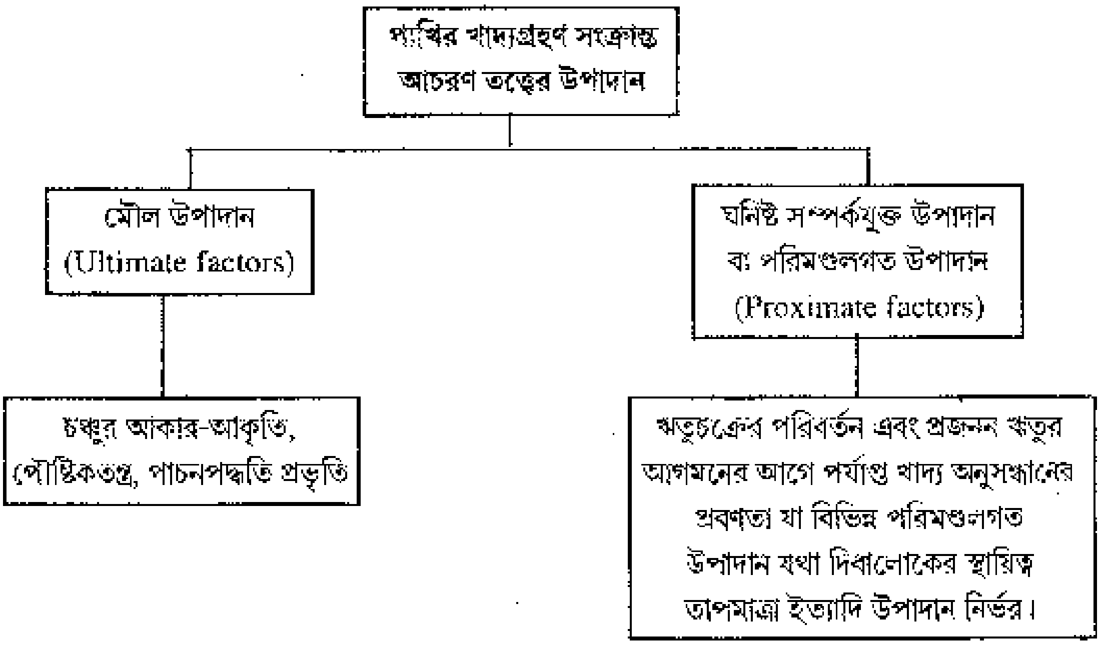

চিত্র -1 ঃ পাখির খাদ্যগ্রহণ সংক্রান্ত আচার আচরণের উপাদান।

9.3 আচরণগত বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের বিজ্ঞানসম্মত পদ্ধতি ঃ

সাধারণভাবে আমরা কোন নির্দিষ্ট পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন উদ্দীপনার (stimuli) সাপেক্ষে কোন প্রাণী বা প্রাণীগোষ্ঠীর কার্যকলাপের বহিঃপ্রকাশকে সেই প্রাণীর অথবা প্রাণীগোষ্ঠীর আচরণ বলে চিহ্নিত করে থাকি।

প্রাণীদের আচরণ বেশ কিছু জটিল প্রক্রিয়ার সম্মিলিত রূপ, সে কারণেই তাদের আচরণের অনুসন্ধান ও বিজ্ঞান সম্মত বিশ্লেষণও অত্যন্ত কঠিন, প্রাণীদের আচরণতত্ত্বগত বিভিন্নদিক সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করার জন্য প্রধানত তিনটি পদ্ধতি বা উপায় অবলম্বন করা হয় যথা জীবনধারণ পদ্ধতির অণুসরণ (Vitalistic approach), যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ (Mechanistic approach) এবং প্রাণীদের আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞানের সার্বিক প্রয়োগ (Ethological approach।

জীবনধারণ পদ্ধতির অণুসরণ (Vitalistic approach) ঃ — কোন পরিবেশে প্রাণীদের মধ্যে যে আচরণগত বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় অথবা পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নেবার জন্যে প্রাণীদের মধ্যে যে ধরণের আচরণগত কার্যকলাপ পরিলক্ষিত হয় সেই সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করা এবং তার বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ করা এই পদ্ধতির অন্তর্গত, এই ধরণের পদ্ধতিতে পরিবেশের মধ্যে প্রাণীদের আচরণগত কার্যকলাপ ছাড়া অন্য কিছুই গ্রহণ করা হয় না।

যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ (Mechanistic approach) ঃ — এক্ষেত্রে বীক্ষণাগারে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রাণীদের কোন নির্দিষ্ট আচরণগত বৈশিষ্ট্যের পর্যবেক্ষণ করা হয় এবং পর্যবেক্ষণ লব্ধ ফলাফলের বিশ্লেষণ করা হয়। যেহেতু একটি কৃত্রিম পরিবেশে বিষয়টি অনুসন্ধান করা হয় তাই অনেকেই এই নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে প্রাণীদের আচরণকে স্বাভাবিক আচরণ বলে মনে করেন না। তবে বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পাভলভ (Pavlov) তাঁর শর্তাধীন প্রতিবর্ত ক্রিয়া (conditioned reflex) সংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে এই ধরণের পদ্ধতিই অনুসরণ করেছিলেন।

প্রাণীদের আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞানের সার্বিক প্রয়োগ (Ethological approach) ঃ — এই পদ্ধতিটিকে আগের দুটি পদ্ধতির সমন্বিত রূপ বলা যেতে পারে। বর্তমানে এই ধরণের পদ্ধতিই আচরণতত্ত্ব সংক্রান্ত গবেষণায় অনুসরণ করা হয়। প্রকৃতিতে অথবা বীক্ষণাগারে বিভিন্ন ধরণের উদ্দীপনার (stimuli) প্রতিক্রিয়ায় প্রাণীদের মধ্যে যে আচরণগত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় এই পদ্ধতিতে সেগুলোর বিজ্ঞানসম্মত ব্যাখ্যা দেওয়া হয়। বিজ্ঞানী লোরেনজ (Lorenz), টিনবারজেন (Tinbergen) প্রভৃতি এই পদ্ধতির প্রবর্তক আধুনিক যুগে বিভিন্ন ধরণের দৃশ্য-শ্রাব্য প্রযুক্তির (audio-visual technology) সাহায্যে প্রাণীদের আচরণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহের কাজ অনেক সহজ হয়েছে। অবলোহিত ফটোগ্রাফীর (infra -red photography) সাহায্যে যেমন রাত্রিকালীন প্রাণীদের আচরণের চিত্রগ্রহণ সম্ভবপর হয়েছে তেমনই ধীরগতি চলচ্চিত্র গ্রহণ পদ্ধতির (slow motion picturisation) সাহায্যে প্রাণীদের ধীরগতি সম্পন্ন কাজের (যেমন পতঙ্গ প্রভৃতি প্রাণীদের খোলস ত্যাগ ইত্যাদি) চিত্রায়ন করা ও সম্ভব হচ্ছে। অতিক্ষুদ্র টেপ রেকর্ডার, কম্পুটারের ব্যবহার, সংকেত (signal) গ্রহণের ক্ষমতা সম্পন্ন অতি আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রয়োগের ফলে প্রাণীদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধান এখন অনেকটা সঠিকভাবে করা সম্ভব হচ্ছে।

9.4 সহজাত বা জন্মগত আচরণ (Innate behaviour) এবং শিক্ষিত আচরণ (Learned behaviour)

প্রাণীদের মধ্যে সাধারণত দু'ধরণের আচরণ লক্ষ করা যায় — সহজাত বা জন্মগত আচরণ (Innate behaviour) ও শিক্ষিত আচরণ (Learned behaviour)।

সহজাত বা জন্মগত আচরণ (Innate behaviour) : — এক্ষেত্রে প্রাণীদের আচরণ পূর্ব নির্দ্ধারিত (Predetermined) হয়ে থাকে এবং কোন নির্দ্দিষ্ট উদ্দীপনার কারণে সকল সময়ে একই ধরণের প্রতিক্রিয়া লক্ষিত হয়ে এই ধরণের আচরণের মধ্যে যেমন সাধারণ বা শর্তহীন প্রতিবর্ত ক্রিয়া জাত আচরণ (Unconditional reflex action) তেমনি জৈব কালচক্র নিয়ন্ত্রিত আচরণ (Biological clock), দৈনিক জৈব কালচক্র নিয়ন্ত্রিত আচরণ, পূর্বরাগ, মিলন, জনিতৃযত্নের মত পরার্থমূলক আচরণ (Altruistic behaviour), নানা ধরণের সামাজিক আচরণ (social behaviour) এবং আগ্রাসন (Aggressive behaviour) অন্তর্ভুক্ত।

শিক্ষিত আচরণ (Learned behaviour) : — অতীত অভিজ্ঞতা লব্ধ প্রাণীদের আচরণকে শিক্ষিত আচরণ বলা হয়। এসব আচরণের ক্ষেত্রে স্মৃতি (memory) চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে। প্রাণীদের মস্তিষ্ককেই স্মৃতির ভাণ্ডার হিসেবে গণ্য করা হয়। তাই মস্তিষ্কের গঠন এবং তার জটিলতার ওপরে অনেকটাই নির্ভর করে শিক্ষিত আচরণের বৈশিষ্ট্য। শিক্ষিত আচরণের আবার বিভিন্ন ভাগ আছে যেমন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পাভলভ পরীক্ষিত শর্তসাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াজনিত আচরণ (conditioned relfex), মনে ছাপ ফেলা (Imprinting), বাস্তব পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে সফল হওয়ার প্রয়াস ও ত্রুটি সংশোধনজনিত অভিজ্ঞতা ভিত্তিক আচরণ প্রভৃতি। এ সম্বন্ধে আপনারা পরের এককে বিস্তারিত জানতে পারবেন।

9.5 জিন (Gene), পরিবেশ ও আচরণতত্ত্ব

পূর্বের আলোচনা থেকে আপনারা জেনেছেন যে প্রাণীদের আচরণ জিন এবং পরিবেশের প্রভাবে এই দুই বিষয়ের উপরেই নির্ভরশীল। শুধুমাত্র জিনই প্রাণীদের আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে না। প্রাণীদের পরিস্ফুরণের সময় এবং পূর্ণাঙ্গ প্রাণীতে জিন ও পরিবেশের দ্বারা কিভাবে আচার আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় 2 নং চিত্রে তা দেখানো হল।

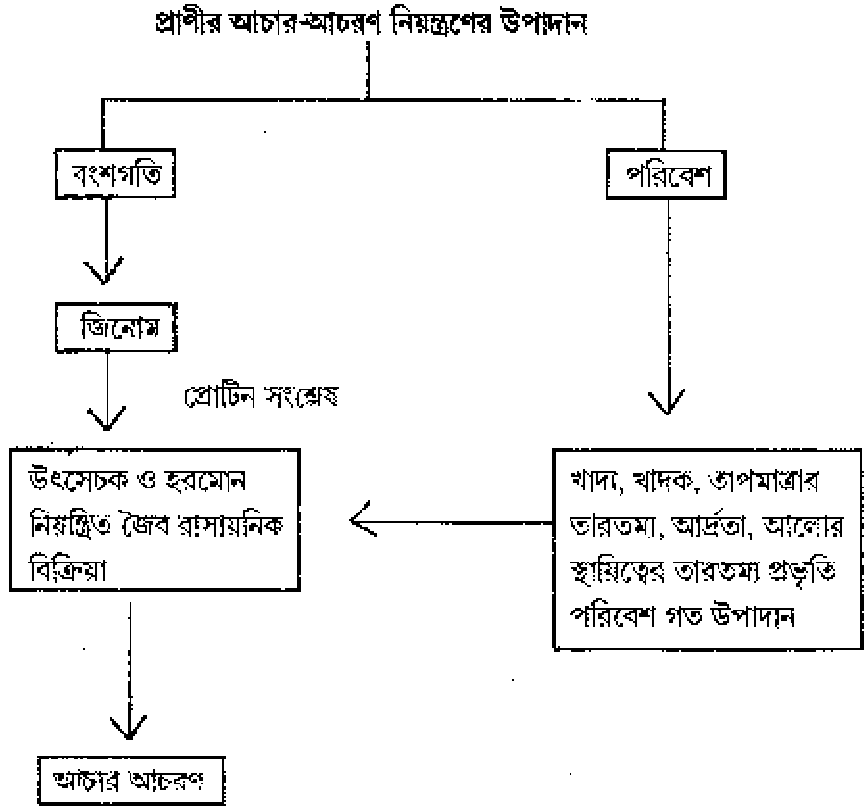

চিত্র -2 : প্রাণীর পরিস্ফূরণ ও পূর্ণদশায় জিন ও পরিবেশ দ্বারা আচার-আচরণের নিয়ন্ত্রণ।

উপরের চিত্র থেকে আপনার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে বংশগতির আচার-আচরণের নিয়ন্ত্রণের মূলে রয়েছে জিন (gene) বা আরো পরিষ্কার করে বললে বলা যায় জিনোম (Genome) - অর্থাৎ হ্যাপ্লয়েড সেট ক্রোমোজমের মোট জিন সমষ্টি। জিন নিয়ন্ত্রিত প্রোটিন সংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় প্রোটিন তৈরী হয়। বিভিন্ন উৎসেচক বা এনজাইমের উপাদান হিসাবে কাজ করে এই প্রোটিন। এ ছাড়া বিভিন্ন হরমোনেরও উপাদান হিসাবে কাজ করে এরা। পরিস্ফুরণ থেকে শুরু করে পূর্ণাঙ্গ প্রাণীর বিভিন্ন শারীরবৃত্তিয় প্রক্রিয়া এবং আচার-আচরণ যেমন খাদ্যগ্রহণ সংক্রান্ত আচরণ প্রজনন এবং প্রজনন ঘটিত আচরণ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রিত হয় বিভিন্ন উৎসেচক (enzyme) এবং হরমোনের (Hormone) দ্বারা। আচার-আচরণের ক্ষেত্রে পরিবেশগত উপাদান বলতে আমরা মূলতঃ জৈব (খাদ্য, খাদক ইত্যাদি) এবং অজৈব (তাপ, আলো, আর্দ্রতা ইত্যাদি) উপাদানকে বুঝি। এইসব উপাদানগুলি প্রাণীর শারীরবৃত্তীয় বিভিন্ন ক্রিয়া বিক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং প্রাণীদের বিভিন্ন প্রকারের আচার-আচরণের নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়। পাখিদের পরিযান (Migration) এইরকম একটি পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত আচরণ।

জিন এবং পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আচার আচরণের অভিব্যক্তি 'এপিজেনেসিস' (Epigenesis) বলা হয়। পরিবেশের বিভিন্নতার জন্যে একই প্রজাতির বিভিন্ন প্রাণীর আচার-আচরণের মধ্যে বৈচিত্র থাকা স্বাভাবিক। তবে এসব ক্ষেত্রে প্রাণীদের বিস্তৃতি এবং পরিবেশগত উপাদানগুলির মধ্যে প্রভেদ থাকে।

এই এককের সমস্ত আলোচনা থেকে আচরণতত্ত্বের মূল বিষয়টিকে আমরা সংক্ষেপে এইভাবে বলতে পারি যে **জিন ও পরিবেশগত উপাদান দ্বারা নিয়ন্ত্রিত প্রাণীর অস্তিত্ব নির্ণায়ক সমস্ত আচার আচরণের জ্ঞানই আচরণতত্ত্ব।**

9.6 সারাংশ

অভিব্যক্তিবাদ বংশগতি বিদ্যা, শারীর বিদ্যা, বাস্তববিদ্যা প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় প্রাণীদের আচরণতত্ত্বের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। মূলতঃ কয়েকটি মৌল উপাদান এবং কয়েকটি পরিমণ্ডলগত উপাদানকে প্রাণীদের আচার আচরণের নিয়ন্ত্রণকারী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। পরিবেশ থেকে উদ্ভূত বিভিন্ন উদ্দীপনার সাপেক্ষে কোন প্রাণী বা প্রাণীগোষ্ঠীর মধ্যে যেসব নানা ধরণের কার্যকলাপের বহিঃপ্রকাশ ঘটে থাকে তাকেই আমরা এককথায় আচরণ বলে থাকি। তবে প্রাণীদের আচার-আচরণের বিজ্ঞানসম্মত অনুসন্ধান এবং বিশ্লেষণ একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া। এসব ক্ষেত্রে প্রধানতঃ তিন ধরণের পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়ে থাকে যথা (ক) জীবন ধারণ পদ্ধতি অনুসরণ (খ) যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ (গ) আচরণ সংক্রান্ত বিজ্ঞানের সার্বিক প্রয়োগ।

সাধারণভাবে দু'ধরণের আচরণ প্রাণীদের মধ্যে লক্ষ করা যায় - সহজাত বা জন্মগত আচরণ (Innate behaviour) ও শিক্ষিত আচরণ (Learned behaviour)।

প্রাণীদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে জিন (Gene) ও পরিবেশই (Environment) প্রধান ভূমিকা পালন করে। পরিস্ফুরণ থেকে আরম্ভ করে পূর্ণাঙ্গ প্রাণী পর্যন্ত বিভিন্ন শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়া ও আচরণ নিয়ন্ত্রিত হয় বিভিন্ন উৎসেচক (Enzyme) ও উদ্দীপকের (Hormone) দ্বারা। জিন নিয়ন্ত্রিত প্রোটিন সংশ্লেষ প্রক্রিয়ার সাহায্যেই এইসব উৎসেচক বা উদ্দীপক উৎপন্ন হয়।

9.7 প্রশ্নাবলী

1. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

a) প্রাণীদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণকারী উপাদানগুলি কি কি?

b) জিন ও পরিবেশ প্রাণীদের আচরণের উপর কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তা সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

c) সহজাত আচরণ বলতে কি বোঝায়?

d) আচরণতত্ত্ব (Ethology) কথাটির অর্থ ব্যাখ্যা করুন।

2. শূন্যস্থান পূরণ করুন :

a) জিন ও পরিবেশ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত আচার-আচরণের অভিব্যক্তিকে বলা হয় ______________।

b) ______________ ফটোগ্রাফীর সাহায্যে রাত্রিকালীন প্রাণীদের আচরণের চিত্রগ্রহণ সম্ভব হয়েছে।

c) সহজাত আচরণের ক্ষেত্রে প্রাণীদের আচরণ ______________ হয়ে থাকে।

d) শর্তসাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়াজনিত আচরণ নিয়ে বৈজ্ঞানিক _______________ পরীক্ষা করেন।

e) গ্রীক শব্দ _______________ এবং _______________ এই দুইটি শব্দের মিলিত রূপ হল Ethology।

3. **তুলনা করুন ঃ**

a) মৌল উপাদান (Ultimate factor) ও ঘনিষ্ঠ সম্পর্কযুক্ত উপাদান (Proximate factor)।

b) সহজাত আচরণ (Innate behaviour) ও শিক্ষিত আচরণ (Learned behaviour)।

c) জীবন ধারন-পদ্ধতি অনুসরণ (Vitalistic approach) ও যান্ত্রিক পদ্ধতির প্রয়োগ (Mechanistic approach)।

4. **দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ**

a) প্রাণীদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য অনুসন্ধানের বিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিগুলি বিবৃত করুন।

b) 'এপিজেনেসিস' কথাটির অর্থ কি? "শুধুমাত্র জিনই প্রাণীদের আচার-আচরণ নিয়ন্ত্রণ করে না" — উদ্ধৃতিটির ব্যাখ্যা করুন।

9.8 উত্তরমালা

প্রশ্নাবলী - 1

a) — 9.2

b) — 9.5

c) — 9.4

d) — 9.1

প্রশ্নাবলী- 2

a) — এপিজেনেসিস

b) — অবলোহিত

c) — পূর্বনির্দ্ধারিত

d) — পাভলভ

e) — ethos-logos

প্রশ্নাবলী - 3

a) — 9.2

b) — 9.4

c) — 9.3

প্রশ্নাবলী - 4

a) — 9.3

b) — 9.5

একক 10 □ স্বতঃপ্রবৃত্ত আচরণ ও শিক্ষিত আচরণ

গঠন

10.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

10.2 স্বতঃপ্রবৃত্ত আচরণ

10.2.1 স্বতঃপ্রবৃত্ত আচরণের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ শারীরিক অবস্থার প্রভাব

10.3 শিক্ষিত আচরণ

10.3.1 মনে ছাপ ফেলা

10.3.2 অভ্যস্তকরণ

10.3.3 শর্তসাপেক্ষ আচরণ

10.3.4 উপায় বা যন্ত্র প্রভাবিত আচরণ

10.3.5 বিচার ও ভ্রান্তির মাধ্যমে শিক্ষা

10.4 শিক্ষা ও স্মৃতি

10.5 সারাংশ

10.6 প্রশ্নাবলী

10.7 উত্তরমালা

10.1 প্রস্তাবনা

প্রাণীকুলের প্রায় সবধরনের আচরণ (behaviour)-এর মূলে আছে এক বা একাধিক উদ্দীপক (stimulus)-এর প্রভাব। উদ্দীপক কি? যে কোনও আনুষঙ্গিক ঘটনা যা প্রাণীর অনুভূতি গ্রাহক বা স্নায়ুতন্ত্রে পরিবর্তন আনে, তাকেই সাধারণভাবে আমরা উদ্দীপক বলতে পারি। আর ইন্দ্রিয়স্থান (sense organ) হ'ল এমন এক শারীরিক অঙ্গ বা যন্ত্র যা তার উপর পতিত বা আগত কোনও শক্তির (যেমন আলো, তাপ বা চাপ ইত্যাদি) অস্তিত্ব বা ঘনত্ব পরিমাপ করতে পারে।

উদ্দীপক মূলত স্নায়ুতন্ত্রের উপরই কাজ করে; ফলে উদ্দীপক-সৃষ্ট যে **উদ্দীপনা** (stimulation) আমরা প্রত্যক্ষ করি তা অবশ্যই **স্নায়ুতন্ত্রের দ্বারাই উজ্জীবিত**। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক। শব্দ বা আওয়াজ শুনলে ইঁদুর সাধারণত কোনও আবরণ বা আড়াল খোঁজে, যাতে সে লুকোতে পারে। এবং সেই লুকোবার জায়গায় পৌঁছুতে সে সবসময়ই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বা যত কম পথ অতিক্রম করতে হয় – তার চেষ্টাই করবে। জায়গাটি আগের থেকে পরিচিত হলে তার সুবিধে বেশি। কেননা, তা হলে তাকে কম পথ ছুটোছুটি করতে হবে; জায়গাটি অচেনা হলে তাকে অনেক বেশি সময় বা অনেক বেশি পথ ছোটাছুটি করতে হবে। উভয় ক্ষেত্রেই তার আচরণকে প্রভাবিত করছে তার স্নায়ুতন্ত্র - অবস্থার প্রভেদে যার কার্যক্রম হয়তো কিছুটা আলাদা হয়। প্রথমক্ষেত্রে ইঁদুর কোন পথে তার গন্তব্য - তা আগে থেকেই জেনে গিয়েছে বা 'শিখে' নিয়েছে, আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে তা এখনও হয়ে ওঠে

নি; কিন্তু একটি বিশেষ অবস্থা বা উদ্দীপনার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে দুটি আচরণই তাকে সাহায্য করবে। এই অবস্থাটি, ক্ষেত্র বিশেষে তার শত্রুর হাত থেকে বাঁচার জন্য বা তার ক্ষুধার্ত বাচ্চাদের ডাক শুনে তাদের কাছে পৌঁছানোর জন্য- যে কোনও কারণেই বা অবস্থার চাপেই হতে পারে। এটা একধরণের **শারীরবৃত্তীয় অভিযোজন** (Physiological adaptation)। শারীরবৃত্তীয় অভিযোজনের ফলে কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রে (central nervous system) যে উপায়ে বা যে ধরনের পরিবর্তন ঘটে, তা বেশ জটিল। বিশেষ অর্থে তাকে আমরা **শিক্ষা** বা **পরিশীলন** (Learning) বলতে পারি। এই বিশেষ অর্থে শিক্ষা এক আভ্যন্তরীণ প্রক্রিয়া (internal process) যার বহিঃপ্রকাশ ঘটে অভিযোজন সম্পর্কিত পরিবর্তনের মাধ্যমে এবং তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই **'অভিজ্ঞতা'** লব্ধ - বিশেষ করে উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে। প্রাণীকুলের আচরণকে আমরা মূল দুভাগে ভাগ করতে পারি ঃ

এক) **প্রবৃত্তি** বা **স্বতঃপ্রবৃত্ত** (instinct)-এবং দুই) **আহৃত** বা শিক্ষিত (learned) আচরণ।

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠ করে আপনি

- প্রাণীকুলের আচরণে উদ্দীপকের ভূমিকা সম্যকভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।
- স্বতপ্রবৃত্ত ও শিক্ষিত আচরণের মধ্যে প্রভেদ বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- শিক্ষার সঙ্গে স্মৃতির যোগ এবং এক্ষেত্রে স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা বিষয়ে আলোচনা করতে পারবেন।

10.2 স্বতঃপ্রবৃত্ত আচরণ

নিম্নস্তরের প্রাণীদের মধ্যে স্বতঃপ্রবৃত্ত আচরণই বেশি লক্ষ্য করা যায়, যদিও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে আহৃত বা পরিশীলিত আচরণেও তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠতে পারে, এমন নজির অবশ্যই আছে। উচ্চতর প্রাণীদের বেশিরভাগ আচরণই অভিজ্ঞতা এবং ফলিত পরিশীলনের দ্বারাই প্রভাবিত। যেহেতু **শিক্ষা বা অভিজ্ঞতায় পারঙ্গম হয়ে ওঠার সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের যোগ খুব নিবিড়**, যে যে প্রাণীর স্নায়ুতন্ত্র যত উন্নত (মানুষ, বানর ইত্যাদি) তার তার ক্ষেত্রে এই ধরনের আচরণের প্রবণতা বা রকমফেরও অনেক বেশি।

একসময় মনে করা হত স্বতঃপ্রবৃত্ত আচরণ তথাকথিত শিক্ষার মাধ্যমে আহৃত নয়, একটি নির্দিষ্ট প্রজাতিতেই তা সীমাবদ্ধ এবং এই আচরণ দ্বারা প্রাণীটি অবশ্যই অভিযোজনের কোনও সুবিধা পায়। উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে এই ধারণাগুলো প্রমাণ করা দুরূহ। কেননা ছোটবেলা থেকেই সে আশে পাশে যা দেখছে তা থেকে সে শিখছে, অর্থাৎ অভিজ্ঞ হচ্ছে। যেমন, বিড়াল সবসময়ই কিন্তু ইঁদুর মারে না - যদিও আমরা বলি ইঁদুর মারা বা শিকার করা বিড়ালের স্বভাব। বাচ্চা বিড়াল তার মা বা অন্য বিড়ালকে ইঁদুর মারতে দেখলেই ক্রমশ তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠে। বাচ্চা বিড়ালকে যদি প্রথম থেকেই ইঁদুরের সঙ্গে বেড়ে ওঠার সুযোগ দেওয়া হয়, তাহলে হয়তো সে একেবারেই ইঁদুর মারবে না। শিমলিপাল জঙ্গলের খৈরীর কথা নিশ্চয়ই আপনাদের মনে আছে? বাচ্চা অবস্থা থেকেই মানুষের সাহচর্যে বেড়ে ওঠার সুযোগ পেয়েছিল বলে সে সেই পরিবেশেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। তেমনি গায়ক পাখীদের বাচ্চাকে যদি খুব ছোটবেলা থেকে মা-বাবার কাছ থেকে আলাদা করে রাখা হয়, বড় হয়ে সে যে গান গায় - তা অনেক সরল বা সাধারণ ধরনের গান। গায়ক পাখীর সঙ্গে আগাগোড়া থাকলেই সে তাদের মত জটিল গান

গাইতে পারে। **চ্যাফিন্‌জ** (Chaffinch) পাখীর উপর এ বিষয়ে অনেক কাজ হয়েছে (চিত্র - 10.1)। এ সব তথ্য জানা ছিল না বলে স্বতঃপ্রবৃত্ত আচরণের অনেক ভুলব্যাখ্যা আছে। এই ভুলব্যাখ্যা থেকে নানারকমের ভুল ধারনারও সৃষ্টি হয়; যেমন একসময় মনে করা হতো যে মানুষের কোনও একটি জনজাতি যুদ্ধবাজ বা চুরিপ্রবণ। এই ধরনের অপব্যাখ্যা বা ধারনার অসারতা প্রমাণ করতে ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্রের অনেক ব্যবহারবিদ বহু প্রাণীর আচরণ দীর্ঘদিন ধরে অনুশীলন করেছেন বা তা নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। এদের মধ্যে **ফন ফ্রিস** (K. von Frisch), **লোরেঞ্জ** (K. G. Lorenz), **টিনবার্জেন** (N. Tinbergen) **মরগ্যান** (C. T. Morgan), **স্কট** (J. P. Scott) প্রভৃতির কাজ খুবই উল্লেখযোগ্য। ইউরোপীয় ও যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবহারবিদদের কাজের ধারা ও আদর্শ (model) পৃথক ছিল। প্রথমোক্তরা মূলত নিসর্গবাদী (naturalist) এবং তাঁরা মাছ বা মৌমাছিদের ব্যবহার অনুশীলন করেছেন এবং তা অনেকটাই প্রাকৃতিক পরিবেশে। অন্যরা মূলত মনোবিদ বা শারীরতত্ত্ববিদ এবং তারা বানর বা কিছু ক্ষেত্রে মানুষের ব্যবহার পরীক্ষামূলকভাবে (অর্থাৎ অনেক সময় কৃত্রিম পরিবেশে) পর্যবেক্ষণ বা অনুশীলন করেছেন। কার্যপদ্ধতি বা আদর্শ আলাদা হলেও এদের গবেষণার ফল বা তা থেকে উদ্ভূত ধারণা বা সূত্রের মধ্যে যথেষ্টই মিল আছে।

10.2.1 স্বতঃপ্রবৃত্ত আচরণের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ শারীরিক অবস্থার প্রভাব

আমরা যাকে **স্বতঃপ্রবৃত্ত আচরণ** বলি, তা বহুক্ষেত্রেই **প্রাণীর অভ্যন্তরীণ শারীরিক অবস্থার উপর নির্ভর করে**। যেমন, যৌন আচরণ মূলত বিশেষ হরমোনের অতিরিক্ত ক্ষরণ বা মাত্রার উপরই নির্ভরশীল। তা এতটাই যে, অনেক সময় অত্যন্ত জোরালো উদ্দীপক বা উদ্দীপনার কারণ থাকলেও যৌন হরমোন ক্ষরণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বিশেষ শারীরিক অবস্থার কারণে তা কার্যকর হয় না : এসস্ট্রাস (oestrus) অবস্থায় সিংহী না থাকলে, সিংহের শত যৌন আচরণেও সে সাড়া দেয় না। উদ্দীপক স্বতঃপ্রবৃত্ত আচরণের সূচনা করলেও, তাকে চালনা (guide) বা নিয়ন্ত্রণ সে পুরোপুরি নাও করতে পারে। ডিমে তা দিতে বসে থাকা ধূসর রাজহংসী (Grey Goose) বা হেরিং গাল বাসার বাইরে ডিম সরে গেলে চঞ্চুর সাহায্যে তাকে উদ্ধার করবার জন্য চেষ্টা করে (এ তার স্বতঃপ্রবৃত্ত ব্যবহার); ডিম বাসা থেকে অনেক দূরে সরে বা পড়ে গেলেও সে ঐ তা' দিতে থাকা অবস্থাতেও ক্রমাগত চঞ্চু সঞ্চালন করবে। যদিও অদৃশ্য বা অবসৃত ডিমটিকে সে উদ্ধার করতে পারে। (চিত্র - 10.2)।

উদ্দীপনা বা অভ্যন্তরীণ শারীরিক ক্রিয়ার (যেমন হরমোনের ক্ষরণ) ফলে যে স্বতঃআচরণ আমরা লক্ষ্য করি তা স্নায়ুতন্ত্রের বিভিন্ন উচ্চতর ধাপের সঙ্গে ক্রমান্বয়ে যুক্ত (hierarchy) । বস্তুতঃ আচরণের এক একটি ধাপ স্নায়ুতন্ত্রের বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া বা প্রভাবের সঙ্গে যুক্ত। উদাহরণস্বরূপ **পুরুষ তিন কাঁটা স্টিকেলব্যাক** (Three spined stickle back) মাছের যৌন ও জননবৃত্তীয় আচরণের উল্লেখ করা যায়। এই আচরণ অনেকগুলি পরপর ঘটনার সমন্বয়, যেমন : (1) **পরিযান বা স্থানান্তর গমন** (migration), (2) **আঞ্চলিক অভেদ্যতা বা স্থান নির্বাচন** (territoriality) (3) তার জন্য লড়াই (fighting) (4) **বাসা বানানো** (Nest building) (5) রতিক্রিয়া (mating) এবং (6) **পিতার কর্তব্য পালন** (parental instinct act)। স্থানান্তর গমন নির্ভর করে স্নায়ুতন্ত্রের সর্বোচ্চ ধাপের উপর এবং তা ঋতুর পরিবর্তন ও আলো বা তাপের হেরফেরের উপর অনেকটাই নির্ভর করে। এরপর, জলের উষ্ণতার উপর নির্ভর করে ঐ মাছ তার বাসা বানাবার স্থান নির্ণয় করবে, এবং নিজের ঐ নির্বাচিত স্থানের অভেদ্যতা রাখতে সে মাথা নিচু করে দেহটিকে লম্বভাবে রেখে অন্য মাছের প্রতি **বিরুদ্ধাচারণমূলক** আচরণ করবে বা তাকে বাধা দেবে। ইতিমধ্যে **পুরুষ হরমোনের** প্রভাবে ফুটে ওঠা তার **রক্তাভ শরীরের চাকচিক্য**

দ্বারা সে স্ত্রীমাছকে আকর্ষণ করবে এবং একধরনের **সর্পিল বা আঁকাবাঁকা** (zigzag) **'নৃত্যের'** (dance) সাহায্যে স্ত্রীমাছটিকে তার বাসায় পৌঁছাতে অনুপ্রাণিত করবে (চিত্র নং - 10.3)। এরপর ডিম নিষিক্ত হলে ঐ পুরুষ মাছটিই ডিমের যত্ন নেবে এবং এরজন্য তার পুচ্ছ পাখনার সাহায্যে ডিমপুঞ্জকে সে আন্দোলিত (fanning) করবে। ব্যবহারবিদ্‌দের মতে স্বতঃপ্রবৃত্তি জাত ঐ প্রতিটি আচরণের মূলে রয়েছে **উদ্দীপক** (আলো, তাপ ইত্যাদি), **হরমোন ও স্নায়ুতন্ত্রের যৌথ প্রভাব**। অবশ্যই, উদ্দীপক প্রাথমিকভাবে নিস্পৃহ স্নায়ুতন্ত্রকে উদ্দীপ্ত করে তোলে কিন্তু শেষপর্যন্ত স্নায়ুতন্ত্রের ক্রিয়াই ধাপে ধাপে ঘটনা পরম্পরা গড়ে তোলে। একটি রক্তাভ পুরুষ মাছকে দেখে স্ত্রীমাছ যখন উত্তেজিত হয়, তখন ঘটনাটি আর ব্যক্তিগত পর্যায়ে না থেকে সমষ্টিগত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। পুরুষ মাছের এই সাময়িকভাবে রক্তাভ হয়ে ওঠা তলপেট অন্য পুরুষ বা স্ত্রীমাছের আচরণকে কতটা প্রভাবিত করে তা নিয়ে টিনবার্জেন বেশ কিছু পরীক্ষা করেছেন। নকল (dummy) স্টিকেল্‌ব্যাক যার আকৃতি বা চেহারা স্টিকেল্‌ব্যাকের মত হুবহু নয়, কিন্তু **তলপেটটি রঙীন (লালরঙের)** তা দেখে আসল পুরুষ স্টিকেল্‌ব্যাক তার অধিকৃত অঞ্চলকে (territory) রক্ষা করবার জন্য চঞ্চল হয়ে ওঠে; অথচ হুবহু স্টিকেলব্যাকের মতই দেখতে কিন্তু তার পেটটি রঙীন নয় এমন নকল মাছকে দেখে সে একেবারেই উত্তেজিত হয় না। এ ছাড়া **আড়াআড়ি** ভাবে না রেখে **লম্বভাবে** রাখলেই আসল পুরুষ স্টিকেল্‌ব্যাক নকল মাছটিকে দেখে উত্তেজিত হয় - কেননা এই লম্বভাবে অবস্থানই ঐ মাছটির ভীতি উৎপাদনকারী ভঙ্গী (threatening posture) বা আচরণ। স্বতঃপ্রবৃত্তির এ ধরনের আচরণ অন্য প্রাণীদের মধ্যেও দেখা যায় (চিত্র- 10.4, 10.5)। হেরিং গাল (Herring Gull) এক ধরনের সামুদ্রিক পাখী। বাচ্চা হেরিং গালের সামনে বড় হেরিং গালের নকল মুন্ডু ঝুলিয়ে দিলে বাচ্চারা খাবার পাবার আশায় চঞ্চল হয়ে ওঠে। কতটা চঞ্চল হবে তা অবশ্য নির্ভর করে ঐ মেকী **চঞ্চুর প্রান্ত দেশ** ও তার উপরে **রক্তবর্ণের একটি চিহ্নের (spot) থাকা বা না থাকার উপর** (চিত্র নং 10.6)। সুতরাং স্বতঃপ্রবৃত্ত আচরণ উদ্দীপকের প্রকৃতির উপর অনেকটাই নির্ভরশীল।

স্বতঃপ্রবৃত্ত আচরণ একধরনের মামুলি বা বাঁধাধরা আচরণের (stereotyped) সামিল। উচ্চতর প্রাণীদের ক্ষেত্রে অবশ্য আচরণ আহৃত শিক্ষার দ্বারা প্রভাবিত হয়; এ বিষয়ে এবার আলোচনা করা যাক।

10.3 শিক্ষিত আচরণ (Learned behaviour);

আমাদের পরিচিত প্রাণীজগতে যে ধরনের আচরণ আমরা সাধারণত দেখে থাকি তা বেশিরভাগই শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার মাধ্যমে অর্জিত। এর ফলে প্রাণী ক্রমশ যে কোনও অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অভ্যস্ত ও সক্ষম হয়ে ওঠে; বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এই শিক্ষা বা অভিজ্ঞতা স্থায়ী হয়, সুতরাং শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের কার্যকারিতারও এক ধরনের পরিবর্তন ঘটে। প্রতিতুলনায়, **স্পর্শেন্দ্রিয়-র পরিবর্তন কিন্তু সাময়িক**, কেননা তা অস্থায়ী বা পরিবর্তনশীল উদ্দীপকের উপর নির্ভরশীল। আমাদের অভিজ্ঞতায় আমরা জানি যে 'ট্রেনিং' বা হাতে কলমে শিক্ষার মাধ্যমে কি ভাবে কুকুর, বিড়াল, ঘোড়া, পাখী, বানর বা যেকোনও প্রাণীকে 'শিক্ষিত' বা পরিশীলিত করে তোলা সম্ভব। শিক্ষিত আচরণের বিভিন্ন দিক আছে যেমন ঃ

a) মনে ছাপ ফেলা (Imprinting), b) অভ্যস্তকরণ (habituation), c) শর্ত সাপেক্ষ আচরণ (Conditional behaviour), d) যন্ত্র প্রভাবিত আচরণ (Instrumental conditioning), e) বিচার ও ভ্রান্তির মাধ্যমে শিক্ষা ·ial and Error learning)।

10.3.1 মনে ছাপ ফেলা (Imprinting) :

অনেক সময়ই খুব **ছোটবেলায়** কটা নির্দিষ্ট ঘটনা বা **আচরণ পরবর্তীকালের আচরণকে** পুরোপুরি **প্রভাবিত** করে - যাকে সাধারণভাবে আমরা **'মনে ছাপ ফেলা'** বলি। বাচ্চা পাখীদের কথাই ধরা যাক। ডিম ফুটে বেরুবার পর সে তার মা-র আচরণকে পুরোপুরি অনুসরণ করে; মুরগী বা হাঁসের বাচ্চার বেলায় আমরা তা সবসময়ই দেখে থাকি। পরীক্ষা করে দেখা গিয়েছে, মা পাখীর বদলে বাচ্চাদের যদি একটি চলমান ট্রলির উপর রাখা একটি রঙ্গীন বাক্সে টিক্ টিক্ আওয়াজ করা একটি অ্যালার্ম ঘড়িকে অনুসরণ করতে 'শিক্ষা' দেওয়া হয়, তো বাচ্চারা তাতেই অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। অবশ্য শুধুমাত্র খুব ছোটবেলাতেই এ ধরনের আরোপিত আচরণের পরিবর্তন আনা সম্ভব। বস্তুত, ডিমফুটে বেরুনোর পর প্রথম কয়েক দিনের মধ্যে এ পরিবর্তন না আনতে পারলে, কখনই তা করা সম্ভব নয়।

10.3.2 অভ্যস্তকরণ (habituation) :

শিক্ষিত আচরণের এ একটি প্রাথমিক ও সরলতম অবস্থা। প্রাণীকে একটি নির্দিষ্ট **উদ্দীপকের দ্বারা বারবার উদ্দীপ্ত করলে**, তার স্বাভাবিক আচরণের বদলে ক্রমশ সে ঐ **উদ্দীপক-প্রভাবিত আচরণে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে।** শিকারের অপেক্ষায় জালে বসে থাকা মাকড়সার কথাই ধরা যাক। জালের এক প্রান্ত ধরে টানলে, হয়তো জালে পোকা ধরা পড়েছে - এই ধারনায় মাকড়সা জালের কেন্দ্রে বসে না থেকে দ্রুত ঐ প্রান্তে চলে আসে। পোকাকে দেখতে না পেয়ে সে একটু পরেই আবার তার পূর্ব অবস্থানে ফিরে যায়। ঘটনাটির পুনরুক্তি করলে অবশেষে মাকড়সাটি আর ব্যস্ত হয় না - কেননা এই অবস্থায় সে ইতিমধ্যে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। অবশ্য জালের অন্য প্রান্ত ধরে টানলে বা জাল টানার জোর কমালে বা বাড়ালে সে আবার তার কারণ অনুসন্ধান করবে। এ ধরনের অভ্যস্তকরণ স্পর্শেন্দ্রিয়-র পরিবর্তনের জন্য নয় বরং স্নায়ুতন্ত্রের দীর্ঘপ্রসারি পরিবর্তনই এর মূলে থাকে।

10.3.3 শর্তসাপেক্ষ আচরণ (conditional behaviour) :

এই ধরনের আচরণের সঙ্গে রুশ বিজ্ঞানী **পাভলভ** (Pavlov) এর নাম অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। এক যুগান্তকারি পরীক্ষার মাধ্যমে প্রাণীজগতের শিক্ষিত আচরণের কারণ তিনি ব্যাখ্যা করেন। একটি পরীক্ষাধীন **কুকুরকে তিনি বেঁধে রাখেন** ও তার মুখে **মাংসের গুড়ো** ছড়িয়ে দেন। এর ফলে কুকুরটির কতটা **লালা ক্ষরিত** হয় - তারও হিসাব তিনি রাখেন। এরপর ঐ গুড়ো মাংস দেবার সময় তিনি একটি বেল বা ঘন্টা বাজান এবং যতবার ঐ খাবার দেন, ততবারই সঙ্গে সঙ্গে **ঘন্টা বাজান।** একটি নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে তিনি ঘটনাটির পুনরাবৃত্তি করেন - অর্থাৎ মাংস দেবার ঘটনার সঙ্গে ঘন্টার আওয়াজকে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করে তোলেন। এরফলে কুকুরটি ক্রমশ ঘন্টার ধ্বনি ও খাদ্যের অনুসঙ্গে **'আবিষ্ট'** হয় এবং ঘন্টার ধ্বনি শুনলেই এমনকি মাংসের ব্যবস্থা না থাকলেও তার লালার ক্ষরণ শুরু হয়। পাভলভ ঘন্টাধ্বনির সঙ্গে লালা ক্ষরণের এই ঘটনাটিকে **'শর্তসাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া'** বলে ব্যাখ্যা করেন। পাভলভ আরোও মনে করেন, **শর্তসাপেক্ষ উদ্দীপক** (এক্ষেত্রে ঘন্টার ধ্বনি), **শর্তহীন প্রতিবর্ত** (মাংসের জন্য লালাক্ষরণ) ও **শর্তহীন উদ্দীপক** (মাংস নিজে) - এদের সময় সম্পর্ক খুবই জরুরী। মাংস আগে দিয়ে পরে ঘন্টাধ্বনি করলে এই প্রতিবর্ত কাজ করবে না। পাভলভ আরোও লক্ষ্য করেন যে ঘন্টার ধ্বনি ও মাংস দেবার **যুগলবন্দী ঘটনাকে**, ঘন্টাধ্বনিতে আবিষ্ট হয়ে ওঠার অভ্যাস ক্রমশ বাড়তে থাকে এবং এক সময় কুকুর তা পুরোপুরি রপ্ত করে ফেলে। আর পরে যদি ঘন্টার আওয়াজ ছাড়াই মাংস দেওয়া হতে থাকে, কুকুর ক্রমশ ঘন্টা

ধ্বনিতে অনাবিষ্ট হতে থাকে এবং একসময় তার আগের সেই অভিনিবিষ্ট অবস্থা লুপ্ত হয়। প্রথম অবস্থাটিকে তিনি **প্রতিবর্তের আহরণ** (acquisition) ও দ্বিতীয় দশাটিকে **প্রতিবর্তের বিলোপ** (extinction) বলে আখ্যাত করেন। পাভলভের মতে প্রাণীকে কোনও উদ্দীপকের সঙ্গে অভ্যস্ত করলে (যেমন, প্রতি সেকেন্ডে 1000 সাইকেল স্বন বা শব্দতরঙ্গ, CPS), সাধারণভাবে সে আংশিকভাবে ঐ ধরনের অন্য উদ্দীপকেও (যেমন প্রতি সেকেন্ডে 500 বা 1500 স্বন) ক্রমশ আবিষ্ট হবে - এটি একটি **সাধারণ শ্রেণীভুক্তির** (generalization) উদাহরণ। আবার এমনও হতে পারে যে সে একমাত্র ঐ নির্দিষ্ট উদ্দীপকেই আবিষ্ট হবে (যেমন সেকেন্ডে 1500 স্বন) - তার হেরফেরে সে প্রভাবিত হবে না। প্রথমটিতে প্রাণীটি হয়তো কোনও শব্দের কাছাকাছি কম্পাঙ্কে সাড়া দেয়, দ্বিতীয় অবস্থায় (যাকে পাভলভ **পৃথককরণ**, discrimination - আখ্যা দিয়েছেন) দ্বারা সে হয়তো দুটি শব্দের কম্পাঙ্কের পার্থক্য নির্ণয় করতে পারে।

10.3.4 উপায় বা যন্ত্র প্রভাবিত আচরণ (Instrumental Conditioning) ঃ

এ ধরনের আচরণ উপরের আচরণের তুলনায় বেশ জটিল। কেননা, যে ধরনের শিক্ষণে প্রাণীটিকে অভ্যস্ত হতে হবে তাও তুলনামূলকভাবে জটিল। যেমন কোনও বোতাম বা লিভার টিপে খাদ্য পেতে অভ্যস্ত হয়ে ওঠা বা ইলেকট্রিক শকের কষ্ট থেকে মুক্তি পাওয়া। অবশ্য জটিল হলেও পূর্বোক্ত আচরণের মত এখানেও আহরণ ও বিলোপ দশা থাকতে পারে। এই শিক্ষণের উদ্দেশ্য ও ফল নানারকমের হতে পারে। যেমন লিভার টিনে খাদ্য পেলে তাকে **'পারিতোষিত শিক্ষণ'** (Reward training) বলা যেতে পারে, তা কোনও কষ্টদায়ক অবস্থা থেকে মুক্তির উপায় (যেমন ইলেকট্রিক শক) হলে, তাকে **পলায়ন শিক্ষণ'** (Escape training) এবং যদি তা বিষাক্ত, অস্বাস্থ্যকর বা ক্ষতিকারক বস্তুকে পরিহার করবার শিক্ষা হয়, তাকে **'পরিহার্য শিক্ষণ'** (Avoidance training) বলে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। প্রাণীটি তার এইসব আচরণের মাধ্যমে তার পারিপার্শ্বকেও প্রভাবিত করে।

10.3.5 বিচার ও ভ্রান্তির মাধ্যমে শিক্ষা (Trial and Error Learning) ঃ

বিচার ও ভ্রান্তির মাধ্যমে প্রাণীকে জটিল ধরনের আচরণে পরিশীলিত করে তোলা সম্ভব। ধরা যাক, পরীক্ষাধীন প্রাণীকে একাধিক ভিন্নধর্মী সুযোগ দেওয়া হ'ল। যেমন ঐ প্রাণীটির খাঁচায় একটি বিশেষ রঙের গাঢ় দরজা এবং আর **একটি তারই হাল্কা রঙের** দরজার ব্যবস্থা রাখা হ'ল। হাল্কা রঙের দরজার পিছনে খাবার লুকানো থাকলো - এবং ঐ দরজা খুলে খাবার পেতে তাকে শিখতে হবে কিভাবে ঐ দরজা খোলা যায় বা **অলিগলি বেয়ে** ঐ দরজার কাছে পৌঁছনো যায়। গাঢ় রঙের দরজাটি সবসময়ই বন্ধ থাকবে - সুতরাং তা খুলে খাবার পাবার কোনও সম্ভাবনাই নেই। খাদ্য পেতে হলে হয়তো তাকে বুকে হেঁটে বা লাফ দিয়ে চলতে হবে এবং সে তা **ভ্রান্তি ও বিচারের মাধ্যমেই** শিখবে - অর্থাৎ প্রাণীটিকে প্রথমত রঙের উজ্জ্বলতার তারতম্য শিখতে হচ্ছে - এবং সে শিক্ষা সঠিক হলে সে পুরস্কৃত হচ্ছে (খাদ্য পাচ্ছে) বা ক্ষেত্রবিশেষে শাস্তি পাচ্ছে (উজ্জ্বল রঙের দরজা খোলবার চেষ্টা করলে ইলেকট্রিক শক খাবে এমন ব্যবস্থা থাকবে) (চিত্র -10.7) শিক্ষাকে আরোও জটিল করে তোলা যায় যদি ঐ খাবার খুজে পেতে তাকে **এক গোলক ধাঁধা** (Maze) অতিক্রম করতে হয় (চিত্র নং - 10.8)। প্রাণীটির সুবিধার জন্য গোলক ধাঁধার স্থানে স্থানে স্পর্শেন্দ্রিয় উদ্দীপক ইঙ্গিত (cue) রাখা যেতে পারে (গন্ধ, শব্দ ইত্যাদি) - যার সাহায্যে সে একসময় গোলক ধাঁধার ধাঁধাও ভেদ করতে পারে।

এইভাবে বিভিন্ন ধরনের **শিক্ষা বা শিক্ষণের মাধ্যমে** - যা সরল থেকে জটিল হতে পারে এবং যা ক্রমশ দুরুহ বা দুষ্কর হতে পারে - **প্রাণী** ক্রমশ আরোও বেশি ভাবে শিক্ষিত হয়ে উঠতে পারে। যেহেতু এই ধরনের শিক্ষায় মস্তিষ্ক ও স্নায়ুতন্ত্রের ভূমিকা অনেকটাই — ঐ অঙ্গের আঘাতজনিত কারণে এই ধরনের শিক্ষা ব্যাহত হয়।

10.4 শিক্ষা ও স্মৃতি

শিক্ষার সঙ্গে স্মৃতির যোগ খুবই নিবিড়। **স্মৃতি হল 'সঞ্চিত বা সংরক্ষিত শিক্ষা'**। শিক্ষিত বা পরিশীলিত হয়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রেরও পরিবর্তন ঘটে - কিন্তু তা স্নায়ুতন্ত্রের কোন অংশ বা স্থান বিশেষে? এই পরিবর্তনের সঙ্গে স্মৃতির সম্পর্কই বা কি? এ বিষয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে। লক্ষ্য করা গিয়েছে যে ক্রম বিবর্তনের ধাপে ধাপে শিক্ষা বা পরিশীলনের সামর্থ ক্রমান্বয়ে বেড়েছে - যার সর্বোচ্চ স্ফুরণ আমরা মানুষের মধ্যে দেখতে পাই; একই সঙ্গে **মস্তিষ্কেরও সমান্তরাল পরিবর্তন ও বিবর্তন ঘটেছে**। আপনারা আগেই জেনেছেন যে ভ্রূণ অবস্থায় মেরুদণ্ডী প্রাণীদের মস্তিষ্ক একটি ফাঁপা নল আকারে শুরু হয়। ভ্রূণ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তা জটিল আকার নেয় এবং ক্রমশ তিনভাগে ভাগ হয় - (1) **পুরো মস্তিষ্ক** (Fore brain), (2) **মধ্য মস্তিষ্ক** (Mid brain) ও (3) **পরাঙ মস্তিষ্ক** (hind brain)। পরাঙ মস্তিষ্ক অংশ থেকেই **লঘুমস্তিষ্ক** (Cerebellum) ও **সুষুম্নাশীর্ষক** (Medulla Oblongata) তৈরী হয়। মধ্যমস্তিষ্ক আকারে তুলনামূলকভাবে ছোট : **নেত্রলোব** (optic lobe) বা **টেকটাম** (Tectum)দিয়ে তা তৈরী। মধ্য ও পরাঙ মস্তিষ্ককে একত্রে **মস্তিষ্ক কান্ডও** (Brain stem) বলা হয়। পুরো মস্তিষ্কের দুটি ভাগ : **অন্তর মস্তিষ্ক** (Diencephalon)ও **প্রান্তমস্তিষ্ক** (telencephalon)। আন্তরমস্তিষ্কে আছে থ্যালামাস (Thalamus) ও হাইপোথ্যালামাস (Hypothalamus) অংশ। প্রান্ত মস্তিষ্ক মূলত **মস্তিষ্ক** গোলার্ধ (Cerebral hemisphere) এবং অংশত বেসাল নিউক্লিয়াই (Basal Nuclei) ও ঘ্রাণবহ বাল্ব (Olfactory bulb) দিয়ে গঠিত। মস্তিষ্ক গোলার্ধ দুভাগে বিভক্ত এবং **কর্পাস ক্যালোসাম** (Corpus Callosum) নামের স্নায়ুতন্ত্র বন্ধনীর দ্বারা এই দুই ভাগ পরস্পর যুক্ত। ক্রমবিবর্তনের উচ্চতম ধাপে (যেমন **স্তন্যপায়ী প্রাণীদের** ক্ষেত্রে) পুরোমস্তিষ্কের, বিশেষ করে তার **মস্তিষ্ক গোলার্ধের অংশের আয়তন** বা আকার খুবই **বৃদ্ধি পেয়েছে**। মস্তিষ্ক গোলার্ধের এক উল্লেখযোগ্য অংশের নাম **মহামস্তিষ্ক** (cerebral cortex), যার **নবমহামস্তিষ্ক** (Neocortex) অংশ শুধুমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়। পরিশীলন বা শিক্ষা নির্ভর পরঙ্গমতার সঙ্গে এই নবমহামস্তিষ্কের উদ্ভব ও ক্রমবৃদ্ধির খুবই নিবিড় যোগ আছে। প্রাণীদের উপর বিভিন্ন পরীক্ষার মাধ্যমে জানা গিয়েছে দুই মস্তিষ্ক গোলার্ধের মধ্যে আদানপ্রদানের জন্য কর্পাস ক্যালোসাম ব্যবহৃত হয়। মৃগীরোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের কর্পাস ক্যালোসামের বন্ধনী ছিন্ন করে দিলে দুটি গোলার্ধের সমন্বয়ের যে অভাব হয়, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে। মহামস্তিষ্ক ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল যেমন **হিপ্পোক্যাম্পাস** (Hippocampus) কে স্মৃতির **মূল ভাঁড়ার** বলে মনে করা হয়। স্মৃতি আবার দু'ধরনের—**সাময়িক ও দীর্ঘস্থায়ী**। সাময়িক স্মৃতিকে দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে রূপান্তর করাতে হিপ্পোক্যাম্পাসের নির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। হিপ্পোক্যাম্পাসহীন মস্তিষ্ক তাই নতুন স্মৃতি সঞ্চয়েও অক্ষম। উল্লেখযোগ্য যে দুটি গোলার্ধের মধ্যে মানুষের ক্ষেত্রে **একটিই প্রবল** (dominant) হয় - যেমন ডানহাতি মানুষদের ক্ষেত্রে ডান মস্তিষ্ক গোলার্ধ বা বাঁহাতিদের ক্ষেত্রে বাম গোলার্ধ। প্রবল গোলার্ধ কোনও কারণে জখম হলে, শারীরিক অসংগতি বা ঘাটতির (deficit) সৃষ্টি হয় - বিশেষ করে

স্মৃতি ও শিক্ষার অবনমন বা লোপ পাওয়া, মস্তিষ্ক গোলার্ধের আঘাত, দুর্ঘটনা (যেমন সেরিব্রাল স্ট্রোক) বা জখমের সঙ্গে খুবই নিবিড়ভাবে জড়িত। এ ছাড়া কর্পাস ক্যালোসামের ক্রিয়া বিঘ্নিত হলে বা ঐ বন্ধনী ছিন্ন হলে দুটি মস্তিষ্ক গোলার্ধের পারস্পরিক নির্ভরতা ও সমন্বয়ের যে অভাব ঘটে - তা তো আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।

10.5 সারাংশ

প্রাণীকুলের আচরণ সাধারণত দু'ধরনের হয়। একটিকে বলে স্বতঃপ্রবৃত্ত আচরণ (instinct), আর একটিকে বলা হয় শিক্ষিত আচরণ (learned behaviour)। স্বতঃপ্রবৃত্ত আচরণ অর্থাৎ যা শিক্ষার মাধ্যমে অর্জিত নয় তা মূলত নিম্ন শ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যেই দেখা যায়। স্বতঃপ্রবৃত্ত আচরণ অবশ্য অনেক ক্ষেত্রেই শরীরের অভ্যন্তরের অবস্থা, হরমোন ইত্যাদির প্রভাবের উপর নির্ভর শীল। শিক্ষিত আচরণ বলতে আমরা প্রাণীদের সেই সব আচরণকেই বুঝিয়ে থাকি যা শিক্ষা বা অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে অর্জন করা হয়। উচ্চতর প্রাণীদের বেশীর ভাগ আচরণই শিক্ষিত আচরণ। শিক্ষিত আচরণের আবার বিভিন্ন দিক আছে।

শিক্ষার সঙ্গে স্মৃতির যোগ অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ-স্মৃতি হল সঞ্চিত বা সংরক্ষিত শিক্ষা। আবার এই স্মৃতি নির্ভরশীল প্রাণীদের মস্তিষ্কের গঠনের উপর। মহামস্তিষ্কের (cerebral cortex) যে অংশ নবমহামস্তিষ্ক (Neocortex) বলা হয় তা শুধুমাত্র স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যেই দেখা যায়। শিক্ষা নির্ভর পারঙ্গমতা যে দক্ষতার সঙ্গে এই নব মহামস্তিষ্কের উদ্ভব ও ক্রমবৃদ্ধির নিবিড় যোগ আছে। সাধারণভাবে মহামস্তিষ্ক এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল যেমন হিপোক্যাম্পাসকে (Hippocampus), স্মৃতির মূলভান্ডার বলে মনে করা হয়।

10.6 প্রশ্নাবলী

1. তুলনা করুন ঃ

a) উদ্দীপক ও ইন্দ্রিয় স্থান

b) স্বতঃপ্রবৃত্ত আচরণ ও শিক্ষিত আচরণ

c) অভ্যস্তকরণ ও শর্তসাপেক্ষ আচরণ

d) পারিতোষিক শিক্ষণ ও পলায়ন শিক্ষণ

e) অগ্র মস্তিষ্ক ও প্রান্ত মস্তিষ্ক

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

a) শিক্ষিত আচরণের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করুন।

b) শর্তসাপেক্ষ প্রতিবর্ত ক্রিয়া বলতে কি বোঝায়?

c) মস্তিষ্কের প্রধান তিনটি ভাগ কি কি?

d) স্মৃতির মূল ভাণ্ডার বলতে মস্তিষ্কের কোন অংশ বুঝি?

3. দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন :

a) সঞ্চিত বা সংরক্ষিত শিক্ষার সঙ্গে স্নায়ুতন্ত্রের সম্পর্ক বর্ণনা করুন।

b) স্বতঃপ্রবৃত্ত আচরণের ক্ষেত্রে আভ্যন্তরীণ শারীরিক অবস্থার প্রভাব কি?

c) বিজ্ঞানী পাভলভের পরীক্ষাকে কেন এক যুগান্তকারী পরীক্ষা বলে চিহ্নিত করা হয়?

d) শিক্ষিত আচরণের বিভিন্ন দিক সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

4. শূন্যস্থান পূরণ করুন :

a) ধূসর রাজহংসী বাসার বাইরে ডিম সরে গেলে .... সাহায্যে তাকে উদ্ধার করার চেষ্টা করে।

b) বিজ্ঞানী পাভলভ ঘণ্টা ধ্বনির সঙ্গে লালা ক্ষরণের ঘটনাটিকে .... বলে ব্যাখ্যা করেন।

c) নব মহামস্তিষ্ক শুধুমাত্র .... প্রাণীদের ক্ষেত্রেই দেখা যায়।

d) অভ্যস্তকরণের মূলে স্পর্শেন্দ্রিয়-র পরিবর্তন নয় বরং .... দীর্ঘপ্রসারি পরিবর্তনই এর মূলে থাকে।

10.7 উত্তরমালা

1. a) 10.1

b) 10.1 এবং 10.2

c) 10.3.2 এবং 10.3.3

d) 10.3.4

e) 10.4

2. a) 10.3

b) 10.3.3

c) 10.4

d) 10.4

3. a) **10.4**
   b) 10.2.1
   c) 10.3.3
   d) 10.3.1-5

4. a) চক্ষুর
   b) শর্তসাপেক্ষ প্রতিবর্তক্রিয়া
   c) স্তন্যপায়ী
   d) স্নায়ুতন্ত্রের

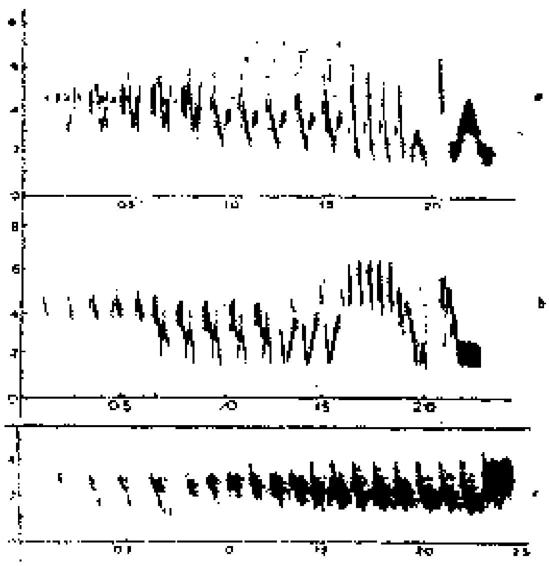

চিত্র নং -10.1 ঃ a ও b — স্বাভাবিকভাবে বড় হওয়া (মা / বাবা পাখীর সঙ্গে) চাফিন্‌চ পাখীর গানের শব্দ কম্পাঙ্কের চিত্ররেখা।
c — আলাদাভাবে বড় হওয়া ঐ পাখীর গানের শব্দ কম্পাঙ্কের চিত্ররেখা - যা অনেক সরল ও অসমাপ্ত।

চিত্র নং -10.2 ঃ বাসা থেকে ডিম অনেকদূর সরে গেলেও ধূসর রাজহংসী বা হেরিং গাল তার অন্বেষণের জন্য ক্রমাগত চেষ্টা করে। (অবসৃত ডিম দেখা যাচ্ছে না)।

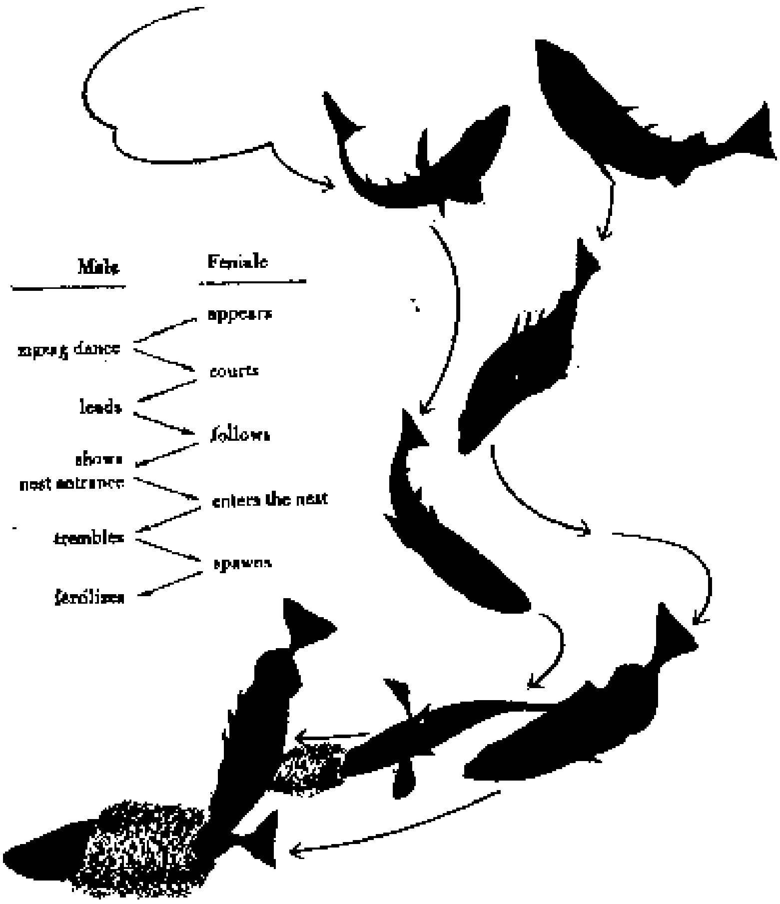

চিত্র নং -10.3 ঃ স্টিকেলব্যাকের যৌন মিলনের ক্রমান্বয় (সর্পিল বা আঁকাবাঁকা) স্তর।
বাঁ দিকের মাছ পুরুষ, ডানদিকের মাছ স্ত্রী।

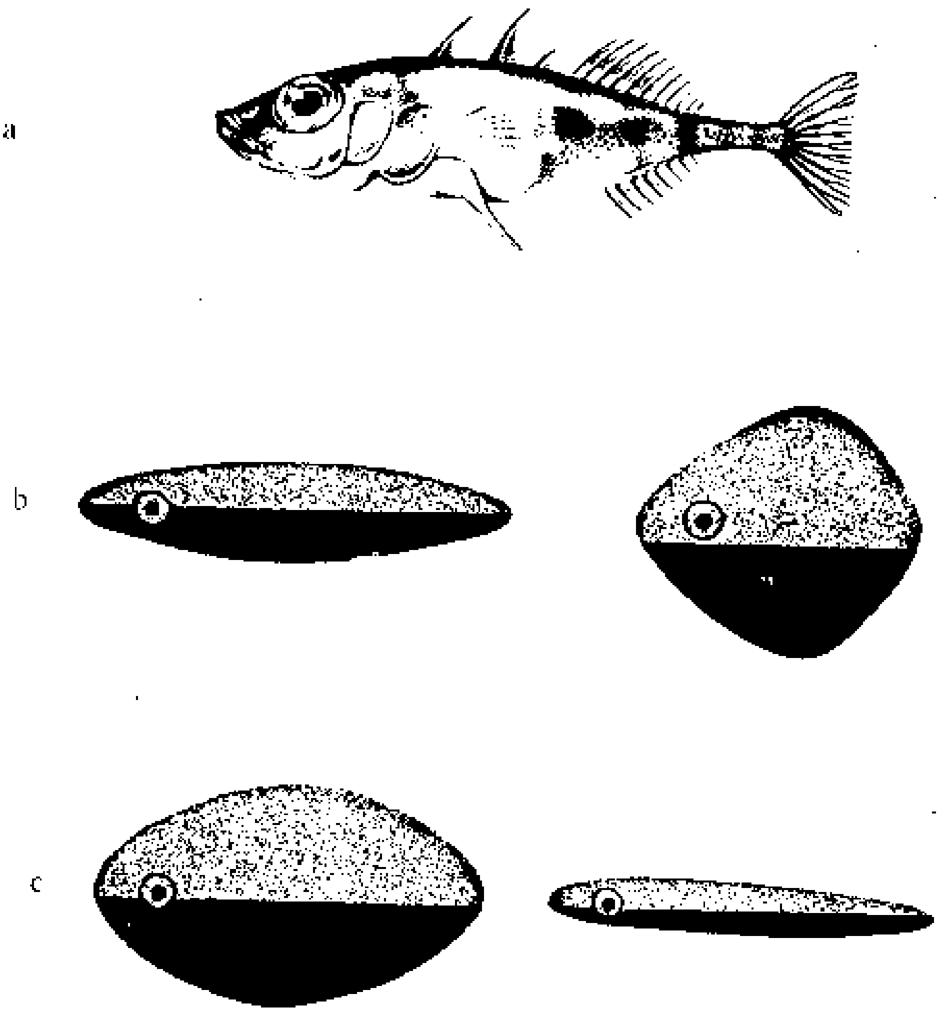

চিত্র নং -10.4 ঃ a - এবং স্টিকেলব্যাকের নকল মাছ যার পেট লাল রঙের নয়।
b ও c -ঐ মাছের মত দেখতে নয়, কিন্তু পেট লালরঙের।
'a' দেখলে স্টিকেলব্যাক শত্রুতামূলক আচরণ করে না, বা দেখলে তা করে।

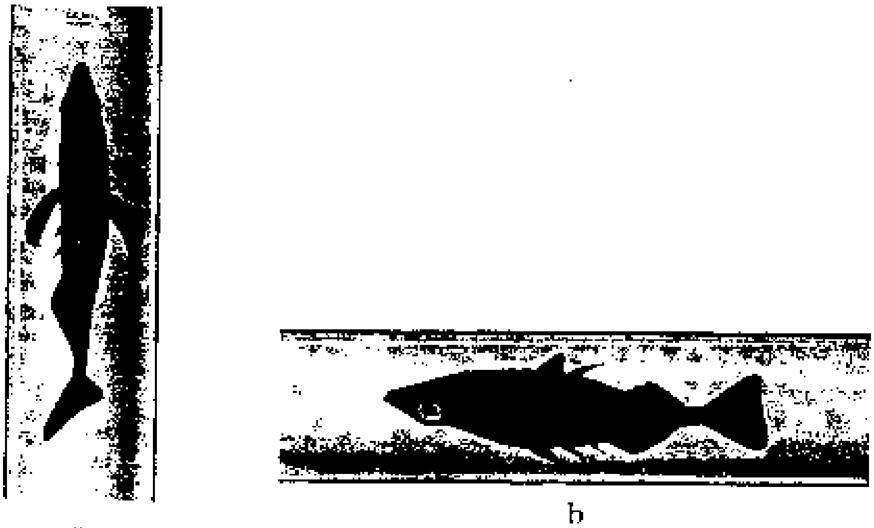

চিত্র নং -10.5 : পুরুষ স্টিকেলব্যাক লম্বভাবে (a) অবস্থিত। অন্য পুরুষ মাছকে দেখলে উত্তেজিত হয় সমান্তরাল (b) ভাবে ঐ মাছ থাকলে তা হয় না।

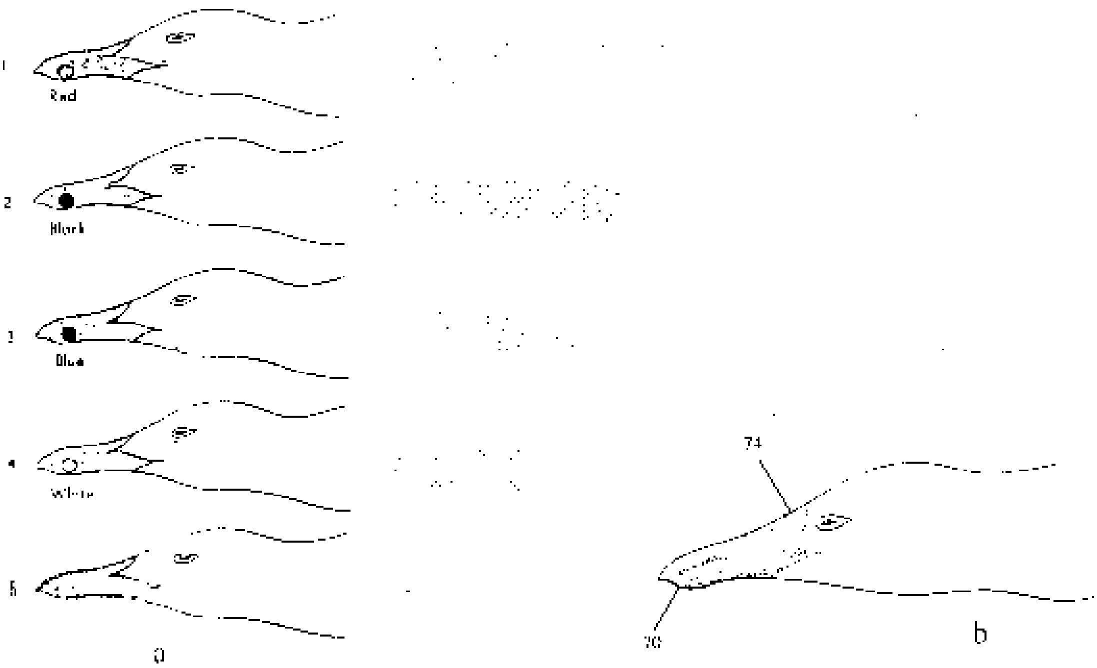

চিত্র নং -10.6 : হেরিং গালের মডেল নিয়ে পরীক্ষা। ঐ পাখীর বাচ্চারা মা পাখীর চঞ্চুর উপরে একটি বিন্দু এবং বিশেষ করে রক্তবর্ণের বিন্দু দেখলে খাদ্য পাবার জন্য চঞ্চল হয় (a)। ঐ রক্তবর্ণের বিন্দুকে অন্যত্র সরালেও (b) বাচ্চা পাখীরা ঐ রক্তবর্ণের বিন্দুতেই আকর্ষিত হয়।

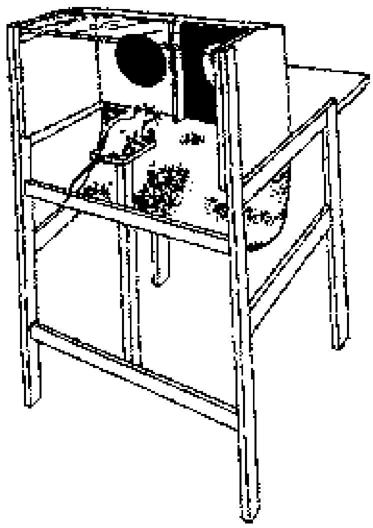

চিত্র নং -10.7 ঃ খাঁচায় দুটি দরজা - সাদা ও কালো রঙের। কালো দরজার পিছনে খাবার আছে - ইঁদুরকে ওপরে লাফিয়ে উঠে সে দরজা খোলা শিখতে হবে।

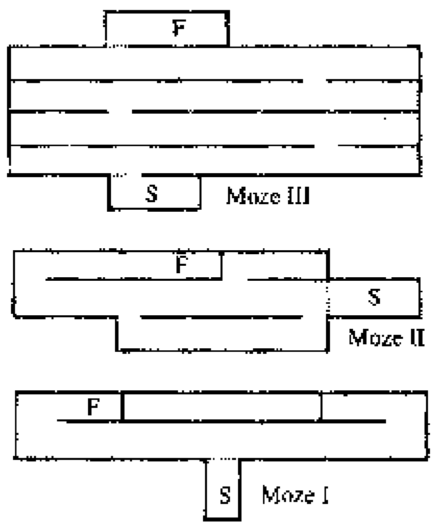

চিত্র নং -10.8 ঃ ক্রমশ জটিল হয়ে ওঠা গোলকধাঁধা। "S" (start) থেকে শুরু "F" (Finish) -এ তা শেষ এবং সেখানে পৌঁছালে খাদ্য পাওয়া যাবে।

একক 11 □ মাছের খাদ্যগ্রহণ স্বভাব (Feeding Behaviour of Fishes)

গঠন

11.1 প্রস্তাবনা
11.2 উদ্দেশ্য
11.3 মাছের খাদ্য
11.4 মাছের খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি
11.5 খাদ্য গ্রহণে সাহায্যকারী ইন্দ্রিয় ও সংবেদী অংশ
11.6 সারাংশ
11.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী
11.8 উত্তরমালা

11.1 প্রস্তাবনা

আমাদের আমিষ খাদ্যের সিংহভাগ আসে মাছ থেকে। সুপরিকল্পিত ভাবে বৈজ্ঞানিক মাছ চাষের জন্য মাছের খাদ্য, খাদ্যাভ্যাস এবং খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি বিশদভাবে জানা প্রয়োজন। বৈচিত্র্যময় মৎস্যকুলের খাদ্যাভ্যাস এবং খাদ্যগ্রহণের আচরণতত্ব নানাদিক দিয়ে আকর্ষণীয়। ডিমপোনা থেকে পূর্ণাঙ্গ দশার মাছেরা শাকভোজী, মাংসাশী, ডেট্রিটাস্ ভোজী (Detritus feeder), সর্বভুক প্রভৃতি নানা ধরণের হতে পারে। আমরা এই এককে মৎস্যকুলের খাদ্য ও খাদ্য গ্রহণের আচরণতত্ব সম্পর্কে বিশদ জানার চেষ্টা করবো।

11.2 উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি

- মাছেদের খাদ্য এবং খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে ভালভাবে আলোচনা করতে পারবেন।
- মাছেদের খাদ্যগ্রহণের বিভিন্ন পদ্ধতি বুঝিয়ে দিতে পারবেন।
- মাছেদের খাদ্য গ্রহণে সাহায্যকারী ইন্দ্রিয় এবং সংবেদি অংশগুলোকে চিহ্নিত করতে পারবেন।

11.3 মাছের খাদ্য

জলীয় পরিবেশের জীবিত উদ্ভিদ ও প্রাণী ছাড়াও উদ্ভিদ এবং প্রাণীর গলিত বা অর্ধগলিত দেহাবশেষও মাছের খাদ্য হিসাবে গৃহীত হয় এছাড়া স্থলজ উদ্ভিদ অথবা প্রাণীও ক্ষেত্র বিশেষে খাদ্য হিসাবে গৃহীত হয় । সামগ্রিকভাবে মাছের খাদ্যকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন ভাগে আলোচনা করা যেতে পারে ঃ

1) **মাছের নিরামিষ (উদ্ভিদ) খাদ্য** ঃ অগভীর জলে মাটি থেকে জন্মানো নানারকম উদ্ভিদ, ভাসমান পানাজাতীয় এবং শ্যাওলাজাতীয় উদ্ভিত; এছাড়া অতি ক্ষুদ্র প্লাঙ্কটন গোষ্ঠীর উদ্ভিদ মাছেদের খাদ্য হিসাবে গৃহীত হয় (চিত্র - 11.1)।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য এই যে, জলের স্রোতের উপর যেসব উদ্ভিদ এবং প্রাণীর গমনাগমন নির্ভর করে সেইসব উদ্ভিদ এবং প্রাণীদের বলা হয় প্লাঙ্কটন (Plankton)। প্লাঙ্কটন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র (নেট প্লাঙ্কটন ? ন্যানো-প্লাঙ্কটন) থেকে বৃহৎ আকৃতির (যেমন জেলিফিস) হতে পারে।

2) **মাছের আমিষ (প্রাণী) খাদ্য** ঃ সন্তরণশীল বড় এবং ছোটো আকারের নানা প্রাণী এবং প্রাণী গোষ্ঠীর প্লাঙ্কটন এই খাদ্য তালিকায় পড়ে। নানারকম জলচর পোকা-মাকড়, ক্রাসটেসিয়া, শম্বুকজাতীয় প্রাণী ছাড়াও ছোটো ছোটো মাছ ও ব্যঙ মাছের খাদ্য হিসাবে গৃহীত হতে পারে (চিত্র - 11.2)।

3) **ডেট্রিটাস খাদ্য (Detritus feed)** ঃ সমুদ্র, পুকুর, হ্রদ বা নদীর তলদেশে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মৃত ও গলিত বা অর্ধগলিত দেহাবশেষকে মূলতঃ বলা হয় ডেট্রিটাস (Detritus)। ডেট্রিটাস খাদ্য বলতে শুধুমাত্র ডেট্রিটাস নয় - ডেট্রিটাসের উপর নির্ভরশীল ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র অমেরুদণ্ডী প্রাণীও খাদ্য হিসাবে গৃহীত হয়।

ডিমপোনা দশা থেকে পূর্ণাঙ্গ মাছের বিভিন্ন অবস্থায় খাদ্যাভাসের নানা পরিবর্তন ঘটতে পারে। সর্বভুক ক্ষুদ্র প্লাঙ্কটনভোজী, প্রাণী এবং উদ্ভিদ খাদ্য ভোজী মাছ ছাড়াও ডেট্রিটাস ভোজী মাছের সংখ্যাও কম নয়। পরিশেষে বলা যেতে পারে কোন বিশেষ মাছ সব সময় কোন বিশেষ খাদ্যের উপর নির্ভরশীল নয়। মাছের কোন সেলুলেজ জাতীয় এনজাইম নেই, কিন্তু উদ্ভিদভোজী মাছের খাদ্যনালীতে সেলুলোজ হজমকারী ব্যাকটেরিয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। এককথায় মাছেদের খাদ্যাভ্যাস খুবই জটিল প্রকৃতির এবং মিশ্র ধরনের।

অনুশীলনী - 1

1) নিচের প্রশ্নগুলির যথাযথ উত্তর লিখুন।

   a) ডেট্রিটাস খাদ্য কী?

   b) প্লাঙ্কটন কী?

   c) মাছেদের খাদ্যনালীতে কি সেলুলেজ পাওয়া যায়?

   d) মাছেদের খাদ্যাভাস কি ধরনের জটিল না সরল প্রকৃতির?

11.4 মাছের খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি

অধিকাংশ মাছের প্রজাতি দর্শনেন্দ্রিয় দ্বারা খাদ্য আহরণ করে। লুকিয়ে থাকা প্রচ্ছন্ন খাদ্যবস্তুর অবস্থান নির্ণয়ের কাজে রাসায়নিক সংবেদন, ঘ্রাণ, এবং আস্বাদন ক্রিয়া ব্যবহৃত হতে পারে। খাদ্য আহরণের কাজে অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংবেদী পদ্ধতিগুলি হল স্পর্শ, তড়িৎ ব্যবস্থা, পার্শ্বেন্দ্রিয় রেখার চাপ এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে শ্রবণ ক্ষমতা টিলিওস্ট মাছের অধিকাংশ প্রজাতি শোষণ পদ্ধতিতে খাদ্যগ্রহণ করে থাকে। শোষণ পদ্ধতিতে মাছের খাদ্যগ্রহণ

পদ্ধতিকে পর পর দুটি ধাপে আলোচনা করা যেতে পারে 1) মুখে খাদ্য সংগ্রহণ এবং 2) খাদ্য গলাধঃকরণ। মুখে খাদ্য সংগ্রহণ পদ্ধতি হিসাবে মূলতঃ নিম্নে বর্ণিত ব্যবস্থাগুলি লক্ষ করা যায় ঃ

1) উদ্ভিদ বা প্রাণীর কোনো অংশ কামড়ে বা ছিঁড়ে খাওয়া। এক্ষেত্রে খাদক মাছ চোয়ালের দাঁত দিয়ে কামড়ে বা ছিঁড়ে খায়। মাটিতে আবদ্ধ উদ্ভিদ বা প্রবাল-পলিপের অংশ এই ধরনের খাদ্য।

2) সন্তরণশীল বা ভাসমান খাদ্যগ্রহণ - বেশির ভাগ মাছই সন্তরণশীল বা ভাসমান খাদ্য অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সঙ্গে মুখে গ্রহণ করে। এ'ক্ষেত্রে খাদ্যের আকার খাদকের তুলনায় যথেষ্ট ছোটই হয়। ছোটো মাছ, ব্যাঙ ইত্যাদি জলে বসবাসকারি বিভিন্ন প্রাণী এই খাদ্য তালিকায় পড়ে।

3) ছাঁকনি পদ্ধতি - এই পদ্ধতিতে জলস্রোতের ছোটো ছোটো প্লাঙ্কটন জাতীয় খাদ্য ফুলকার দাঁড়ার গাত্রে সংগৃহীত হয়। খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে মুখের কার্যগত গঠন পদ্ধতি 'সংযুক্ত দন্ড চতুষ্টয় গঠন' (Four-bar-linkage system) দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। 'সংযুক্ত দন্ডচতুষ্টয় গঠন' পদ্ধতিকে অনেকে 'যুগ্ম কানকো উত্তোলক পদ্ধতি' (Levator operculi caupling) বলেও অভিহিত করেন। 'সংযুক্ত-দন্ড-চতুষ্টয় পদ্ধতি খাদ্য গ্রহণের সময় মুখগহ্বরের কাল্পনিক, দ্বিমাত্রিক, কার্যকরী যান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ব্যাখ্যা করে। এখানে করোটির বিভিন্ন উপাদানগুলির (সন্ধি বন্ধনী, অস্থি ইত্যাদির) পারস্পরিক সংযোগকে চারটি দন্ডযুক্ত বিষম চতুর্ভূজের সঙ্গে তুলনা করা হয় (চিত্র - 11.3)। অনুভূমিক দন্ডগুলির (a, b ও b, c) সঙ্গে উল্লম্ব দন্ডগুলির এখানে দুই প্রকার দন্ড অনুভূমিক ও উল্লম্ব (a, b, c, d) চিহ্নিত করা দরকার ব্রাকেট চিহ্নের সাহায্যে (a,b ও c, d) সংযোগ সন্ধি বন্ধনী যুক্ত। উপরের অনুভূমিক দন্ডটি (a, b) স্থির এবং সঞ্চালন ক্ষমতাবিহীন নিচের (b, c) অনুভূমিক দন্ডটি পশ্চাৎ দন্ডটিকে (b, c) পাশের দিকে সঞ্চালন করতে পারে - ফলে ফুলকার আচ্ছাদন অর্থাৎ কানকোগুলির খোলা এবং বন্ধের ব্যাপারে সাহায্য করে। নিচের অনুভূমিক দন্ডের (a, b) সঞ্চালন দ্বারা চোয়ালের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রণ করে।

এই ধরণের চারটি দন্ডের বিষম চতুর্ভুজ মূলতঃ খাদ্য গ্রহণের সময় করোটির যান্ত্রিক এবং কার্যকরী উৎকর্ষতা ব্যাখ্যা করে। অগ্রবর্তী এবং পশ্চাৎবর্তী দন্ডের দৈর্ঘ্যের অনুপাতে তারতম্য কিভাবে খাদ্য গ্রহণের সময় মুখগহ্বরের যান্ত্রিক এবং কার্যকরী শক্তির উৎকর্ষতা নিয়ন্ত্রণ করে তা নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

1) মুখগহ্বরের যান্ত্রিক উৎকর্ষতা বা করোটির উপাদানগুলির সঞ্চালনের দ্রুততা। $= \dfrac{\text{পশ্চাৎবর্তী দণ্ডের (c, d) দৈর্ঘ্য}}{\text{অগ্রবর্তী দন্ডের (a, b) দৈর্ঘ্য}}$

2) মুখগহ্বরের বলের উৎকর্ষতা বা উপরে এবং নিচের চোয়ালের পরস্পর উপর চাপ প্রয়োগের তীব্রতা। $= \dfrac{\text{অগ্রবর্তী দন্ডের (a, b) দৈর্ঘ্য}}{\text{পশ্চাৎবর্তী দণ্ডের (c, d) দৈর্ঘ্য}}$

পশ্চাৎবর্তী দন্ডের দৈর্ঘ্য একই রেখে অগ্রবর্তী দন্ডের দৈর্ঘ্য বাড়ালে করোটির উপাদানগুলির সঞ্চালনের দ্রুততা কমে এবং চোয়ালগুলির পরস্পরের প্রতি চাপ প্রয়োগের ক্ষমতা বাড়ে, আবার অগ্রবর্তী দন্ডের দৈর্ঘ্য একই রেখে পশ্চাৎবর্তী দন্ডের দৈর্ঘ্য বাড়ালে সঞ্চালন ক্ষমতা বাড়ে এবং চোয়ালগুলির পরস্পরের প্রতি চাপ প্রয়োগের ক্ষমতা কমে। গতিশীল প্রাণীভোজী মাছেদের চোয়ালের সঞ্চালন উৎকর্ষতা শৈবাল ও গতিহীন প্রাণীভোজী মাছেদের তুলনায় অনেক বেশি। দ্রুত সন্তরণশীল শিকার ধরার জন্য চোয়ালের দ্রুত সঞ্চালন খুবই জরুরী, আবার প্রবাল বা শামুক ভেঙে যেসব মাছেদের খেতে হয় তাদের চোয়ালের চাপের ক্ষমতা অনেক বেশি হওয়া প্রয়োজন।

খাদ্যগ্রহণের সময় করোটির, বিশেষ করে চোয়ালের উপাদানগুলোর সঞ্চালনের ফলে দু'দিকে কানকোদুটিও ওঠানামা করে যা শোষণ পদ্ধতিতে খাদ্য গলাধঃকরণের ক্ষেত্রে খুবই প্রয়োজনীয়। শোষণ পদ্ধতিতে খাদ্য গলাধঃ করণের ব্যাখ্যা **কর্তিত-শঙ্কু-প্রকল্প** (Truncated - Cone - design) দিয়ে সহজভাবে করা সম্ভব। এক্ষেত্রে মুখগহ্বরের আকৃতি অগ্রভাগ কর্তিত শঙ্কুর ন্যায় কল্পিত হয়ে থাকে।

মুখ-ছিদ্রকে শঙ্কুর কর্তিত অগ্রভাগের সঙ্গে তুলনা করা হয় (চিত্র - 11.4) এবং মুখগহ্বরের প্রশস্ত পশ্চাৎভাগকে শঙ্কুর বিস্তৃত পশ্চাৎ অংশের সঙ্গে তুলনা করা হয়। মুখগহ্বরের পশ্চাৎ অংশে বিস্তৃত এবং ঋণাত্মক চাপ যুক্ত হলে বাইরের ধনাত্মক চাপ যুক্ত অঞ্চল থেকে জল মুখগহ্বরে প্রবেশ করে, পরে পশ্চাৎ অংশ সঙ্কুচিত হওয়ায় চাপের জন্য জল খোলা কানকো পথে বাইরে বেরিয়ে যায় এবং মুখে গৃহীত খাদ্যের গলাধঃকরণ হয়। করোটি পেশীর সঙ্কোচন এবং প্রসারণের উৎকর্ষতার উপর কর্তিত শঙ্কু-প্রকল্পের কার্যকারিতা নির্ভর করে।

অনুশীলনী - 2

1) **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

a) টিলিওস্ট মাছ ________ পদ্ধতিতে খাদ্যগ্রহণ করে।

b) ________ খাদ্য আহরণের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সংবেদন, ঘ্রাণ, আস্বাদন সাহায্য করে।

c) ________ দ্বারা খাদ্য সংগ্রহের কার্যগত গঠন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা হয়।

d) খাদ্য গলাধঃকরণ ________ প্রকল্প দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।

e) গতিশীল প্রাণীভুক মাছেদের ক্ষেত্রে চোয়ালের সঞ্চালন উৎকর্ষতা প্রায় ________.

f) শোষণ পদ্ধতিতে খাদ্যগ্রহণের দুটি ধাপ হল ________ এবং ________ ।

2) সংযুক্ত দন্ড-চতুষ্টয় গঠন পদ্ধতির ক্ষেত্রে নিচের অনুভূমিক দন্ডটির কাজ লিখুন।

11.5 মাছের খাদ্যগ্রহণে সাহায্যকারী ইন্দ্রিয় এবং সংবেদী অংশ

খাদ্য চিহ্নিতকরণ এবং অবস্থান নির্ণয়ের ক্ষেত্রে অধিকাংশ মাছ দর্শনেন্দ্রিয়ের সাহায্য নেয় লুকিয়ে থাকা বা প্রচ্ছন্ন খাদ্য নির্বাচনের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সংবেদন মূলতঃ ঘ্রাণ এবং আস্বাদন ব্যবস্থা ব্যবহৃত হয়। খাদ্য আহরণের ক্ষেত্রে অন্যান্য সংবেদী পদ্ধতিগুলি হল স্পর্শ, তড়িৎ ব্যবস্থা, পার্শ্বেন্দ্রিয় রেখার চাপ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রবণ ক্ষমতা।

দর্শন ঃ মাছ মূলতঃ স্বল্পালোক জলের মধ্যে বসবাস করে। পরিষ্কার জলে অতি বেগুনী আলো কয়েক মিলিমিটারের মধ্যে অবশোষিত হয় পাঁচ মিটারের মধ্যে লাল রশ্মির আলোচ এবং পনেরো মিটারের মধ্যে সবুজ আলোর অবশোষণ ঘটে। চারশো মিটারের নিচে সচরাচর আলো প্রবেশ করতে পারে না। দু'শো থেকে 2000 মিটার গভীরতায় মাছেরা প্রায় আলোকবিহীন অবস্থায় থাকে, এদের চোখের রেটিনায় রড্ কোষের সংখ্যা অগভীর জলবাসী মাছের তুলনায় প্রায় দশগুণ বেশী (প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য রড্ কোষ হল ক্ষীণ আলোয় দর্শনের জন্য রেটিনার

আলোক সংবেদী অংশে)। অগভীর স্বচ্ছ জলের মাছ উপরের দিকে একটি ত্রৈমাত্রিক শঙ্কু ক্ষেত্রের মধ্যে দেখতে পায় (চিত্র - 11.5)। এই দর্শন ক্ষেত্র বাইরেও পরিবর্দ্ধিত হয়। ঐক্ষেত্রে জলের বাইরের দর্শন চিত্র জলের মধ্যকার মতো পরিষ্কার নয়।

রাসায়নিক সংবেদন ব্যবস্থা ঃ

রাসায়নিক সংবেদন ব্যবস্থা মূলতঃ ঘ্রাণ এবং আস্বাদন এই দু'টি ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ। ঘ্রাণ সংবেদী অংশ হল মাথার একজোড়া ঘ্রাণ কূপ (olfactory pits)। মাছের ক্ষেত্রে আস্বাদনের ক্ষেত্র কেবলমাত্র মুখগহ্বরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, শরীরের বাইরের অংশেও বিস্তৃত। মুখগহ্বরের আস্বাদন অংশগুলি হল - জিহ্বা, তালু, ফুলকা সংলগ্ন অংশ। শরীরের বাইরের আস্বাদন অংশ - ঠোঁট, শুঙ্গ, চোয়াল, মাথার বাইরের আবরণ, উদরের বাইরের অংশ, বক্ষ ও শ্রোণী পাখনা ইত্যাদি। আগেই বলা হয়েছে লুকিয়ে থাকা বা প্রচ্ছন্ন খাদ্য বস্তু আহরণের ক্ষেত্রে রাসায়নিক সংবেদন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ -- এ'ছাড়া দর্শনেন্দ্রিয় আলোর অনুপস্থিতিতে কাজ না করতে পারলে রাসায়নিক সংবেদন ব্যবস্থা ছাড়া খাদ্য আহরণ বা আত্মরক্ষা সম্ভব নয়।

তড়িৎ ব্যবস্থা ঃ দূর্বল তড়িৎ তরঙ্গ সৃষ্টিকারী মাছেরা (*Mormyrids* pp, *Gnathonemus petersii* ইত্যাদি) মূলতঃ তড়িৎব্যবস্থার দ্বারা দিগনির্দেশ ও স্বপ্রজাতিগত যোগাযোগ ব্যবস্থা কায়েম রাখে। অপর পক্ষে তীব্র তড়িৎ তরঙ্গ সৃষ্টিকারী মাছ (ইল, টরপেডো) তড়িৎ ব্যবস্থার দ্বারা খাদক ও খাদ্য উভয় গোত্রের প্রাণীদের পরাস্ত করতে পারে। এই ভাবে তড়িতাহত দুর্বল খাদ্যকে অতিসহজে গ্রহণ করা সম্ভব।

অনুশীলনী - 3

নিচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করুন।

a) অধিকাংশে মাছ _______ দ্বারা খাদ্য চিহ্নিতকরণ ও আহরণ করে।

b) জলে _______ মিটারের নিচে সচরাচর আলো প্রবেশ করতে পারে না।

c) স্বল্পালোকে রেটিনার আলোক সংবেদী অংশে _______ কোষ সক্রিয় থাকে।

d) মাছেদের ক্ষেত্রে ঘ্রাণ সংবেদী অংশ হল _______ ।

e) জলে _______ -মিটারের মধ্যে লাল রশ্মির আলো এবং পনেরোমিটারের মধ্যে _______ রশ্মির আলোর অবশোষণ হয়।

11.6 সারাংশ

মাছেদের খাদ্য এবং খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি খুবই জটিল প্রকৃতির। ডিমপোনা অবস্থা থেকে পূর্ণাঙ্গ অবস্থা পর্যন্ত খাদ্যাভ্যাস একরকম থাকে না। সর্বভুক, প্রাণী ভোজী, উদ্ভিদ ভোজী, ডেট্রিটাস ভোজী ইত্যাদি নানান খাদ্যাভ্যাসের ...স পাওয়া যায়।

অধিকাংশ মাছ শোষণ পদ্ধতিতে খাদ্যগ্রহণ করে। এই পদ্ধতিতে খাদ্যগ্রহণের মূলতঃ দু'টি ধাপ - a) মুখগহ্বরে খাদ্যসংগ্রহ এবং 2) গৃহীত খাদ্যবস্তু গলাধঃকরণ, মুখগহ্বরে খাদ্যসংগ্রহের কার্যকরী পদ্ধতি সংযুক্ত দন্ড-চতুষ্টয় প্রকল্প দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়। গৃহীত খাদ্য গলাধঃকরণ কর্তিত শঙ্কু প্রকল্প দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয়।

অধিকাংশ মাছই দর্শন দ্বারা খাদ্য আহরণ এবং খাদ্যের অবস্থান নির্ণয় করে থাকে, এছাড়া ঘ্রাণ, আস্বাদন, স্পর্শ, পার্শ্বেন্দ্রিয় রেখার চাপ, তড়িৎব্যবস্থা এবং কোন কোন ক্ষেত্রে শ্রবণ খাদ্যগ্রহণে সাহায্য করে থাকে।

11.7 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1) মাছ কত ধরনের উদ্ভিদখাদ্য গ্রহণ করে।

2) শোষণ পদ্ধতিতে খাদ্য গ্রহণের কয়টি ধাপ?

3) সংযুক্ত দন্ড চতুষ্টয় পদ্ধতির সাহায্যে খাদ্য সংগ্রহের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করুন।

4) কর্তিত-শঙ্কু-প্রকল্পের সাহায্যে কিভাবে মাছ গৃহীত খাদ্য গলাধঃকরণ করে?

5) খাদ্য আহরণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন সংবেদী অঙ্গগুলির নাম উল্লেখ করুন।

11.8 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1

a) মৃত প্রাণীর গলিত বা অর্ধগলিত দেহাবশেষকে ডেট্রিটাস বলা হয়। ডেট্রিটাস এবং ডেট্রিটাসের উপর নির্ভরশীল ব্যাকটেরিয়া, প্রোটোজোয়া এবং অন্যান্য ক্ষুদ্র অমেরুদন্ডী প্রাণীকে একত্রে বলা হয় ডেট্রিটাস খাদ্য।

b) গমনের জন্য জলের স্রোতের উপর নির্ভরশীল উদ্ভিদ এবং প্রাণীকে বলা হয় প্লাঙ্কটন।

c) মাছের খাদ্যনালীতে সেলুলোজ পাওয়া যায় না।

d) মাছেদের খাদ্যাভ্যাস জটিল প্রকৃতির।

অনুশীলনী - 2

a) শোষণ b) গাঢাকা দেওয়া বা ছদ্মবেশী c) সংযুক্ত-দন্ড-চতুষ্টয় গঠন d) কর্তিত শঙ্কু e) 05-17 f) মুখগহ্বরে খাদ্য সংগ্রহ, খাদ্য গলাধঃকরণ।

অনুশীলনী - 3

a) দর্শন b) চারশো c) রড্ d) ঘ্রাণ কূপ e) পাঁচ, সবুজ।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1) 11.3 এর উদ্ভিদ খাদ্য অংশটি দেখুন।

2) শোষণ পদ্ধতিতে খাদ্য গ্রহণের দুটি ধাপ ঃ মুখগহ্বরে খাদ্য সংগ্রহ এবং গৃহীত খাদ্য গলাধঃকরণ।

3) 11.4 অংশের **সংযুক্ত-দন্ত-চতুষ্টয়**-গঠন অংশটি অনুসরণ করুন।

4) 11.4 অংশের **কর্তিত-শঙ্কু প্রকল্প** অংশটি দেখুন।

5) নিজে চেষ্টা করুন।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

Gerking D. Shelby 1994 Feeding Ecology of Fish, Academic Press

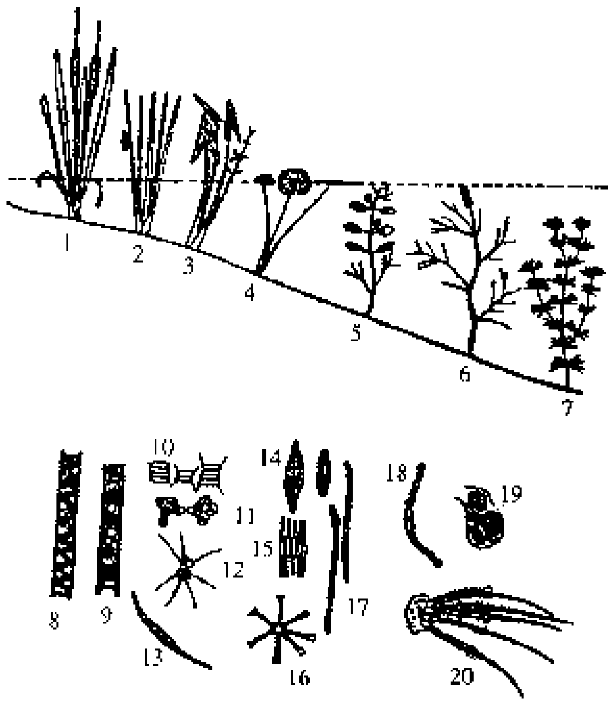

চিত্র নং -11.1 ঃ মাছের কতগুলি উদ্ভিজ্জ খাদ্য। 1-7 মাটিতে জন্মানো নিমজ্জিত এবং অর্ধনিমজ্জিত উদ্ভিদ, ৪-9 সূত্রাকার শ্যাওলা। 10-20 উদ্ভিদ গোষ্ঠীর প্লাঙ্কটন সবুজ শ্যাওলা, নীলাভ সবুজ শ্যাওলা, ডায়াটম ইত্যাদি।

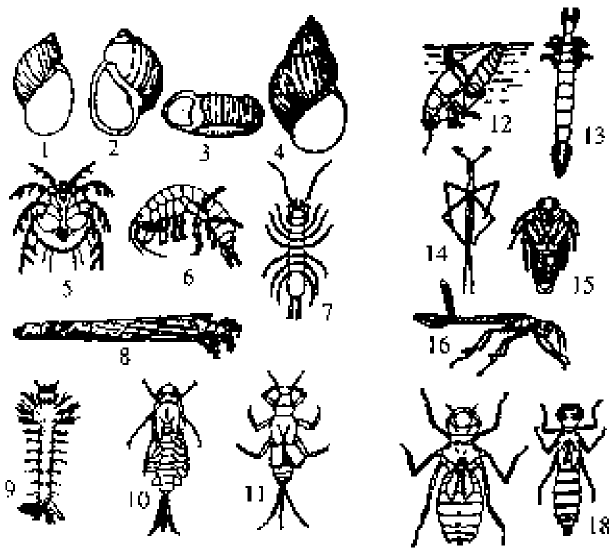

চিত্র নং -11.2 ঃ মাছের কতগুলি প্রাণী জাতীয় খাদ্য ঃ
1-4 শম্বুক জাতীয় প্রাণী, 5-7 ক্রাস্টেসিয়ার বিভিন্ন দশা। ৪-1৪ জলচর পোকার বিভিন্ন দশা।

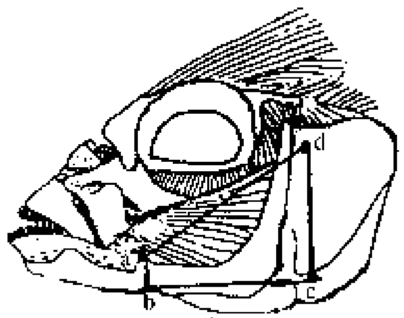

চিত্র নং -11.3 ঃ মাছের করোটির মুখ গহ্বর সংলগ্ন অংশের
উপাদান ও কাল্পনিক সংযুক্ত দণ্ড চতুষ্টয় গঠন (a, b, c, d)

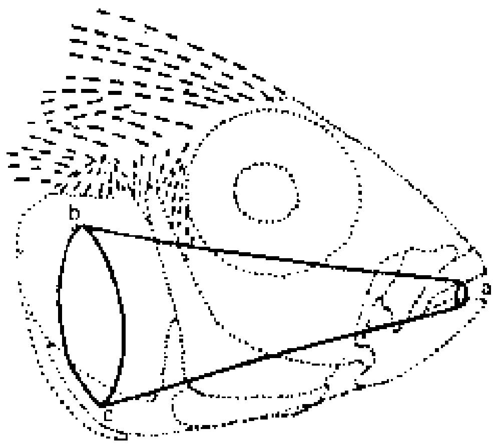

চিত্র নং -11.4 ঃ মাছের মুখগহ্বরের কল্পিত কর্তিত শঙ্কু প্রকল্প (a, b, c)

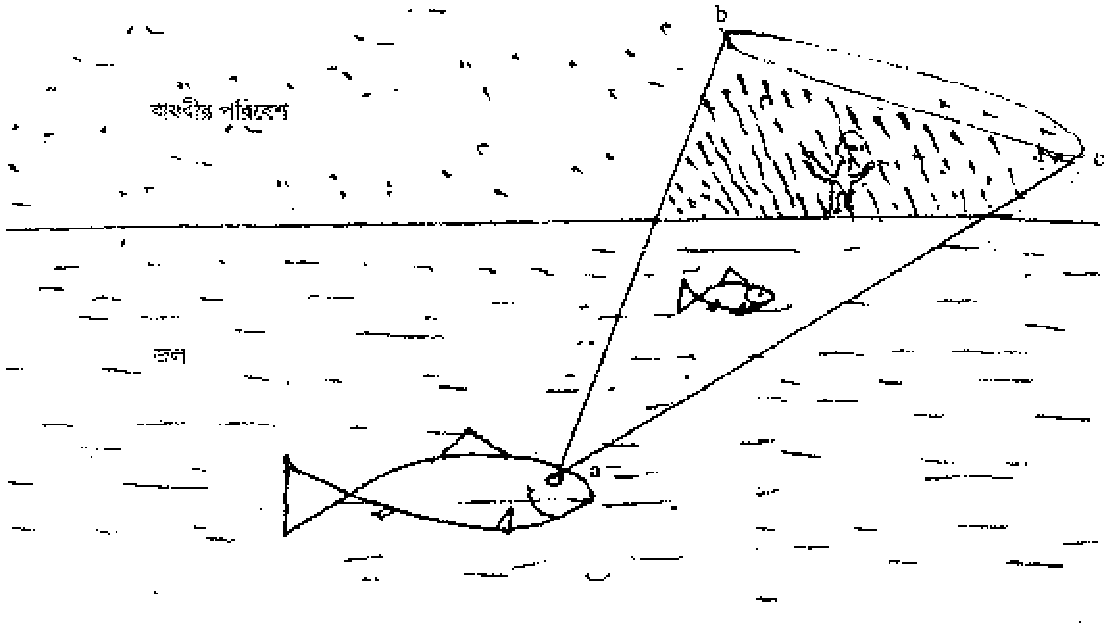

চিত্র নং -11.5 ঃ দৃষ্টি শঙ্কু ক্ষেত্র (a, b, c ক্ষেত্র) - জলের মধ্যে স্পষ্ট দর্শন সম্ভব কিন্তু জলের বাইরে দৃষ্টি অস্পষ্ট।

একক 12 □ পরিযান (মাছ ও পাখি)

গঠন

12.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

12.2 পরিযান - সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

12.3 মাছের পরিযান

12.3.1 মাছের পরিযানের কারণ

12.3.2 জলের প্রকৃতি ও মাছের পরিযান

12.3.3 নোনাজল ও স্বাদু জলে পরিযানের দু'টি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ

12.3.4 মাছের পরিযানের সমস্যা

12.5 যাযাবর পাখির পরিযান

12.5.1 পাখির পরিযানের সংজ্ঞা

12.5.2 পরিযানের কারণ

12.5.3 পরিযানের পথ ও উল্লেখযোগ্য পরিযায়ী পাখি

12.5.4 পরিযানের পথ নির্দেশিকা

12.5.5 পরিযানের উদ্দীপক

12.5.6 পরিযানের সঠিকতা ও নিয়মিত সংগঠন

12.5.7 পরিযানের ভিন্নতা

12.5.8 রিঙ্গিং বা ব্যান্ডিং পরীক্ষা

12.5.9 ভারতে আগত পরিযায়ী পাখির উদাহরণ

12.6 সারাংশ

12.7 প্রশ্নাবলী

12.8 উত্তরমালা

12.1 প্রস্তাবনা

প্রাণী জগতের বিচিত্র আচার-আচরণ একদিকে যেমন আমাদের বিস্মিত করে তেমনি জানার আগ্রহকেও বাড়িয়ে তোলে। প্রাণীদের পরিযানও এই রকমই একটি বিস্ময় জাগানো আচরণতত্ত্বগত বিষয়। মানুষকে একটি গন্তব্যস্থানে পৌঁছে ফিরে আসতে গেলে কতরকম নির্দেশিকা জেনে নিতে হয়, অথচ মাছ বা পাখি কত সাবলীলভাবে বিরাট দূরত্বের গন্তব্যস্থানে নির্বাধায় পৌঁছে যায় এবং ফিরে আসে। মাছ, পাখি, প্রজাপতি, পঙ্গপাল প্রভৃতির পরিযান সংক্রান্ত অনেক কিছুই আমাদের আজ জানা হলেও অনেক কিছুই আজও অজানা। প্রকৃতিতে ঋতুচক্রের আবর্তন,

প্রতিকূল ঋতু, দিবালোকের স্থায়িত্বকাল, খাদ্য, আত্মরক্ষার তাগিদ ও প্রজনন যেমন এর মূলে রয়েছে - একইভাবে আছে শারীরবৃত্তিও কার্যাবলীর প্রভাব। সূর্য ও অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রের সাহায্যে পথ চিনে নেবার ব্যাপারটাও কম বিস্ময়ের নয়। সব মিলে মাছ ও পাখির পরিযান সংক্রান্ত তথ্য ও তত্ত্ব প্রাণী আচরণতত্ত্ববিদদের কাছে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করলে আপনি

- মাছ ও পাখির পরিযানের আচরণতত্ত্ব আলোচনা করতে পারবেন।
- পরিযানের সম্ভাব্য কারণ ও উদ্দীপকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হবেন।
- পরিযানের ভিন্নতা ও সমস্যা বুঝিয়ে দিতে পারবেন।

12.2 পরিযান (Migration) - সংজ্ঞা ও বৈশিষ্ট্য

প্রাণীজগতে বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে বছরের একটি নির্দিষ্ট ঋতু বা সময়ে মূল আবাস থেকে বাসোপোযোগী অন্য একটি নির্দিষ্ট স্থানে যাতায়াতের যে রীতি বা প্রথা লক্ষ্য করা যায়। তাকেই 'পরিযান' (migration) আখ্যা দেওয়া হয়। পরিযান নিয়মিতভাবে সাধারণত বছরে একবার (মাছ, পাখি) বা একাধিকবার (মাছ) বা জীবনে মাত্র একবারই (স্যামন মাছ) হতে পারে। বহু প্রজাতির পাখি ও মাছ ছাড়া কিছু সরীসৃপ (কচ্ছপ), স্তন্যপায়ী প্রাণী (তুন্দ্রা অঞ্চলের হরিণ) ও কীটপতঙ্গের (মৌমাছি, পঙ্গপাল, প্রজাপতি) মধ্যে পরিযান লক্ষ্য করা যায়। পরিযান নানা কারণে হয় - শীতের হাত থেকে রক্ষা পেতে, বংশ বিস্তারের আশু সুবিধা পেতে বা বংশ বিস্তারের উপযোগী আবহ বা পরিবেশ পেতে। মনে রাখতে হবে, পরিযান কোনও ব্যক্তিগত ভ্রমণ নয়, পরন্তু কোনও প্রজাতির বিপুল জনগোষ্ঠী এতে অংশ নেয় এবং তা সময় নির্দিষ্ট (time-specific)। উল্লেখযোগ্য পরিযায়ী পাখি সুমেরীয় টার্ন পাখি (Arctic Tern), সোনালী প্লোভার (Golden Plover) ইত্যাদি, উল্লেখযোগ্য পরিযায়ী মাছ-স্যামন (Salmon), অতলান্তিক বাণ (Atlantic Eel), প্রভৃতি; উল্লেখযোগ্য পরিযায়ী কচ্ছপ - সামুদ্রিক কচ্ছপ (Olive Riddle turtle) ; উল্লেখযোগ্য পরিযায়ী স্তন্যপায়ী - বাদামী বাদুড় (Brown bat), রুক্ষভূমি ক্যারিবু (Barren-ground caribou), কুব্জপৃষ্ঠ তিমি (Humpback whale), ধূসর তিমি (Grey Whale) ইত্যাদি।

12.3 মাছের পরিযান

নদী বা সামুদ্রিক মাছের নানা প্রজাতির মধ্যে পরিযান লক্ষ্য করা যায়। মাছের পরিযান ক্রিয়া জলস্রোতের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে। স্রোতের দিকে (অর্থাৎ যে দিকে জলের ধারা বহমান) পরিযানকে **'স্রোত অনুকূল'** (Detanant migration) পরিযান আর তার বিপক্ষ বা বিপরীতে কৃত পরিযানকে **'স্রোত প্রতিকূল'** (Contanant migration) বলা হয়। ডিম ছেড়েছে এমন মাছ বা চারা মাছ খাদ্যের সন্ধানে যে পরিযান করে, তা সাধারণত স্রোত অনুকূলই হয়। আর ডিমেল মাছ তার ডিম ছাড়বার আদর্শ জায়গার সন্ধানে যে পরিযান করে, তা স্রোত প্রতিকূল হয়ে থাকে। (চিত্র-12.1)

12.3.1 মাছের পরিযানের কারণ ঃ

স্রোত অনুকূল বা প্রতিকূল যাই হোক, মাছের পরিযানকে তিন মূল কারণে ভাগ করা যেতে পারে ঃ (চিত্র - 12.2)

a) ডিম ছাড়ার জন্য পরিযান (Spawning migration) ঃ

বেশ কিছু মাছের প্রজাতি তাদের স্থায়ী আবাস থেকে ডিম ছাড়বার অনুকূল বা আদর্শ স্থানে পরিযান করে। পরিবেশ অনুকূল বলে ডিম ফুটে চারা বেরুনো সহজতর হয় বা ঐ অঞ্চলে খাদকের উপস্থিতি কম বলে চারাপোনা পরিত্রান পায়। এই ধরণের পরিযান সমুদ্র থেকে নদীতে (ইলিশ, স্যামন) বা নদী থেকে সমুদ্রে (বাণ্‌ মাছ) - উভয়ই হতে পারে।

b) আহার্যের জন্য পরিযান (Feeding migration) ঃ

ডিম ফুটে বেরুনোর পর বা ডিম ছাড়ার পর চারা বা স্ত্রীমাছের প্রচুর খাদ্যের প্রয়োজন হয়। তাই চারা মাছ বা সদ্য ডিম ছেড়েছে এমন স্ত্রীমাছ অফুরন্ত খাদ্যের সংস্থান আছে - এমন স্থানের উদ্দেশ্যে পরিযান করে উদাহরণ - ইলিশ, বান্‌ প্রভৃতি।

c) শীত-পরিত্রান পরিযান (Over wintering migration) ঃ

য়ুরোপ বা আমেরিকার **শীতপ্রধান অঞ্চলে** শীতকালে সমুদ্র বা নদীর জল খুব শীতল হয়ে ওঠে, জল জমে বরফও সৃষ্টি হয়। শীতের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে অনেক মাছের প্রজাতি অপেক্ষাকৃত উষ্ণ অঞ্চলে পরিযান করে। এই ধরনের পরিযানকে তাই **শীত-উজানি, শীত-উপেক্ষা** বা **শীত পরিত্রাণ** পরিযান বলা যেতে পারে। উদাহরণ - স্যামন, স্টারজান প্রভৃতি।

12.3.2 জলের প্রকৃতি ও মাছের পরিযান ঃ

জলের প্রকৃতির (স্বাদু বা নোনা) উপর নির্ভর করেও মাছের পরিযানকে চিহ্নিত করা যায়, যেমন (চিত্র - 12.3)

a) নোনাজল পরিযান (Catadromous migration) ঃ

যে সব মাছ সাধারণত স্বাদুজলে বাস করে, কিন্তু ডিম ছাড়ার জন্য মোহনা বা সমুদ্রে (অর্থাৎ নোনা জলে) পরিযান করে তাদের এই গোত্রে ফেলা যায়। উদাহরণ ঃ স্বাদুজলের বান্‌ মাছ (River Eel)

b) স্বাদুজল পরিযান (Anadromous migration) ঃ

মূলত সামুদ্রিক মাছ, ডিম ছাড়ার প্রয়োজনে যখন নদীতে (অর্থাৎ স্বাদুজলে) বিহার করে, তাকে স্বাদুজল পরিযান বলে চিহ্নিত করা হয়। উদাহরণ - ইলিশ।

ডিম ছাড়া ব্যতীত কিছু কিছু প্রজাতির মাছের মধ্যে অন্য কারণেও সমুদ্র থেকে নদী বা নদী থেকে সমুদ্রে পরিযান হতে পারে - এই ধরনের পরিযানকে **'উভবিধ পরিযান'** (Amphidromous migration) বলা যেতে

12.3.3 নোনাজল ও স্বাদু জলের পরিযানের দু'টি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ ঃ

আগেই আপনারা জেনেছেন জলের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে মাছের পরিযানকে কিভাবে চিহ্নিত করা যায়। এবার নোনাজল এবং স্বাদুজলের পরিযানের দুটি উল্লেখযোগ্য উদাহরণ নিয়ে একটু বিস্তৃত আলোচনা করা যেতে পারে।

ক) য়ুরোপীয় বান মাছের (European Eel) নোনাজল পরিযান ঃ

সারা পৃথিবী জুড়ে প্রায় 15 টি প্রজাতির বান্ মাছ পাওয়া যায়। কিন্তু য়ুরোপীয় বান মাছের (Anguitta vulgaris) পরিযানের তুলনা পাওয়া ভার। য়ুরোপের বিভিন্ন নদীতে এরা বাস করে। প্রাপ্ত বয়স্ক হলে এরা য়ুরোপ থেকে পরিযান করে বারমুডার কাছাকাছি শৈবাল সাগরে (Sargasso sea, অর্থাৎ প্রায় 3,810 কিমি দূরে) হাজির হয় — এখানেই তারা ডিম ছাড়ে ও ডিম নিষিক্ত হয়। এই দূর যাত্রাপথে তাদের অনেকে মারা যায়, কেউ কেউ অন্য মাছ বা খাদকের আহার হয়। যাত্রা শেষে যারা বেঁচে থাকে - তারাও এত পরিশ্রান্ত ও ক্লান্ত হয়ে পড়ে যে ডিম ছেড়েই বা নিষিক্ত করবার পর তারা খুব তাড়াতাড়ি মারা যায়। বসন্তকালে ডিম থেকে ছানা মাছ বেরোয় এবং উষ্ণ উপসাগরীয় স্রোতের অনুকুলে ভ্রমণ করে প্রায় তৃতীয় বছরের গ্রীষ্মকালে য়ুরোপের নদীমোহনায় এসে হাজির হয় - এই সময় তাদের আকৃতি পেন্সিলের মত (Elvers)- কিন্তু ক্ষুদ্রাকৃতি বানমাছ বলে তাদের চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। এরপর নদীর স্বাদুজলে ঢুকে পড়ে তারা ক্রমশ প্রায় পূর্ণবয়স্ক হয়ে ওঠে - নমনীয়, দীর্ঘ হরিদ্রাভ রঙের এই প্রায় পূর্ণবয়স্ক বান্ মাছ অন্ততপক্ষে 8-10 বছর নদীতে থাকে - নদীতে কতদিন থাকবে তা অনেকটাই নির্ভর করে আহার্যের সংস্থান ও পরিবেশের উপর। এরপর এই বান মাছের কিছু কিছু মাছের দেহের রঙ ও প্রকৃতির বেশ কিছু পরিবর্তন ঘটে - যেমন হরিদ্রাভ রঙ পাল্টে রুপোলী রঙ হয়, চোখ দীর্ঘাকার হয়, অধর (lip) পাতলা হয়ে ওঠে, বক্ষ-পাখনা তীক্ষ্ণ হয় - বাহ্যিক এইসব পরিবর্তনের পাশাপাশি আভ্যন্তরিক পরিবর্তনও লক্ষ্য করা যায় - যেমন খাদ্যনালী সংকুচিত হয় এবং তার পরিবর্তে প্রজনন অঙ্গের শ্রীবৃদ্ধি ঘটে। এইসব পরিবর্তন আসলে পুরোপুরি প্রাপ্ত বয়স্ক হওয়া ও ভবিষ্যতের পরিযানের জন্য প্রয়োজনীয় একধরনের অভিযোজন। এইসব পরিবর্তন শেষে হেমন্তকালে এরা দীর্ঘ পরিযানের পথে রওনা হয়। য়ুরোপীয় বান্ মছের জীবনচক্রের তাই চার দশা ঃ

1) দূর সমুদ্র (Pelagic) দশা ঃ

শৈবাল সাগরে ডিম ফুটে বেরুনো চারা বান্ মাছ পত্রাকার, প্রায় স্বচ্ছ (glassy), বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যার নাম 'লেপ্টোকেফালি' (Leptocephali)। সাগরের প্রায় 46 মিটার নিচে এদের পাওয়া যায়। বছরখানেক পর এরা প্রায় 25 mm আকৃতির হয় এবং উপসাগরীয় উষ্ণ স্রোতের সাহায্যে অতলান্তিক মহাসাগরের 50° পশ্চিম দ্রাঘিমা বরাবর স্থানে হাজির হয়। এবং সমুদ্রের গভীরতা ছেড়ে উপরিভাগে চলে আসে। দ্বিতীয় বছরের গ্রীষ্মকালে এদের আকৃতি 40-50 mm হয় এবং তৃতীয় বছরে যখন এরা য়ুরোপের উপকূলে হাজির তখন এদের আকৃতি বেড়ে প্রায় 75 mm -এ দাঁড়ায়।

2) শাবক দশা (Elver) ঃ

লেপটোকেফালি দশার বানমাছ এর পর পেন্সিলের মত আকৃতির হয় এবং এদেরকে এই অবস্থায় 'এল্ভার' বা বাচ্চা বা শাবক বান মাছ বলে। এই দশায় তারা নদীর মোহনায় এবং পরে নদীর অভ্যন্তরে (স্বাদুজলে) ঢুকে পড়ে।

3) পীতবর্ণ বান্ (**Yellow Eel**) দশা ঃ

শাবক বান্ মাছের আকৃতির আরোও বৃদ্ধি ঘটে এবং প্রায় পূর্ণ বয়স্ক এ মাছেরা পীত বা হলুদ রঙের হয়ে ওঠে।

4) রুপালী বান্ (**Silver Eel**) দশা ঃ

পীতবর্ণের বান্ মাছ ক্রমশ প্রাপ্ত বয়স্ক হয়ে ওঠে এবং যৌন পরিপক্কতার দ্যোতক হিসাবে উজ্জ্বল রুপালী রঙের হয়। এই অবস্থাতেই এরা পরিযানের জন্য দীর্ঘ যাত্রা করে এবং শৈবাল সাগরে সে যাত্রার ইতি ঘটে।

য়ুরোপীয় বানমাছের জীবন চক্রের উদঘাটন এক চমকপ্রদ আবিষ্কার—হেমন্ত শেষে নদী থেকে ঐ বান্ মাছেরা কোথায় উধাও হয়ে যায় - এ নিয়ে একসময় জল্পনা-কল্পনার শেষ ছিল না। এ নিয়ে সারা য়ুরোপে নানা লৌকিক গল্পগাথা প্রচলিত আছে।

আশ্চর্যের কথা, আমেরিকা যুক্ত রাষ্ট্রের পূর্ব উপকূলের বিভিন্ন নদীতে যে বান্‌মাছেরা থাকে (*Anguilla restrata*), তারাও ঐ শৈবাল সাগরেই প্রজননের জন্য হাজির হয় পূর্ব উপকূলের বিভিন্ন নদী থেকে পরিযান শেষে। অর্থাৎ সেই একই প্রজনন ক্ষেত্রে। দুই প্রজাতির লেপটোকেফালি লার্ভাই ঠিক পথ চিনে তাদের নিজ নিজ মূল আবাসে (অর্থাৎ য়ুরোপ বা আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে) ফিরে যায়। অবশ্য পথের দূরত্ব কম বলে যুক্তরাষ্ট্রের বান মাছেদের লার্ভা তুলনামূলকভাবে কম সময়ে (প্রায় দু বছরে) আমেরিকার নদী মোহনায় হাজির হয়। কিন্তু ঠিক কি ভাবে ঐ শিশুমাছেরা তাদের নিজ নিজ গন্তব্যে পৌঁছে যায়, অর্থাৎ তারা কিভাবে তাদের পরিযান' পথ চিনে নেয় - তা এখনও অজানা।

b) স্যামন মাছের স্বাদুজল পরিযান ঃ

'সার্ডিন' পরিবারভূক্ত স্যামন মাছের পরিযানও কম চিত্তাকর্ষক নয়! পূর্ণ বয়স্ক এই মাছেরা সমুদ্রে থাকে এবং প্রজননের জন্য তারা দীর্ঘ পরিযান করে স্বাদুজলের নদীতে উপস্থিত হয়। অতলান্তিক ও প্রশান্ত - দুই মহাসাগরেই স্যামন্ মাছ পাওয়া যায়। অতলান্তিকে একটি প্রজাতিই পাওয়া যায় - **Salmo solar** অপর পক্ষে প্রশান্ত মহাসাগরে নানা প্রজাতির মধ্যে অন্তত তিনটি প্রজাতি নানাকারণে উল্লেখযোগ্য ঃ

1) রক্তিম স্যামন (Red Salmon, *Oncorhynchus nerka*)

2) গোলাপী স্যামন (Pink Salmon, *Oncorhynchus gorbuscha*) এবং

3) রাজা স্যামন (King Salmon, *Oncorhynchus twchawytscha*)

এই শেষোক্ত স্যামন (রাজা স্যামন) পরিযানের ব্যাপারে সত্যি রাজা! প্রশান্ত মহাসাগর থেকে উত্তর আমেরিকার আলাস্কার ইউকন নদীতে (Yukon river) পরিযান শেষে এদের কেউ কেউ যখন প্রশান্ত মহাসাগরে আবার ফিরে যায় (তাদের সংখ্যা বেশ কম!) - ইতিমধ্যে যাতায়াতে প্রায় 3,220 কিমি পথ (প্রতি অর্ধে 1,610 কিমি) অতিক্রান্ত হয়েছে এবং সময় লেগেছে প্রায় চার বছর। পরিযান পথে রওনা হবার প্রাক্কালে এদের দেহে প্রচুর খাদ্য ও এনার্জির সংস্থান গড়ে তুলতে হয় - কেননা পথ শুধু দীর্ঘই নয় - তারা নদীর স্রোতের প্রতিকূলে ভ্রমণ করে এবং কখনও কখনও 6 ফিট্ পথ এক লাফে পার হয় (নদীতে যেখানে ঝর্ণা এসে পড়েছে বা তারের জাল পাতা আছে এমন বাধা অতিক্রম করতে)। স্রোতের প্রতিকূলে ভ্রমণ করতে করতে অবশেষে মোহনা থেকে অনেক দূরে,

অনেক উপল বন্ধুর পথ পেরিয়ে, রাজা স্যামন তার অভীপ্সিত প্রজনন ক্ষেত্রে হাজির হয় - যেখানে নদী দ্রুত গতি, জল স্বচ্ছ এবং নদীখাত মূলত পাথর বা নুড়িপাথরে তৈরী - অর্থাৎ বালির ভাগ প্রায় নেই। নদীর স্বাদুজল পথে পরিযানের সময় তারা খাদ্যগ্রহণ বন্ধ করে, এরপর দেহের সঞ্চিত খাদ্যের সংস্থানেই তাদের চলতে হবে। এইসময় তাদের দেহের নানা পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় - বিশেষত পুরুষ স্যামন মাছের। তার মুখের সম্মুখভাগ (snout) ও নিম্ন চোয়াল অনেকটা লম্বাটে হয়ে ওঠে এবং ঐ চোয়ালের অগ্রদেশ আঁকশির (hook) মত আকৃতি নেয়। এরপর পুরুষ ও স্ত্রী স্যামন জোড়া বাঁধে এবং ঐ স্বচ্ছতোয়া নদীর খাতের উপল বা নুড়ি পাথরকে পাখনার ঝাপটের সাহায্যে সরিয়ে দিয়ে, শরীরের পার্শ্বদেশের সাহায্যে নদীখাতে ছোটখাটো গর্তের সৃষ্টি করে। এই গর্তে স্ত্রী মাছেরা ডিম পাড়ে এবং পুরুষ মাছেরা ঐ ডিমকে নিষিক্ত করে। এরপর ঐ নিষিক্ত ডিমকে আশেপাশের নুড়ি-পাথরের নিচে চাপা দিয়ে পুরুষ ও স্ত্রী স্যামন মাছ প্রত্যাবর্তনের পথে রওনা হয়। এতদিন অভুক্ত থেকে এবং প্রচণ্ড ক্লান্তিতে তাদের বেশিরভাগই মারা যায়, ভাগ্যবান কেউ কেউ হয়তো তার মূল আবাস অর্থাৎ প্রশান্ত মহাসাগরে আবার ফিরে যায়। ইতিমধ্যে নুড়ি পাথরের তলায় লুকানো ঐ ডিম ফুটে বাচ্চা বেরোয় - তাদেরকে 'আলেভিন্স' (Alevins) বলা হয়। ডিম ফোটার কয়েক সপ্তাহ পরে প্রায় এক ইঞ্চি লম্বা এই শিশু স্যামন এবার তাদের ঐ আশ্রয় থেকে বেরিয়ে আসে, তাদের দেহের দুদিকেই দশটি করে গভীর ছাপ ফুটে ওঠে - এই অবস্থার নাম 'পার' (Parr)। শেষপর্যন্ত এই 'পার' তার লক্ষণগুলি বর্জন করে একসময় 'স্মোল্ট' (smolt) হয়ে ওঠে এবং এই স্মোলট অবস্থাতেই তারা পরিযান করে ঐ স্বাদুজলের নদী থেকে একদিন প্রশান্তমহাসাগরে এসে উপস্থিত হয়। 'পার থেকে স্মোল্ট'- এই পরিবর্তনে 1 থেকে 7 বছর সময় লাগতে পারে এবং তা ঐ নদীতে থাকার সময়ই হয়। সমুদ্রে প্রবেশ করবার পর এই স্মোল্ট-দের খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি ঘটে এবং তাদের খাদ্য তালিকায় হেরিং, বালি বান মাছ, ছোটখাটো অন্যান্য মাছ, চিংড়ি প্রভৃতি থাকে। নদীতে আবার ফিরে যাবার আগে তারা সমুদ্রে অন্ততঃপক্ষে 1-4 বছর সময় থাকে। অবশ্যই স্মোলটরা কিভাবে আলাস্কার ঐ নদীপথ পেরিয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে পথ চিনে আসে - তা এক বিস্ময়!

স্বাদুজলে পরিযানের আর এক উদাহরণ ভারতীয় ইলিশ মাছের (*Tenualosa ilisha*)। আরবসাগর বা বঙ্গোপসাগর থেকে এই ইলিশমাছেরা গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র, মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী, নর্মদা এবং অন্যান্য নদী মোহনায় ও পরে মূল নদীতে প্রবেশ করে। মূলত বর্ষার পরে এবং শীতের শেষে তারা পরিযান করে এবং নদীর মিষ্টি জলে ডিম ছাড়ে। এরপর তারা নদী মোহনায় আবার ফিরে আসে। গঙ্গা ও পদ্মানদীতে স্রোতের উজানে এই মাছেরা আসে অগস্ট এবং তা চলে অক্টোবর মাস অব্দি। এরপর ডিম ছেড়ে নদীমোহনায় ফিরে যাবার পালা শুরু হয় নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে।

12.4 মাছের পরিযানের সমস্যা ঃ

মানুষ তার বহুমুখী প্রয়োজনে সমুদ্র বা নদীকে নানাভাবে ব্যবহার করে। এর ফলে জলপথের পরিযান নানাভাবে ব্যাহত হয়। যেমন ঃ

a) **বাঁধ ঃ** সেচ, বন্যারোধ, বিদ্যুৎ উৎপাদন, যাতায়াতের সুবিধা ইত্যাদি নানাকারণে নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়। এই বাঁধ মাছের পরিযানের জন্য এক পর্বতপ্রমাণ বাধা। এর ফলে মাছ তার চিরাচরিত ঈপ্সিত জায়গায় পৌঁছুতে বহুল অংশে ব্যর্থ হয়। এছাড়া বাঁধ দেবার ফলে বাঁধের উপর বা নীচ দুই অংশেই নদীর নানা পরিবর্তন ঘটে - স্বচ্ছতোয়া নদী ঘোলাটে হয়ে ওঠে - স্রোতের ধার বাড়ে বা কমে। জলের গভীরতার হেরফের ঘটে, ডিম ছাড়ার উপযুক্ত বা আদর্শ স্থান সমূহের লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে – এই সবকিছুর সমন্বয় মাছের দুটি অঞ্চল বা ডিমছাড়ার অঞ্চলকে উল্লেখযোগ্যভাবে পাল্টে দেয়। বস্তুত ফারাক্কায় গঙ্গার ওপর বাঁধ নির্মাণের ফলে বাঁধ পরবর্তী উজান অঞ্চলে ইলিশ মাছের উপস্থিতির সংখ্যা লক্ষণীয় ভাবে হ্রাস পেয়েছে। বক্সার অঞ্চলে ফরাক্কা বাঁধ তৈরীর আগে বছরে গড়ে 31.97 টন ইলিশ মাছ ধরা হোত। এখন তা হ্রাস পেয়ে 0.60 টনে এসে দাঁড়িয়েছে।

b) **দূষণ ঃ** নদীতে শহরের ময়লা জল, কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ ও সেচভূমি বা জঙ্গলের বৃষ্টি বাহিত কীটনাশক নানাভাবে দূষণ ঘটায়। এর ফলেও মাছের পরিযানের বিঘ্ন ঘটে। কানাডার মৎস্য গবেষণা কেন্দ্র (Fisheries Research Board of Canada) দীর্ঘকাল অতলান্তিক স্যামন (S. solar) মাছের (ঐ দেশের মিরামিচি (Miramichi) নদীর) পরিযান নিয়ে গবেষণা করে। তারা দেখিয়েছে 1956 ও 1957 সালে ঐ নদী সন্নিহিত জঙ্গলে ডিডিটি কীট নাশক ছড়ানোর ফলে তা বৃষ্টি বাহিত হয়ে নদীর জলে মেশে এবং ঐ দুবছর ঐ নদীতে স্যামন মাছের আনাগোনা বহুল অংশে হ্রাস পায়। এ ছাড়া কাগজ কলের বর্জ্য, তাপ বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র ব্যবহৃত উষ্ণ জলের প্রবাহ - মাছের পরিযানকে দারুণ ভাবে ব্যহত করে। মাছের পরিযান মূলত খাদ্য ও বংশ বিস্তারের সুবিধা আদায়ের জন্য এক ঋতুনির্ভর স্থানান্তর গমনাগমন। অন্যস্থানে খাদ্য ও প্রাকৃতিক সুবিধার সদ্ব্যবহার করবার ফলে পরিযায়ী মাছের সংখ্যা ও ওজন বৃদ্ধি চমকপ্রদ ভাবে বাড়ে। বহু পরিযায়ী মাছ মানুষের খাদ্য ও ব্যবসায়িক কারণে অত্যন্ত মূল্যবান। পর্যাপ্ত পরিমানে প্রাপ্তিই তার এক বড় কারণ। মাছের পরিযান ব্যাহত হলে তাদের সংখ্যা বা দেহের বৃদ্ধি - দুই ব্যহত হবে। ইলিশের অপর্যাপ্ততা তাই ইঙ্গিত করে।

12.5 যাযাবর পাখির পরিযান ঃ

শীতকালে, বিশেষত সেপ্টেম্বর থেকে নভেম্বর মাসের মধ্যে, প্রতিবছরই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে অনেক নতুন নতুন প্রজাতির পাখি দেখা যায় - যেমন কাদাখোঁচা, বেলেহাঁস, সরাল, পানডুবি, খঞ্জন প্রভৃতি। এই শীতের অতিথি পাখিরা আসলে যাযাবর বা পরিযায়ী পাখি। শীত, গ্রীষ্ম, বর্ষা, বসন্ত যেমন ঋতুচক্রের নিয়ম মেনে আবর্তিত হয়, পরিযায়ী পাখিদের আনাগোনাও যেন তাই বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে তারা হঠাৎ-ই কোথা থেকে এসে হাজির হয়, কিছু দিন বা ক'মাস পরে আবার তারা উধাও হয়ে যায়। বস্তুত পরিযান প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ ধাপ পাখিদের মধ্যেই দেখা যায়। নানা কারণে পাখির পরিযান চিত্তাকর্ষক।

12.5.1 পাখির পরিযানের সংজ্ঞা ঃ

প্রাকৃতিক পরিবেশের সুবিধার সর্বোত্তম ব্যবহারের উদ্দেশ্য পাখির মূল আবাসভূমি থেকে স্থানান্তরে নিয়মিত গমন এবং স্বস্থানে পুনরায় প্রত্যাবর্তন-ই হল পাখির পরিযান। নিয়মিত ও নির্দিষ্ট সময়ে দূরান্তরে যাওয়া এবং ফিরে আসাই পাখির পরিযানের মূল কথা।

12.5.2 পরিযানের কারণ ঃ

শীতকালে বা কখনও কখনও অন্যকোনও ঋতুতে মূল আবাসে খাদ্যের আকালই পাখিদের পরিযানে যেতে বাধ্য করে। পরিযানের ফলে একই ঋতুতে পাখিরা ভিন্ন আবাসে বাস করে এবং অস্থায়ী বা দ্বিতীয় আবাসের খাদ্যের প্রাচুর্য বা উষ্ণতার সুযোগ গ্রহণ করে। দূর পরিযায়ী পাখিরা তাদের মূল বা প্রথম আবাসে বাসা বানায়, ডিম পাড়ে এবং জীবনের বেশিরভাগ সময় কাটায়; দ্বিতীয় বা অস্থায়ী আবাসে সাময়িক প্রাকৃতিক অসুবিধার হাত থেকে রেহাই পেতে পরিযান করে। কিন্তু যারা স্থানীয়ভাবে পরিযান করে তারা খাদ্যের প্রাচুর্যের কারণেও বটেই এমনকি ডিম পাড়ার অনুকূল পরিবেশের জন্যও পরিযান করে।

12.5.3 পরিযানের পথ ও উল্লেখযোগ্য পরিযায়ী পাখি ঃ

শীতকালের পরিযান সাধারণত উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণ গোলার্ধের দিকে হয়, যদিও পূর্ব-পশ্চিম পরিযানের উদাহরণও আছে। দীর্ঘতম পরিযায়ী পাখি - সুমেরু অঞ্চলের টার্ন (Arctic tern, *Sterna paradisaea*), যা শীতকালে সুমেরু অঞ্চল থেকে দক্ষিণ বরাবর প্রায় সারা পৃথিবী ঘুরে কুমেরুতে (Antartica) আসে এবং সেখানকার গ্রীষ্মকাল কাটিয়ে আবার উত্তর বরাবর প্রত্যাবর্তন করে তার মূল আবাস অর্থাৎ সুমেরুতেই। প্রতি অর্ধে এই পাখি 17,000 কিলোমিটারের বেশি দূরত্ব পথ অতিক্রম করে - অর্থাৎ এই যাতায়াতের ফলে সে মোট 34,000 কিলোমিটারের বেশি পথ দূরত্ব অতিক্রম করে। পরিযায়ী পাখিদের পরিযানের গতিবেগ প্রজাতি ও আবহাওয়ার উপর নির্ভর করে। নানা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা গিয়েছে বিভিন্ন প্রজাতির হাঁস বা রাজহাঁস গড়ে 65 থেকে 85 কিমি গতিতে উড়তে পারে। সাধারণত ভূপৃষ্ঠ থেকে 400 থেকে 900 মিটারের ঊর্দ্ধেই তারা পরিযান করে - পথে পাহাড় থাকলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা। কোন কারণ না থাকলেও বা পথ সংক্ষিপ্ত করতে অনেক প্রজাতির পাখিকে 7,500 মিটারের উচ্চতায় পরিযান করতে দেখা গিয়েছে। এইভাবে হিমালয় অতিক্রম করে বেশ কিছু প্রজাতির পাখি ভারতে আসে সুদূর সাইবেরিয়া থেকে।

পাখির এক উড়ান 6 থেকে 11 ঘন্টা হতে পারে এবং দিন ও রাত - উভয় সময়েই পরিযান চলতে পারে। পথে সমুদ্র পড়লে এক উড়ানেই সে পথ পাখি অতিক্রম করে - যেমন পূর্বদেশীয় সোনালী প্লোভার (Eastern Golden Plover, *Pluvialis dominica fulva*) -এর মূল আবাস আলাস্কা বা উত্তর সাইবেরিয়ায়; এক উড়ানে এই পাখি 3200 কিমি সমুদ্র পথ অতিক্রম করে। শীতকালে এদের ভারতেও দেখা যায়। জাপানের একধরনের কাদাখোঁচা পাখি (Snipe, *Capella hardwickii*) এক উড়ানে 4800 কিমি সমুদ্রপথ অতিক্রম করে শীতের অতিথি হিসাবে অস্ট্রেলিয়া বা টাসমানিয়াতে হাজির হয়। হিমালয় অঞ্চলের Woodcock (*Scolopax rusticola*) এক উড়ানে হিমালয় থেকে দক্ষিণ ভারতের নিলগিরি অঞ্চলে হাজির হয় ন্যূনপক্ষে 2400 কিমি পথ অতিক্রম করে। পূর্ব যুরোপ, উত্তর ও মধ্য এশিয়া থেকে নানা প্রজাতির পাখি শীতকালে ভারতবর্ষে পরিযান করে। এরা মূলত সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা অঞ্চল ধরে ভারতে আসে এবং শেষ পর্য্যন্ত অনেকেই দক্ষিণ ভারত বা সিংহলে তার পরিযান শেষ করে।

12.5.4 পরিযানের পথ নির্দেশিকা ঃ

আপনারা আগেই জেনেছেন, মূল আবাসভূমি থেকে পাখিরা স্থানান্তরে যায় আবার স্বস্থানে ফিরে আসে, কিন্তু কিভাবে তাদের পরিযানের পথ সঠিকভাবে চিনে ঈপ্সিত জায়গায় পৌঁছায়, তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। বসন্তকালে, তার মূল বা প্রজনন আবাসে (breeding ground) প্রবাসী পাখিরা যখন ফিরে আসে, পুরোভাগে থাকে পুরুষ পাখি এবং ক্রমান্বয়ে স্ত্রীপাখি ও শাবক পাখি, পরিযান তো ক্রমাগত বা একইভাবে হয় না। মাঝপথে নানা বিরতি থাকে। উত্তর থেকে দক্ষিণ গোলার্ধে যখন পরিযান - বহু ক্ষেত্রেই দলের পুরোভাগে থাকে শাবক পাখি যার বয়স হয়তো মোটে কয়েকমাস! তাকে অনুসরণ করে পূর্ণবয়স্ক পাখির - যারা হয়তো ইতিপূর্বে অভীষ্ট পথে যাতায়াত করেছে; এখানেই বিস্ময়! আনাড়ি ঐ শাবক পাখি পরিযানের পরম্পরাগত পথ কিভাবে সঠিক চিনে অবশেষে তার লক্ষ্যে পৌঁছায়? পথ এবং গন্তব্য - দুই তো তার অজানা। সম্ভবত এ এক সহজাত প্রবৃত্তি (instinct) বা আত্মিক বোধের উদাহরণ - যে বিষয়ে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এই ধরনের আর এক উদাহরণ - পাখির বাসা বানানো। বাবুই পাখির বাসায় যে "শিল্পের বড়াই" থাকে, তা সে কিভাবে শিখেছে? যা হোক, দিনের বেলা সম্ভবত সূর্যলোক পৃথিবীর উপর যে কৌনিক অবস্থানে থাকে - তা অনুমান করে এবং রাতের বেলা তারামন্ডলের অবস্থান দেখে পাখি তার পথের দিশা খুঁজে পায়। দীর্ঘকাল ধরে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে সম্ভবত এই কারণেই পরিযায়ী পাখিরা দিগ্‌ভ্রান্ত হয়। এ ছাড়া বিভিন্ন ভৌগোলিক স্থানবৃত্তান্ত (যেমন সিন্ধু বা ব্রহ্মপুত্র নদের অববাহিকা, হিমালয়ের সানুদেশ, মরুভূমি ইত্যাদি) তাদের পথের নিশানা পেতে সাহায্য করে।

12.5.5 পরিযানের উদ্দীপক ঃ

বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক দুই কারণই পরিযানের উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। দিনালোকের ঋতুভেদে ক্রমিক পরিবর্তনকে অন্যতম বাহ্যিক কারণ বলে মনে করা হয়। প্রজনন অবস্থা (reproductive state) কে আভ্যন্তরিক উদ্দীপনা বলে মনে করা হয়।

12.5.6 পরিযানের সঠিকতা (accuracy) ও নিয়মিত (regular) সংগঠন ঃ

পাখির পরিযানের দুটি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য বিষয় হল - নির্ধারিত সময়ে এবং নির্ধারিত স্থানে পরিযান করা। য়ুরোপে সোয়ালো (Swallow) পাখি যে একেবারে নির্দিষ্ট সময়েই হাজির হয় তা নয়, অনেকসময় একটি নির্দিষ্ট বাড়িতে এসেই তারা বাসা বাঁধে। বিখ্যাত পক্ষীবিদ সালিম আলি (Salim Ali) জানাচ্ছেন যে প্রায় দুহাজার কিমি দূর হিমালয় অঞ্চল থেকে উড়ে আসা ধূসর খঞ্জন পাখিকে (Grey Wagtail, *Motacilla cinerea*) বৃহত্তর মুম্বাই-এর একটি বাড়ির লনের গাছে পরপর পাঁচ বছরে একই সময়ে এবং ঐ একই স্থানে বাসা বানাতে দেখা গিয়েছে! পরিযানের লক্ষ্যের এই যাথার্থ্য ও নিয়মিত সংগঠনও কম বিস্ময়ের নয়!

12.5.7 পরিযানের ভিন্নতা ঃ

পরিযায়ী পাখিরা যে শুধুমাত্র দেশ থেকে দেশান্তরেই পরিযান করে তা নয়। অনেক সময় দেশের শীতপ্রধান অঞ্চল থেকে তারা ঐ দেশেরই অপেক্ষাকৃত উষ্ণঅঞ্চলে শীতকালে চলে আসে। বস্তুত শীতকালে হিমালয় অঞ্চল থেকে অনেক প্রজাতির পাখি ভারতের সমতলে চলে আসে। এ ধরনের পরিযানকে স্থানিক পরিযান আখ্যা দেওয়া যেতে পারে (local migration)। তবে স্থানিক পরিযান দীর্ঘ বা দেশান্তর পরিযানের মত অত সুশৃংখল বা নিয়মিত নয়। অনেকসময় দেশের এক অংশে হয়তো গ্রীষ্মকালে, অপর অংশে শীতকালে বা বর্ষাকালে তাদের

দেখা যায়। এই ধরনের পরিযান সাধারণত তাপ, খরা, বন্যা প্রভৃতির কারণে খাদ্যাভাব ঘটলে প্রাণিত হয়। অর্থাৎ এই ধরনের পরিযান অনেক সময় স্থানীয় প্রাকৃতিক সমস্যার কারণে ঘটে থাকে। পরিযায়ী পাখি - যারা দেশ দেশান্তরে ভ্রমণ করে, অনেক সময়ই তারা মাঝপথে কোথাও কিছুদিনের জন্য অবস্থান করে। এদেরকে যাযাবর পথিক পাখি (passage migrant) বলা যেতে পারে। উত্তর গোলার্ধ থেকে দক্ষিণে বা দক্ষিণ গোলার্ধ থেকে উত্তরে যাতায়াতের দীর্ঘ পথে হয়তো কোনও একটি অঞ্চলে তাদের সাময়িকভাবে দেখা গেল বসন্তে, অন্যত্র হয়তো হেমন্তকালে। অস্কার ওয়াইল্ডের (Oscar Wild) সুখী রাজকুমার (The Happy Prince) গল্পের সোয়ালো পাখি ছিল এইরকম এক পথিক যাযাবর পাখি।

12.5.8 'রিঙ্গিং' বা 'ব্যান্ডিং' (Ringing ও banding) পরীক্ষা ঃ

পাখির পরিযান বা অন্যান্য বিষয় জানতে রিঙ্গিং (ringing) বা ব্যান্ডিং (banding) এর ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। উভয়ই সমার্থক শব্দ (আমেরিকায় 'ব্যান্ডিং' শব্দটি বেশি প্রচলিত)। একটি পাতলা ও সরু অ্যালুমিনিয়াম পাতে কোনও প্রতিষ্ঠানের ঠিকানা ও একটি সংখ্যা গভীরভাবে খোদিত করে পাখির পায়ের একটি নির্দিষ্ট অংশে (যেমন পায়ের নিম্ন অংশে টারসাসে) ভালো ভাবে মুড়ে দেওয়া হয়। পরিযানের পথে জাল টাঙ্গিয়ে বা অন্যভাবে হয়তো ঐ পাখিটিকে ধরা হয়েছে। অন্যত্র ঐ পাখিটিই ধরা পড়লে তাকে কোথায় 'রিং' বা 'ব্যান্ড' পরানো হয়েছিল তা জানা যাবে এবং তা থেকে সে কোন পথ বেয়ে এসেছে তার কিছুটা হদিশ পাওয়া যাবে। সাদা সারস (White Stork) শীতের সময় য়ুরোপ থেকে আফ্রিকায় পরিযান করে। রিঙ্গিং পরীক্ষার দ্বারাই জানা গিয়েছে পশ্চিম জার্মানি থেকে এই সাদা সারসেরা আফ্রিকায় পরিযান করে স্পেন হয়ে বা দক্ষিণ-পশ্চিম দিক লক্ষ্য করে। অন্যদিকে প্রাশিয়া থেকে ঐ সারসেরাই আফ্রিকায় যায় বল্কানভূমির উপর দিয়ে, অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব পথে। এই রিঙ্গিং পরীক্ষার দ্বারাই রাজস্থানের বিকানিরে ধরা একটি সাদা সারস পাখী যে জার্মানি থেকেই এসেছিল তা নির্দিষ্টভাবে জানা গিয়েছে। 1959 সাল থেকে বম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি (BNHS) পরিযায়ী পাখীদের 'রিঙ্গিং'-এর মাধ্যমে ভারতবর্ষে কোন অঞ্চলে এবং কোথা থেকে এই পাখিরা আসে - এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য কাজ করছে। এই ধরনের পর্যবেক্ষণের ফলে জানা গিয়েছে, শীতকালে কেরলে যে হলুদ খঞ্জন পাখী (Yellow Wagtail, *Motacilla* falva feena ও *M. falva thunbergi*) পাখি দেখা যায় বসন্তে তারাই অতিথি যাযাবর হিসাবে থাকে আফগানিস্তানের কাবুল অঞ্চলে বা গ্রীষ্মে পাকিস্তানের বানুতে। তুর্কিস্থানের যাযাবর চড়াই পাখি (Turkistan Sparrow, *Passer hispaniolensis transcaspicus*) ধরা পড়েছিল রাজস্থানের ভরতপুরে শীতকালে - একেই গ্রীষ্মকালে পাওয়া গিয়েছে কাজাকস্তানে। এ সব তথ্যই জানা গিয়েছে BNHS- এর রিঙ্গিং পরীক্ষার কল্যাণে। আজকাল ধাতব রিঙ্গের বদলে প্লাসটিকের তৈরী নানা উজ্জ্বলবর্ণের রিং ব্যবহার করা হয় - ফলে পাখিটিকে না ধরেও শুধুমাত্র ঐ রিং-এর রং লক্ষ্য করেই অনেকটা আন্দাজ করা যায় - এটি কোন অঞ্চলের পাখি। এছাড়া পাখির পরিযান অনুধাবন করার জন্য বিমান, রেডার প্রভৃতির সাহায্যও নেওয়া হয়ে থাকে।

12.5.9 ভারতবর্ষে আগত পরিযায়ী পাখির উদাহরণ ঃ

1) হোয়াইট স্টর্ক (White Stork, *Ciconia ciconia*)- ইউরোপ থেকে আসে।

2) পিনটেল (Pintail; বাংলা - ডিগহাঁস; *Anas acuta*)- সাইবেরিয়া থেকে এদেশে আসে।

3) কমন টিল (Common Teal, বাংলা - পাতারিহাঁস; *Anas crecca*)- উত্তর ইউরোপ ও সাইবেরিয়া থেকে আসে।

4) গারগানে টিল (Garganey Teal: বাংলা-গিরিয়াহাঁস; *Anas querquedula*)- উত্তর ইউরোপ ও পূর্ব সাইবেরিয়া থেকে ভারতে আসে।

5) রেডক্রেস্টেড পোচার্ড (Red crested Pochard: বাংলা লালশির; *Netta rufina*)

6) উড স্যান্ডপাইপার (Wood Sandpiper, *Tringaglareola*)- সাইবেরিয়া থেকেই আসে।

7) মার্শ স্যান্ডপাইপার (Marsh Sandpiper, *Tringa stagnatilis*) -মধ্য রাশিয়া থেকে ভারতে আসে।

8) রোজি প্যাস্টর (Rosy Pastor, *Sturnus roseus*) -পূর্ব ইউরোপ থেকে আসে।

9) হোয়াইট ওয়াগটেল (White Wagtail: বাংলা খঞ্জন, *Motacilla alba*)

12.6 সারাংশ

প্রাণী জগতের নানা প্রজাতির মধ্যে বছরের একটি নির্দিষ্ট সময়ে কতগুলো নির্দিষ্ট কারণের জন্য তাদের বাসস্থান ত্যাগ করে অনুকূল অন্য কোনও পরিবেশে বসবাসের জন্য চলে যাবার প্রবণতা দেখা যায় এই ধরণের প্রবণতা বা অভ্যাসকেই মূলত পরিযান বলা হয়। এসব ক্ষেত্রে পুনরায় একটি নির্দিষ্ট সময়ে পরিযায়ী প্রাণীরা তাদের পূর্বেকার বাসস্থানে ফিরেও যায়। পরিযান কোন একক প্রাণীর ব্যক্তিগত ভ্রমণ নয় - এটি একটি প্রজাতির গোষ্ঠীবদ্ধ আচরণের দৃষ্টান্ত।

মাছেরা মূলতঃ ডিম ছাড়ার জন্য, আহার্যের জন্য এবং প্রতিকূল অবস্থার হাত থেকে পরিত্রাণের জন্য পরিযান করে থাকে। স্বাদু জল থেকে ডিমপাড়ার জন্য নোনা জলে পরিযান (Catadromous migration) এবং নোনাজল থেকে ডিম পাড়ার জন্য স্বাদু জলে পরিযান (Anadromous migration) মাছের ক্ষেত্রে পরিযানের উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত। এছাড়া দূরসমুদ্র পরিযানও পরিলক্ষিত হয়। মাছেদের পরিযানের অন্যতম দুটি মূল বাধা হল দূষণ এবং বড় বড় বাঁধ।

প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রতিকূল অবস্থা থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যে মূল আবাসভূমি থেকে নির্দিষ্ট সময়ে নিয়মিত অন্যত্র গমন এবং স্বস্থানে বিশেষ সময়ে প্রত্যাবর্তনই হল পাখির পরিযান। ঋতুচক্রের বিভিন্ন সময়ে দিবালোকের হ্রাস-বৃদ্ধি, প্রজননের অবস্থা পরিযানের অন্যতম উদ্দীপক হিসাবে কাজ করে। সূর্য এবং রাত্রের নক্ষত্র পরিযানের পথ নির্দেশক হিসাবে কাজ করে বলে মনে করা হয়। রিঙ্গিং এবং ব্যান্ডিং পরীক্ষার দ্বারা পাখির পরিযান অনুসরণ করা সম্ভব।

12.7 প্রশ্নাবলী

1) সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন

a) পরিযান বলতে কি বোঝায়?

b) জলের প্রকৃতি অনুসারে মাছের পরিযানকে কিভাবে চিহ্নিত করা যায়?

c) একটি ভারতীয় মাছের স্বাদুজলে পরিযানের বর্ণনা দিন।

d) মাছেদের পরিযানের দুটি প্রধান মনুষ্যসৃষ্ট বাধার উল্লেখ করুন?

e) ভারতবর্ষে আগত 4টি পরিযায়ী পাখির উদাহরণ দিন।

f) ব্যান্ডিং পরীক্ষা কি?

g) পাখিদের পরিযানের ক্ষেত্রে উদ্দীপক হিসেবে কোন কারণগুলি কাজ করে?

2) তুলনা করুন

a) নোনাজল পরিযান ও স্বাদুজল পরিযান

b) স্রোত অনুকূল ও স্রোত প্রতিকূল পরিযান

c) বাহ্যিক উদ্দীপক ও আভ্যন্তরিক উদ্দীপক

d) স্থানিক পরিযান ও দেশান্তর পরিযান

3) শূন্যস্থান পূরণ করুন

a) স্বাদুজলে বসবাসকারী মাছেরা যখন ডিম ছাড়ার জন্যে সমুদ্রে পরিযান করে তখন সেই পরিযানকে ________ পরিযান বলে।

b) সেচ ইত্যাদি নানা কারণে নদীতে ________ হয়, যা মাছের ________ পর্বত প্রমাণ বাধা সৃষ্টি করে।

c) পরিযান প্রক্রিয়ার সর্বোচ্চ ধাপ ________ মধ্যেই দেখা যায়।

d) দীর্ঘতম পরিযায়ী পাখি হল সুমেরু অঞ্চলের ________ ।

4) দীর্ঘ উত্তর ভিত্তিক প্রশ্ন -

a) মাছেরা পরিযান করে কি কি কারণে?

b) জলের প্রকৃতি নির্ভর মাছের পরিযান উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

c) মানুষ কিভাবে মাছেদের পরিযানে বিঘ্ন সৃষ্টি করে তা বর্ণনা করুন।

d) পাখিদের পরিযানের মূল কথা কি? পাখির পরিযানের পথ নির্দেশিকা কি?

e) পাখিদের পরিযানের কারণ কি? পরিযানের সঠিকতা এবং ভিন্নতা সম্পর্কে আপনার ধারণা বিবৃত করুন।

f) ভারতবর্ষে আগত পরিযায়ী পাখিদের একটি তালিকা প্রস্তুত করুন।

12.8 উত্তরমালা

প্রশ্নাবলী - 1

a) 12.2

b) 12.3.2

c) 12.3.3

d) 12.4

e) 12.5.9

f) 12.5.8

g) 12.5.5

প্রশ্নাবলী - 2

a) 12.3.2

b) 12.3

c) 12.5.5

d) 12.5.7

প্রশ্নাবলী - 3

a) নোনাজল

b) বাঁধ, পরিযানে

c) পাখিদের

d) টার্ন

প্রশ্নাবলী - 4

a) 12.3.1

b) 12.3.3

c) 12.4

d) 12.5.1. এবং 12.5.4

e) 12.5.2, 12.5.6 এবং 12.5.7

f) 12.5.9

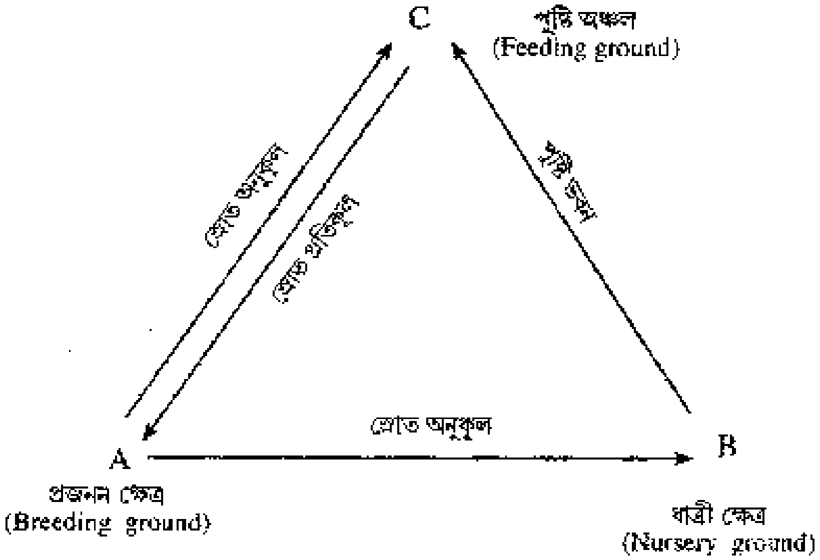

চিত্র নং 12.1 : ডিম ছাড়া শিশু মাছের খাদ্য অন্বেষণ বা ধাত্রীক্ষেত্রে স্রোত নির্ভর পরিযান।

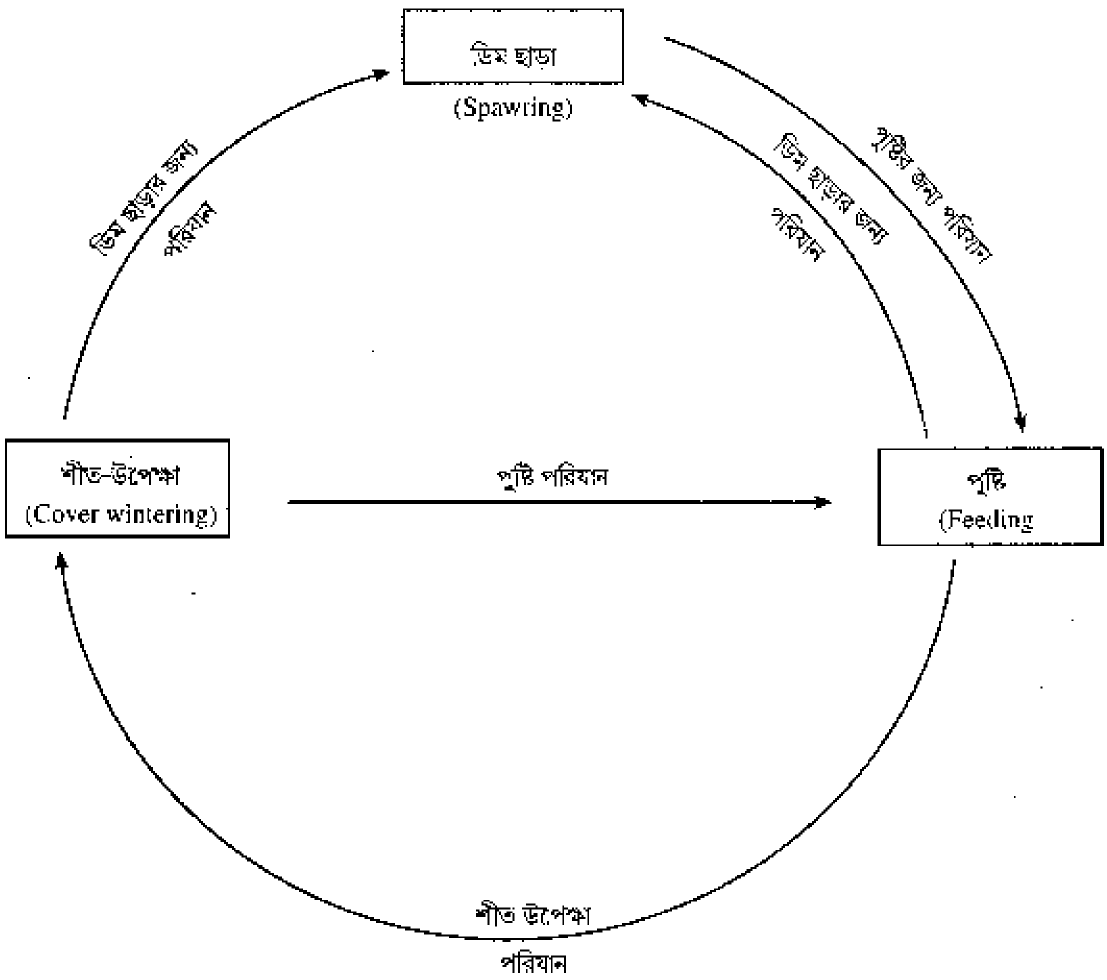

চিত্র নং 12.2 ঃ বিভিন্ন মাছের মধ্যে দৃষ্ট পরিযান চক্র।

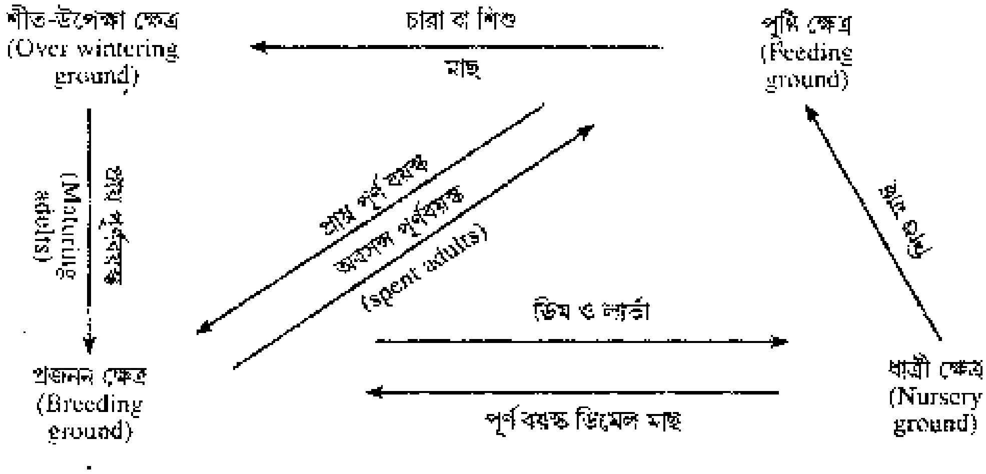

চিত্র নং 12.3 ঃ জীবনচক্রের বিভিন্ন দশা অনুযায়ী পরিযান।

একক 13 □ মৎস্য ও উভচর প্রাণীদের জনিতৃ যত্ন (Parental care in Fish and Amphibia)

গঠন

13.1 প্রস্তাবনা
উদ্দেশ্য
13.2 জনিতৃ যত্ন
13.3 মাছের জনিতৃ যত্ন
13.3.1 আঁতুড় ঘর তৈরী ও রক্ষণসংক্রান্ত জনিতৃ যত্ন
13.3.2 নিজদেহে ডিম এবং অপত্যদের বহন সংক্রান্ত জনিতৃ যত্ন
13.3.3 শাবক প্রসবকারী মাছেদের জনিতৃ যত্ন
13.4 হরমোন ও মাছেদের জনিতৃ যত্ন
13.5 উভচরের জনিতৃ যত্ন
13.5.1 ডিম ও ব্যাঙাচির ওপর নজর রাখা এবং তাদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা
13.5.2 অনুকূল পরিবেশে শাবকদের পরিবহন এবং নিজদেহে লার্ভাদের পরিবহন
13.5.3 আঁতুড়ঘর নির্মাণ ও রক্ষণ প্রণালী
13.5.4 ডিমের পরিবর্তে শাবক প্রসব
13.6 সারাংশ
13.7 প্রশ্নাবলী
13.8 উত্তরমালা

13.1 প্রস্তাবনা

স্তন্যপায়ীদের জনিতৃ যত্ন বা পিতামাতার অপত্য-দায়িত্ব সম্পর্কে আমাদের সকলেরই খানিকটা ধারণা আছে। বিশেষ করে মানুষের নিজের সন্তান সন্ততিদের প্রতি দায়িত্ব এবং প্রযত্নের নিদর্শনও সহজেই পরিলক্ষিত হয়। ক্রমবিবর্তনের ধারা অনুযায়ী মেরুদণ্ডীদের আবির্ভাব ঘটেছিল জলে এবং প্রথম পর্যায়ের মেরুদণ্ডীদের অন্যতম হল মাছ। পরবর্তী সময়ে স্থলবাসী প্রথম মেরুদণ্ডী হিসাবে উভচর শ্রেণীর উদ্ভব হয়। স্তন্যপায়ীদের মধ্যে আমরা যে জনিতৃ যত্নের বিভিন্ন দিকগুলো দেখতে পাই তার নিদর্শন এই দুই (মাছ এবং উভচর) আদিম প্রাণীগোষ্ঠীতেও আমরা লক্ষ করি এবং তা অনেকক্ষেত্রেই খুবই উল্লেখযোগ্য। এই ধরণের জনিতৃ যত্নের আচার-আচরণ এই সব প্রাণীগোষ্ঠীর অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনিতৃ যত্ন প্রাণীদের আচরণতত্ত্বের অন্তর্গত একটি বিষয়। প্রাণীদের বিবর্তনে জনিতৃযত্নের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি—

- জনিতৃ যত্নের উৎস ও বৈশিষ্ট্য বিবৃত করতে পারবেন।
- মৎস্য ও উভচর শ্রেণীর প্রাণীদের জনিতৃ যত্নের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করতে পারবেন।
- জনিতৃ যত্নে ক্ষেত্রে প্রজনন হরমোনের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

13.2 জনিতৃ যত্ন

প্রাণীজগতে অপত্যের প্রতি যত্ন একটি অতি স্বাভাবিক ঘটনা, বিশেষ করে স্তন্যপায়ীদের মধ্যে জনিতৃ যত্নের (Parental care) নিদর্শন খুবই উল্লেখযোগ্য এবং বৈচিত্রময়। জনিতৃযত্ন কিন্তু প্রাণীজগতের সাধারণ বা সার্বিক আচরণের মধ্যে পড়ে না, কেন না সব প্রজাতির মধ্যে জনিতৃ যত্নের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায় না। যে সব প্রজাতির মধ্যে সন্তান উৎপাদনের হার লক্ষণীয় ভাবে অনেক বেশি সেই সব প্রজাতিতে জনিতৃ-যত্নের বৈশিষ্ট্য প্রায়ই অনুপস্থিত আবার যে সব প্রজাতি বা প্রাণী গোষ্ঠীর মধ্যে সন্তান উৎপাদনের হার খুবই কম -জনিতৃ যত্নের বৈশিষ্ট্য তাদের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বেশী কারণ তা সেই প্রজাতির অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়।

ডিম অথবা শাবক স্বাবলম্বী হয়ে ওঠার আগে পর্যন্ত অপত্যের প্রতি জন্মদাতা পিতা-মাতার মধ্যে যে স্বাভাবিক এবং বংশগতিগত প্রযত্ন বা পরিচর্যার বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় তাকেই জনিতৃ যত্ন (Parental Care) বলা হয়।

ক্ষেত্র বিশেষে জন্মদাতা পিতামাতা ছাড়াও একই প্রজাতির অন্য পিতা-মাতা, অথবা ভিন্ন প্রজাতির পিতা-মাতাও তার নিজের অপত্য ছাড়া অন্যের অপত্যকে পালন করে থাকে- এই ধরণের আচরণকে বলা হয় ধাত্রী যত্ন (alloparental care)। এক কথায় জনিতৃযত্ন একটি পরার্থমূলক (altruistic) আচরণ - যা প্রজনন কালে অথবা প্রজনন উত্তরকালে পরিলক্ষিত হয় এবং এটিকে আচরণতত্ত্বের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়ে থাকে। অপত্যের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে জনিতৃ পিতামাতা নিজেদের বঞ্চিত করেও তাদের সময় এবং জীবনীশক্তি অপত্যের জন্য অকাতরে উৎসর্গ করে – এটাই এই ধরনের পরার্থমূলক আচরণতত্ত্বের মূল বৈশিষ্ট্য।

বাস্তুতত্ত্ববিদরা লক্ষ করে দেখেছেন যে যেসব প্রজাতি কোন স্থায়ী পরিবেশে (stable environment) বসবাস করে তাদের দেহের আকার বড় হয়। দেহের বৃদ্ধির হার মন্থর হয়, জীবনকাল দীর্ঘ হয় এবং অপত্যের জন্মের সময়ের মধ্যে ব্যবধান থাকে, বৈজ্ঞানিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় **ইটেরোপ্যারেটি** (Iteroparity। তেমনই আবার যখন কোন প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে যখন একসঙ্গে অনেক অপত্যের জন্ম হয় তখন তাকে বলা হয় *সিমেলপ্যারেটি* (Semelparity)। স্থায়ী পরিবেশে বসবাসকারী প্রাণীদের মধ্যে শাবক বা অপত্যের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে অনেক কম হয়, **সেইজন্যেই জনিতৃ যত্ন অনেক বেশী পরিলক্ষিত হয়** এবং অপত্যের মৃত্যুহারও কম হয়। এই ধরনের প্রজাতিদের বলা হয় K- নির্বাচিত (K-selected) কেননা এই সব প্রজাতির মোট জনসংখ্যা K অর্থাৎ পরিবেশের ধারণ ক্ষমতা (Carrying capacity) কাছাকাছি হয়। অপর পক্ষে যে সমস্ত প্রাণী পরিবর্তনশীল পরিবেশে (fluctuating enviornment) বসবাস করে তাদের মধ্যে প্রজননের হার (Reproductive rate) এবং অপত্যের সংখ্যা অনেক বেশী হয়, দেহের আকার প্রায়শই ছোট হয়। এ সব ক্ষেত্রে জনিতৃ যত্ন অনেক কম

পরিলক্ষিত হয় এবং মৃত্যুর হারও হয় বেশী। এই ধরণের প্রজাতিদের বলা হয় r- নির্বাচিত (r-selected) যেখানে বস্তুতে বোঝায় কোন প্রজাতির প্রজননের হার।

জনিতৃ যত্নের ক্ষেত্রে পিতামাতার কে কতটা সক্রিয় অথবা নিষ্ক্রিয় থাকবে তা নির্ভর করে প্রজনন সংক্রান্ত কতগুলি বৈশিষ্ট্যের উপর। নিচে বৈশিষ্টগুলি ও তার ফলাফল উল্লেখ করা হল ঃ

বৈশিষ্ট্য	জনিতৃ-যত্নদাতা
★ অন্তঃনিষেক ★ সঙ্গম উপযোগী স্ত্রী সঙ্গীর প্রাচুর্য ★ দীর্ঘায়িত প্রজনন ঋতু	মাতা
★ অন্তঃ নিষেক ★ সঙ্গম উপযোগী স্ত্রী সঙ্গীর অপ্রতুলতা ★ সংক্ষিপ্ত প্রজনন ঋতু ★ শাবকদের খাদ্য সরবরাহ	মাতা এবং পিতা উভয়ে।
★ বহিঃনিষেক	পিতা বা পিতা-মাতা উভয়েই ।

অন্তঃনিষেকের ক্ষেত্রে মাতাই মূল জনিতৃ যত্ন দাতা। অন্তঃনিষেকের দ্বারা প্রসূত ডিম বা শাবকের প্রতি-পিতার তেমন কোন দায়িত্ব বিশেষভাবে লক্ষ করা যায় না; তবে প্রজনন ঋতুকাল সংক্ষিপ্ত হলে এবং সঙ্গম উপযোগী স্ত্রী সঙ্গীর প্রাচুর্য না থাকলে পিতাকে কোন কোন ক্ষেত্রে মাতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করতে দেখা যায়। বহিঃনিষেকের ক্ষেত্রে বেশির ভাগ সময়ে পিতাই মূল জনিতৃযত্ন দাতা। জনিতৃ যত্নের বিভিন্নদিক সম্পর্কে এখনও অনেক কিছুই আমাদের অজানা।

তবে জনিতৃ যত্নের সঙ্গে প্রাকৃতিক নির্বাচনের (Natural selection) সম্পর্ক অত্যন্ত গভীর। জনিতৃযত্নের মত পরার্থমূলক কাজ (Altruistic act.) কেবলমাত্র তখনই প্রাকৃতিক নির্বাচনের আনুকুল্য লাভ করবে যখন -

a) পরার্থমূলক আচরণের ফলে জীবন সংগ্রামে (struggle for existence) দাতার যোগ্যতা যতটা হ্রাস পাবে তারচেয়ে গ্রহীতার যোগ্যতা বৃদ্ধি পাবে অনেক বেশী পরিমাণে অথবা

b) এই ধরণের আচরণের ফলে দাতা বা গ্রহীতা কাউকেই খুব বেশী মূল্য দিতে হবে না।

13.3 মাছের জনিতৃ যত্ন

অধিকাংশ মাছেদের সন্তান উৎপাদনের প্রারম্ভিক হার উল্লেখযোগ্যভাবে এতই বেশি যে বেশির ভাগ প্রজাতির তেমন কোন জনিতৃ যত্নের প্রয়োজন হয় না। তবে কিছু কিছু প্রাজতির মধ্যে জনিতৃ-যত্নের বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়।

এই সব প্রজাতির মাছেরা মূলতঃ প্রতিকূল পরিবেশে বসবাস করে এবং এদের সন্তান উৎপাদনের প্রারম্ভিক হার অন্যদের তুলনায় খুবই কম। বহিঃনিষেকযুক্ত প্রজাতির ক্ষেত্রে পিতা-মাতা উভয়ে অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে পিতাই মূল জনিতৃ-যত্ন দাতা হিসাবে দায়িত্ব পালন করে। মাছেদের জনিতৃ-যত্নের কতগুলি উল্লেখযোগ্য তথ্য নিচে উল্লেখ করা হল ঃ

13.3.1 আঁতুড় ঘর তৈরী ও রক্ষণ সংক্রান্ত জনিতৃ যত্ন ঃ

a) ডার্টার (*Etheostoma* spp.) সানফিস্ (*Mola* spp.) এবং সি চাইল্ড (*Etroplus* spp.) পুরুষ মাছেরা জলের নিচে পাথরের নুড়ি সরিয়ে অগভীর ছোটো ছোটো আঁতুড় ঘর বানায়। বাসাগুলিতে স্ত্রী-মাছেরা ডিম পাড়ে। পুরুষ মাছ ডিমগুলিকে নিষিক্ত করে এবং ডিম ফোটার আগে পর্যন্ত পাহারা দেয়।

b) আফ্রিকার এবং দক্ষিণ আমেরিকার ফুসফুস মাছ (Lung fish) গভীর গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে, পুরুষেরা সারাক্ষণ আঁতুড়ঘরের চারদিকে চরকির মতো সাঁতার কেটে ডিমগুলোকে প্রচুর অক্সিজেন যুক্ত জল সরবরাহ করে এবং খাদকের হাত থেকে রক্ষা করে।

c) পুরুষ বোফিন (*Amia* sp.) মাছ জলজ আগাছা দিয়ে ছোটো গোলাকার বাসা বানায়। স্ত্রীমাছ ডিম পেড়ে গোলাকার বাসা বানায়। স্ত্রীমাছ ডিম পেড়ে চলে যায়; কিন্তু পুরুষ মাছ সারাক্ষণ সন্তানদের রক্ষনাবেক্ষণ করে।

d) তিনটে কাঁটাওয়ালা পুরুষ স্টিকলব্যাক (*Gasterosteus* sp.) জলজ আগাছা দিয়ে বাসা বানায়। পরে বাসার মধ্যে একটা ছোট সুড়ঙ্গ তৈরী করে এবং তারপরে ডিম পাড়ার জন্য একের পর এক স্ত্রী মাছদের ডেকে আনে। পুরুষ মাছটি ডিমগুলোকে নিষিক্ত করে এবং ডিম পাড়ার পর সমস্ত স্ত্রীমাছ চলে যায়। পুরুষ মাছটি কিন্তু বাচ্চা বড় না হওয়া পর্যন্ত বাসা পরিত্যাগ করে যায় না।

e) লড়াকু মাছ বেলটা (*Belta* sp.) অথবা ম্যাক্রোপোডাস (*Macropodus* sp.) মাছেদের ক্ষেত্রে এক ধরনের বুদ্-বুদ্ এবং শ্লেষ্মার আঁতুড় ঘর দেখা যায়। পুরুষ মাছ মুখ থেকে এক ধরনের বুদ্—বুদ্ বের করে এবং শ্লেষ্মা দিয়ে বুদ্-বুদ্ গুলো একসঙ্গে জুড়ে বাসা বানায়। স্ত্রী মাছ ডিম পাড়ার পর পুরুষ মাছ ডিমগুলোকে নিষিক্ত করে এবং মুখে করে এক একটি ডিম ভাসমান বুদবুদের বাসার নিচে আটকে রাখে। স্ত্রী এবং পুরুষ মাছ দু'জনেই ডিমগুলো পাহারা দেয়।

f) মাগুর, শিঙি প্রভৃতি জিওল মাছ পুকুর পাড়ে অগভীর জলের নিচে গর্তের মধ্যে ডিম পাড়ে, বাচ্চাগুলো যথেষ্ট বড় না হওয়া পর্যন্ত গর্ত ছেড়ে বাইরে আসে না।

g) রোডিয়াস (*Rhodeus* sp.) বাসা বানায় না, কিন্তু পরিত্যক্ত শামুকের মধ্যে ডিম পাড়ে পুরুষ মাছ ডিমগুলির পরিচর্যা করে।

13.3.2 নিজদেহে ডিম এবং অপত্যদের বহন সংক্রান্ত জনিতৃ যত্ন ঃ

a) আফ্রিকার স্ত্রী সি-চাইল্ড (Sea-child) মাছ ডিম নিজের মুখের মধ্যে বয়ে বেড়ায়। পুরুষ মাছ ডিমগুলোকে মুখের মধ্যেই নিষিক্ত করে, এবং স্ত্রী মাছের চারদিকে চক্রাকারে ঘুরে বেড়ায়। স্ত্রী তিলাপিয়া

(*Oreochromis* sp.) মাছ মুখের মধ্যে বাচ্চাদের লালন পালন করে। অরিয়াস (*Arius* spp.) নামের পুরুষ জিওল মাছ মুখের মধ্যে বাচ্চাদের নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

b) ব্রাজিলের জিওল মাছ প্লাসটিসকাস (*Platysiacus* sp.) -এর ক্ষেত্রে এক অসাধারণ পদ্ধতি লক্ষ করা যায় প্রজনন ঋতুর সময় স্ত্রী মাছের পেটের নিচের দিকটা নরম -আঠালো হয়ে উঠে। নিষিক্ত ডিম গুলো বোঁটার মতো ছোটো খোটো অংশ দিয়ে পেটের নিচে আটকে থাকে, এবং ডিম ফোটার আগে পর্যন্ত একই অবস্থায় থাকে। ফোলিস (*Pholis* sp.) মাছের ক্ষেত্রে ডিমগুলো একসঙ্গে দলা পাকিয়ে বলের মতো হয়ে যায় এবং এই রকম ডিমের দলাকে পুরুষ মাছ পাহারা দেয়। পাইপ মাছ (*Syngnathes* sp.) এবং সি-হর্স (*Sea-Horse, Hippocampus* sp.) এর পুরুষ মাছের দেহে এক ধরনের আঁতুড় থলি (Brood pouch) দেখা যায়। স্ত্রী মাছ নিষিক্ত ডিম গুলো পুরুষ মাছের আঁতুড় থলিতে জমায়। ডিম ফোটার আগে পর্যন্ত পুরুষ মাছ থলির মধ্যে ডিম গুলো রক্ষনাবেক্ষণ করে।

13.3.3 শাবক প্রসবকারী (Viviparous) মাছেদের জনিতৃ যত্ন ঃ

বাচ্চা প্রসবকারী মাছেদের মধ্যে জনিতৃ যত্ন পরিপূর্ণভাবে দেখা যায় কনড্রিইকথেস (Chondrichthyes) সাইপ্রিনোডনটিডি (Cyprinodontidae) এনাব্লেপিডি (Anablepidae) প্রভৃতি গোষ্ঠীর মাছেদের শাবক প্রসবকারী প্রজাতির শরীরে কুসুমথলিযুক্ত ছদ্ম অমরাতে (Pseudo placanta) নিষিক্ত ডিমগুলো পুষ্ট হয়, এবং পরে পরিপূর্ণ শাবক হিসাবে প্রসব হয়।

মাছের জনিতৃ যত্ন মূলতঃ খাদকের হাত থেকে সন্তানকে রক্ষা করার মধ্যে সীমাবদ্ধ, খাদ্য সরবরাহের ঘটনা সচরাচর লক্ষ করা যায় না।

13.4 হরমোন (Hormone) ও মাছের জনিতৃ যত্ন

প্রজননের জন্য দায়ী হরমোনই জনিতৃ যত্নের কারণ হিসাবে মনে করা হয়। প্রজননের পরেও প্রজনন হরমোন সক্রিয় থাকলে জনিতৃ যত্নের বিভিন্ন আচার-আচরণ মাছেদের মধ্যে লক্ষ করা যায়। বাসস্থানের অনুসন্ধান এবং এলাকা চিহ্নিতকরণ (Territoriality), আঁতুড়ঘর তৈরী, পূর্বরাগ, বা ডিমপাড়া প্রভৃতি আচার-আচরণ পিটুইটারি এবং জনন গ্রন্থির ক্ষরণের দ্বারা অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয় এবং প্রজনন হরমোন নিষ্ক্রিয় হলে এই ধরণের আবরণ বিঘ্নিত হয়। একই ভাবে স্টিকিলব্যাক মাছের ডিমে হাওয়া দেওয়ার মতো জনিতৃ যত্নও প্রজনন হরমোন নিষ্ক্রিয় হলে বন্ধ হয়ে যায়।

13.5 উভচরের জনিতৃ-যত্ন

উভচর শ্রেণীর অধিকাংশ প্রজাতিই বহিঃনিষেক হয়, ফলে পিতার জনিতৃ যত্নই বেশী লক্ষ করা যায়। উভচরের জনিতৃ যত্ন মূলতঃ মাছের মতো সন্তানদের প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং খাদকের হাত থেকে রক্ষা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ। শাবককে খাদ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে কোন আচরণগত বৈশিষ্ট্য সচরাচর লক্ষ করা যায় না। মোটামুটিভাবে, উভচর শ্রেণীর জনিতৃ যত্ন সংক্রান্ত আচরণকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে ভাগ করতে পারি —

1) ডিম ও ব্যাঙাচির ওপর নজর রাখা এবং তাদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা।

2) অনুকূল পরিবেশে শাবকদের পরিবহন এবং নিজের দেহে ডিম ও লার্ভাদের বহন করা।

3) বাসা ও আঁতুড় ঘর (nests and nurseries) নির্মাণ ও রক্ষা করা।

4) ডিমের পরিবর্তে শাবক প্রসব।

13.5.1 ডিম ও ব্যাঙাচির ওপর নজর রাখা এবং তাদের শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করা —

যে সব প্রজাতি জলে ডিম পাড়ে, তাদের অনেকেই হয় ডিমের উপর অবস্থান করে অথবা কাছাকাছি থেকে নিষিক্ত ডিম খাদকের হাত থেকে রক্ষা করে। স্থলবাসীদের মধ্যে অনেক প্রজাতিই সরাসরি পরিস্ফুরিত ডিম পাড়ে এবং নিষ্ঠার সঙ্গে ডিমগুলো রক্ষা করে। ডিমের পরিশোষণ (জলের অভাব জনিত শুকিয়ে যাওয়ার সমস্যা) সমস্যার সমাধান ছাড়াও খাদকের হাত থেকে ডিম এবং শাবককে অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে রক্ষণা বেক্ষণ করে। আফ্রিকার পুরুষ বুলফ্রগ্ (Bull frog) নিষিক্ত ডিম খাদকের হাত থেকে রক্ষার জন্য দিনরাত অতন্দ্র পাহারায় থাকে। ডিম ব্যাঙাচিতে রূপান্তরিত হবার পরেও শাবকদের পাহারা দেয়, প্রয়োজেন অনুকূল অন্য জলাশয়ে পাহারা দিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজও করে। আমেরিকার গ্রীষ্ম প্রধান অঞ্চলের ব্যাঙ লেপ্টোডাকটাইলাস প্রজাতির (*Leptodactylus* sp.) বাচ্চারা সবসময় মায়ের কাছাকাছি থাকে। পূর্ণাঙ্গ লেপ্টোডাকটাইলাস আকারে অনেক বড় তাই সহজে বড় আকারের খাদক প্রতিহত করতে পারে। অ্যামফিউমা (*Amphiuma* sp.) এবং ইথিওফিস (Ichthyophis) (চিত্র 1c) তাদের দেহের দ্বারা ডিমগুলোকে কুণ্ডলী আকারে জড়িয়ে শত্রুর হাত থেকে রক্ষা করে। শুধু শত্রুর হাত থেকে রক্ষাই নয় প্রোটিয়াস গণের (Proteus) অন্তর্গত কোন কোন প্রজাতির পিতা এবং মাতা উভয়েই তাদের লেজ নাড়িয়ে জলের স্রোত তৈরী করে ডিমের দিকে বইয়ে দেয় যাতে ডিমগুলো শুকনো হয়ে না যায়। বিভিন্ন উপায়ে জলস্রোত প্রবাহিত করার চেষ্টা নেকচুরাসের (*Necturus* sp.) মধ্যেও পরিলক্ষিত হয়। সেন্ট্রোলেনেল্লা (*Centrolenella* sp.) প্রজাতির ব্যাঙের পাতার মধ্যে ডিম পাড়ে। এক ধরনের বোল্লতা (Wasp) জাতীয় পতঙ্গ এদের ডিম খেয়ে ফেলে। তাই এদের পুরুষ ব্যাঙেরা সর্বক্ষণ ডিম গুলোকে পাহারা দেয় (চিত্র 1b)।

13.5.2 অনুকূল পরিবেশে শাবকদের পরিবহন এবং নিজদেহে ডিম ও লার্ভাদের বহন —

আমেরিকার গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলের বিষাক্ত গুটিওয়ালা ব্যাঙেরা ডাঙায় ডিম পাড়ে, পরে নিষিক্ত ডিম ফুটে ব্যাঙাচি বেরিয়ে এলে, একের পর এক শাবকদের জলাশয়ে বয়ে নিয়ে আসে (চিত্র)। পানামার ব্যাঙের ব্যাঙাচিরা খাদ্যগ্রহণে অভ্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও মা ব্যাঙ প্রতিকূল অবস্থা থেকে ব্যাঙাচিদের অনুকূল পরিস্থিতি যুক্ত জলাশয়ে পরিবহণ করে নিয়ে যায়। ডেনড্রোবেটিস (Dendrobates) এবং ফাইলোবেটিস (Phyllobates) নামের বিষাক্ত গুটিওয়ালা ব্যাঙেরা প্রথমে ডাঙায় জন্মানো ব্যাঙাচিদের জলাশয়ে পৃষ্ঠদেশের সাহায্যে বহন করে নিয়ে যায়, পরে নিজের অনিষিক্ত ডিম ব্যাঙাচীদের খাদ্য হিসাবে যোগান দেয় (চিত্র -1d)।

বেশকিছু ব্যাঙ ডিম এবং লার্ভার ওপর নজরদারি এবং পরিবহন ছাড়াও নিজের শরীরের বিভিন্ন অংশে নিষিক্ত ডিম বয়ে নিয়ে বেড়ায় এবং শরীরের এইসব অংশেই ডিমের রূপান্তর ঘটে। এক কথায় ব্যাঙের শরীরের বিভিন্ন অংশকে এক ধরনের আঁতুড় ঘর হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

ইউরোপের অ্যালাইটিস (*Alytes obstetricans*) নামের ব্যাঙকে ধাত্রী ব্যাঙ বলা হয়। এদের পুরুষ ব্যাঙ এক ধরণের আঠার মত বস্তু দিয়ে নিষিক্ত ডিমগুলোকে মালার মত করে পশ্চাৎপদের মধ্যে আটকে নেয়। ডিমগুলো রূপান্তরিত হবার আগে পর্যন্ত একই ভাবে থাকে (চিত্র 1i)।

চিলির রাইনোডারমা ব্যাঙের (*Rhinoderma darwinii*) পুরুষেরা নিষিক্ত ডিম গুলো নিজের স্বরথলির মধ্যে গিলে ফেলে পরিবর্তিত স্বরথলিকে বলে গুলার পাউচ (Gular pouch)। এই স্বরথলির মধ্যেই ডিমের পরিস্ফুরণ এবং রূপান্তর হয়, অবশেষে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ বেরিয়ে আসে। এই স্বরথলির আকার এতই বড় যে, নিচের দিকে কোমরের অংশ পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে (চিত্র 2h)। গ্যাসট্রোথিকা (Gastrotheca *sp.*) নামের মারসুপিয়াল ব্যাঙ (Marsupial frog) এবং নোটট্রিমা (*Nototrema* sp.) নামের ব্যাঙেদের মধ্যে প্রজনন ঋতুতে স্ত্রীব্যাঙের পৃষ্ঠদেশে এক ধরনের চামড়ার থলি (Pouch) সৃষ্টি হয়। রূপান্তর না হওয়া পর্যন্ত ডিম গুলো ওই থলিতে সংরক্ষিত হয়। ক্রিপটোব্যাট্রাকাস (*cryptobatrachus* sp.) এবং পাইপা পাইপা (Pipa pipa) পৃষ্ঠদেশে অনেকগুলো ছোট ছোট গর্তের সৃষ্টি হয় (চিত্র 1f)। এর মধ্যেই তারা ডিমগুলোকে সংরক্ষণ করে। প্রজনন ঋতুতে পাইপা ডরসিজেরা (Pipa dorsigera) নামের স্ত্রীব্যাঙের পৃষ্ঠদেশে অত্যন্ত নরম এবং স্পঞ্জের মত ছোট ছোট ঢাকনা যুক্ত (operculum) গহ্বরের সৃষ্টি হয়। রক্তজালক সমন্বিত সেই সব গহ্বর অনেকটা ছদ্ম অমরার (Pseudo placenta) মত কাজ করে। এই গর্তের গুলোর মধ্যেই ডিমের পরিপোষণ, পরিস্ফুরণ, ব্যাঙাচিতে রূপান্তর ঘটে (চিত্র 1jk)। অস্ট্রেলিয়ার ব্যাঙ রিওব্যাট্রাকাস (*Rheobatrachus* sp.) এর স্ত্রী ব্যাঙেরা নিষিক্ত ডিম গিলে ফেলে পাকস্থলীতে রাখে, এবং পরবর্তীকালে রূপান্তরের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙ সরাসরি মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। ডেসমগনেথাস (Desmognathus *sp.*) নামে সালামাণ্ডার গলার উপর নিষিক্ত ডিম আটকে ঘুরে বেড়ায় (চিত্র 1g) কিছু আফ্রিকার ব্যাঙ ডিম্বনালীর মধ্যে নিষিক্ত ডিম ধরে রাখে; এখানেই পূর্ণাঙ্গ ব্যাঙের রূপান্তর হয়, এবং অনুকূল পরিবেশে শরীর ছেড়ে বেরিয়ে আসে।

13.5.3 আঁতুড় ঘর নির্মাণ ও রক্ষণ প্রণালী —

নিজের শরীরের বিভিন্ন অংশকে এক ধরণের আঁতুড় ঘর হিসাবে ব্যবহার করা ছাড়াও, প্রাকৃতিক নানান বস্তুর সাহায্যে আঁতুড় ঘর তৈরী করে ডিম এবং বাচ্চাকে জনিতৃ যত্ন দানের ঘটনাও লক্ষ করা যায়। এদের কয়েকটি উদাহরণ নিচে দেওয়া হল ঃ

1) হাইলা নামে এক ধরণের ব্যাঙ (*Hyla faber*) জলাশয়ের ধারে মৃত্তিকার মধ্যে গর্ত নির্মাণ করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে (চিত্র 1a)।

2) গেছো ব্যাঙ র‍্যাকোফোরাস (*Rhacophorus* sp.) কোন জলাশয়ের কাছে অথবা ধান ক্ষেতের কাছে গর্ত করে এবং তার মধ্যে পায়ুদেশ থেকে এক ধরণের ফেনা জাতীয় পদার্থ নিঃসরণ করে তারপরে ডিম ছাড়ে (চিত্র 1c) । এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার জলাশয়ের উপর ঝুলে থাকা কোন গাছের শাখায় যে পাতা থাকে তাই দিয়ে বাসা তৈরী করে।

3) দক্ষিণ আমেরিকার ফাইলো মেডুসা (*Phyllomedusa* sp.) জলজ আগাছার পাতা দিয়ে এক ধরণের বাসা তৈরী করে তার মধ্যে ডিমকে সুরক্ষিত রাখে।

4) কোন কোন স্যালামাণ্ডার (Salamandrella) জিলেটিন জাতীয় একধরণের জিনিষ দিয়ে থলি তৈরী করে যেটাকে সে জলের নীচে কোন কিছুর সঙ্গে আটকে রাখে। এই থলির মধ্যে তারা ডিম পাড়ে।

5) ট্রাইটন (Triton) নামের স্যালামান্ডার পাথরের নীচে অথবা কোন গাছের কাণ্ডের নীচে ডিম পাড়ে কখনও কখনও তারা আবার গাছের ছোট ছোট ডাল এক সঙ্গে জুড়ে ডিম পাড়ার জায়গা তৈরী করে।

13.5.4 ডিমের পরিবর্তে শাবক প্রসব —

স্যালামান্ডার গোত্রের কোন কোন প্রজাতিকে (*Salamandra maculosa* এবং *Salmandra atra*) আমরা শাবক প্রসবকারী (Viviparous) বলতে পারি। এরা এক বিচিত্র পদ্ধতিতে ডিম এবং লার্ভাদের রক্ষা করে। স্ত্রী ব্যাঙ তাদের ডিম্বনালীর মধ্যে ডিমগুলো রেখে দেয়। সেইখানেই ডিম পরিস্ফুরিত হয় এবং তাদের রূপান্তর ঘটে।

উভচর গোষ্ঠীর প্রাণীরা বিভিন্ন ধরণের বিচিত্র সব প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তাদের ডিম এবং শাবকদের রক্ষা করার চেষ্টা করে। জনিতৃ যত্নের বহুদিকই আমাদের এখনও অজানা। তবে মাছেদের মতই এদের জনিতৃ যত্নও প্রজননের সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন হরমোনের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ার ফল বলে মনে করা হয়।

13.6 সারাংশ

জনিতৃ যত্ন এক ধরণের পরার্থমূলক আচরণ (altruistic behaviour)। জনিতৃ পিতা-মাতা সন্তান স্বাবলম্বী হওয়ার আগে পর্যন্ত জনিতৃ-যত্ন দান করে। যে সব প্রজাতির সন্তান উৎপাদনের হার কম এবং প্রতিকূল পরিস্থিতিতে বসবাস করতে হয়, সেই সব প্রজাতিতেই জনিতৃ যত্ন সাধারণ ভাবে দেখা যায়। অন্তঃনিষেক, সঙ্গম উপযোগী স্ত্রী সঙ্গীর প্রাচুর্য, প্রজনন ঋতু দীর্ঘায়িত হলে, মাতাই মূল জনিতৃযত্ন দাতা হয়। আবার অন্তঃনিষেক ছাড়াও, সঙ্গম উপযোগী সঙ্গীর অপ্রতুলতা, সংক্ষিপ্ত প্রজনন ঋতু প্রভৃতি কারণের জন্য, পিতা-মাতা উভয়েই জনিতৃ যত্ন দাতা হতে পারে। বহিঃনিষেকের ক্ষেত্রে পিতা বা পিতা-মাতা উভয়েই জনিতৃ যত্নদাতা হয়ে থাকে। মাছ এবং উভচরেদের বহিঃনিষেক হওয়ায়, পিতা ছাড়াও কোন কোন ক্ষেত্রে পিতা-মাতা দুজনেই জনিতৃ-যত্নদাতার দায়িত্ব পালন করে। ডিম ও সন্তানদের প্রতিকূল পরিস্থিতি এবং খাদকের হাত থেকে রক্ষাই এদের মূল দায়িত্ব। শাবকদের খাদ্য সরবরাহের তেমন কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না।

মাছ ও উভচর প্রাণীদের জনিতৃ যত্ন সম্পর্কিত আচরণের মধ্যে কতগুলো সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন নানা ধরনের বাসা বা আঁতুড় ঘর তৈরী করা, দেহের বিভিন্ন অংশকে ডিম এবং শাবকদের রক্ষণ ও প্রতিপালনের জন্য ব্যবহার করা, শাবকদের অনুকূল স্থানে পরিবহন করা, ডিমের বদলে শাবক প্রসব ইত্যাদি মাছ এবং উভচর উভয়ক্ষেত্রেই প্রজনন হরমোনই জনিতৃ যত্নের ব্যপারে প্রধান ভূমিকা পালন করে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে জনিতৃ যত্নের অনেক কিছুই আমাদের এখনও অজানা।

13.7 প্রশ্নাবলী

1. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

a) জনিতৃ যত্ন বলতে কি বোঝায় ?

b) জনিতৃ যত্নকে কেন পরার্থমূলক আচরণ (altruistic behaviour) বলা হয় ?

c) কোন ধরনের প্রজাতিকে K- নির্বাচিত (K-selected) এবং কোন ধরনের প্রজাতিকে r নির্বাচিত বলা হয়?

d) শাবক প্রসবকারী (viviparous) মাছেদের জনিতৃ যত্ন কি রকম হয়?

e) মাছেদের জনিতৃ যত্নের ক্ষেত্রে হরমোনের কোন ভূমিকা আছে কি ?

f) উভচর শ্রেণীর জনিতৃ যত্নে কি কি মূল বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় ?

g) উভচর শ্রেণীর অন্তর্গত প্রাণীদের আঁতুড়ঘর তৈরী সংক্রান্ত জনিতৃ যত্নের কয়েকটি উদাহরণ দিন।

h) মাছেদের আঁতুড় ঘর তৈরী সংক্রান্ত জনিতৃ যত্নের তিনটি করে উদাহরণ দিন।

2. শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

a) প্রজনন ঋতু দীর্ঘায়িত হলে ________________ হয় জনিতৃ যত্ন দাতা।

b) কনড্রিকথেস গোষ্ঠীর শাবক প্রসবকারী মাছেদের মধ্যে কুসুমথলি যুক্ত ________________ দেখা যায়।

c) অধিকাংশ মাছেদের মধ্যে ________________ নিষেক দেখা যায়।

d) ________________ জন্য দায়ী হরমোনই জনিতৃ যত্নের কারন।

e) ________________ গণের স্ত্রী ব্যাঙেরা নিষিক্ত ডিমগুলোকে গিলে ফেলে পাকস্থলীতে রাখে।

f) স্যালমাণ্ডার গোত্রের কিছু কিছু প্রাণীর জনিতৃ যত্নকে আমরা ________________ জনিতৃ যত্ন বলতে পারি।

3. তুলনা করুন ঃ

a) ধাত্রী যত্ন ও জনিতৃ যত্ন

b) ইটেরোপ্যারিটি ও সিমেলপ্যারিটি

c) শাবক প্রসবকারী মাছ ও শাবক প্রসবকারী উভচর

d) অন্তঃনিষেক বৈশিষ্ট্যযুক্ত প্রাণীদের জনিতৃ যত্ন ও বহিঃনিষেক বৈশিষ্ট্যপ্রাণীদের জনিতৃ যত্ন।

4. দীর্ঘ উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

a) মাছেদের জনিতৃ যত্নের বিভিন্নদিক উদাহরণ সহযোগে বিবৃত করুন।

b) উভচর শ্রেণীর কোন কোন প্রজাতি কিভাবে অনুকূল পরিবেশে শাবকদের বহন করে এবং নিজেদের দেহে ডিম ও লার্ভাদের প্রতিপালন করে তা বর্ণনা করুন।

c) জনিতৃ যত্নের উৎস ও বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

13.8 উত্তরমালা

অনুশীলনী - 1

a) — 13.1

b) — 13.1

c) — 13.1

d) — 13.3.3

e) — 13.4

f) — 13.5

g) — 13.5.3

h) — 13.3.1

অনুশীলনী - 2

a) — মাতা

b) — ছদ্ম-অমরা

c) — বহিঃ

d) — প্রজননের

e) — রিওব্যাট্রাকাস

f) — শাবক প্রসবকারী

অনুশীলনী - 3

a) — 13.1

b) — 13.1

c) — 13.3.3 এবং 13.5.4

d) — 13.1

অনুশীলনী - 4

a) — 13.3

b) — 13.5.2

c) — 13.1

a

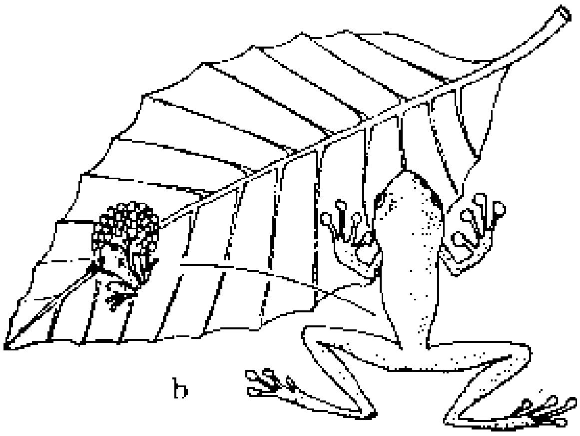

b

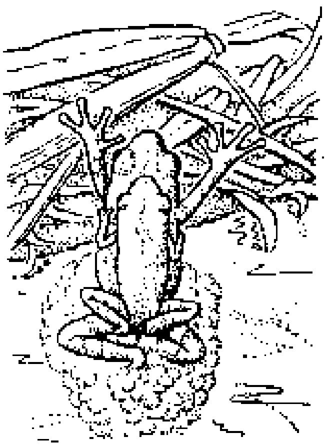

c

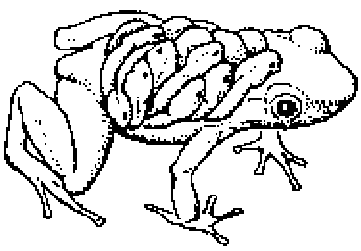

d

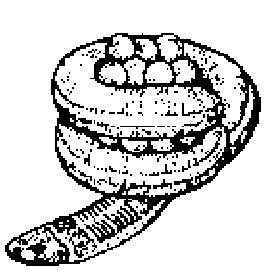

e

f

g

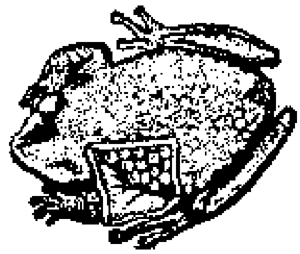

h

i

j

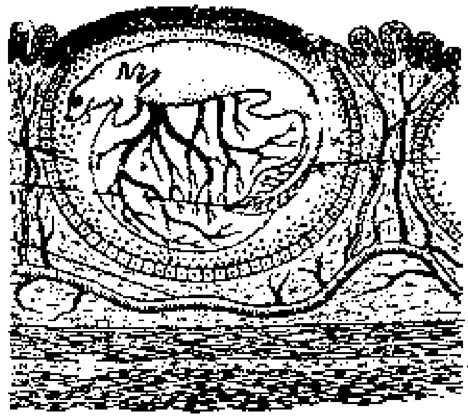

k

চিত্র নং -13.1 ঃ উভচরের জনিতৃযত্ন। (a) - হাইলার কাদায় আঁতুড় ঘর, (b) - পাতার উপর সেন্ট্রোলেনেল্লার ডিম ও পুরুষ ব্যাঙের পাহারা, (c) - এক জোড়া র‍্যাকো ফোরাস ও ফেনার মধ্যে ডিম প্রসব ; (d) - ডেনড্রোবেটিসের পিঠের উপর ব্যাঙাচী পরিবহন (e) - কুণ্ডলির মধ্যে ইকথিওফিসের ডিম, (f) - ক্রিপটোবাট্রাচাসের পিঠের আঁতুড়থলি। (g) - ডেসমগনাথাস স্যালামাণ্ডারের গলায় ডিমের গুচ্ছ ; (h) - রাইনোডার্মার স্বরথলির মধ্যে ডিম ; (i) - অ্যালাইটেসের কোমরে ডিমের গুচ্ছ, (j) - পাইপার পিঠের উপর আঁতুড় থলি। (k) - পাইপার পিঠের উপর আঁতুড়থলির মধ্যে ছানা অবস্থা।

একক 14 □ পতঙ্গের সামাজিক আচার-আচরণ (Social behaviour in insects)

গঠন

14.1 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

14.2 বিষয়বস্তুর ভূমিকা

14.3 পতঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধতা ও সমাজ জীবনের বিবর্তন -

(A) স্বাধীনজীবী/এককদশার পতঙ্গ;

(B) বিচরণশীল/গ্রিগোরিয়াস বা সঙ্গপ্রিয় (gregorious) পতঙ্গ;

(C) অর্ধ-সামাজিক/সাব-সোস্যাল (subsocial) পতঙ্গ;

(D) পূর্ন সমাজবদ্ধ/ সোস্যাল(social) পতঙ্গ

14.4 পূর্ণ সমাজবদ্ধ পতঙ্গে আচার-আচরণের রূপ-রেখা

(A) হাইমেনোপ্টেরা (Hymenoptera) বর্গভুক্ত পতঙ্গে -

(1) ওয়াস্প (wasp) বা বোলতা ও সমজাতের পতঙ্গের আচরণ বিধি ,

(2) মৌমাছির আচরণ বিধি, (3) পিপীলিকার আচরণ বিধি,

(B) আইসোপ্টেরা (Isoptera) বর্গভুক্ত পতঙ্গের আচরণ বিধি

14.5 সারাংশ

14.6 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

14.7 উত্তরমালা

14.1প্রস্তাবনা ও উদ্দেশ্য

বর্তমান অংশে আপনারা পর্যালোচনা করবেন, পতঙ্গে সামাজিক জীবন-ধারার আচার ও আচরণ বিধি যা প্রাণী-ব্যবহার বিজ্ঞানে গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। সংখ্যা, ব্যাপ্তি ও বিবিধ বৈচিত্র্যে প্রাণী-জগতের অপরাপর গোষ্ঠী সমূহের তুলনায় পতঙ্গ সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এর প্রধান কারণ সম্ভবতঃ বিবিধ পরিবেশে যথাযথ অভিযোজিত হয়ে বিশাল সংখ্যায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা করায় পতঙ্গের স্বাভাবিক সফলতা। পতঙ্গ শুধু জলে বা স্থলে বিবিধ আবহাওয়ায় বসবাসে সমর্থ এমন নয়, বায়বীয় বা এরিয়েল (aerial) পরিবেশেও ঘোরা-ফেরায় পটু এবং অমেরুদন্ডীতে ও মেরুদন্ডীর অনেকেরই এ পটুতা নেই।

বিশাল, বৈচিত্র্যময় জীবন নির্বাহে পতঙ্গের সক্রিয়তায় এবং আচার-আচরণেও দেখা যায় সীমাহীন বৈচিত্র্য যাতে সর্বাপেক্ষা বেশী উল্লেখযোগ্য পতঙ্গে সোস্যাল লাইফ (social life) বা সমাজবদ্ধ জীবন। উন্নতমানের

বিধি হিসাবে স্বীকৃত এ জীবন-ধারার প্রজাতির সদস্যদের শুধু নিজেদের পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিয়ে সার্থক হলেই হবে না, মানিয়ে নিতে হবে নিজেদের কার্য্য-ধারার মধ্যেও। থাকতে হবে সর্বাঙ্গ-সুন্দর সমন্বয় যার ফলে সব কিছু হবে সুশৃঙ্খল, সম্পূর্ণ ও সঠিক। আবার পরিবেশে বর্তমান অন্য প্রজাতির সক্রিয়তার সঙ্গেও থাকবে সাযুজ্য ও সামঞ্জস্য। সামাজিক জীবন-ধারার উদ্ভব ঘটেছে পর্য্যায়ক্রমে যার আদিম প্রথম ধাপ সম্ভবতঃ বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ জীবনের প্রজাতি; এরকম প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে যৌনমিলন ছাড়া আর কোন যোগাযোগ ঘটে না। অপরপক্ষে, প্রকৃত সমাজবদ্ধ জীবন মাত্র তিনটি প্রধান পতঙ্গ গোষ্ঠীতে দেখা যায় যার প্রজাতিভুক্ত সদস্যরা অস্থায়ী / স্থায়ী বাসা বানিয়ে বাস করে এবং একত্রে জীবন কাটায়। সদস্যদের মধ্যে কর্মভিত্তিক বিভাজন ঘটে এবং সব জাতের সদস্যরা নির্দিষ্ট কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করে। সামাজিক আচার-আচরণ সংক্ষেপে এভাবে সংজ্ঞাবদ্ধ করা যায় - দুই বা ততোধিক সদস্যদের (একই প্রজাতির) মধ্যে যোগাযোগ রেখে গঠনমূলক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ার সমষ্টিই সামাজিক আচার-আচরণ। পতঙ্গে সামাজিক জীবন-ধারাকে কয়েকটি স্তর বা ধাপে ভাগ করা যায়। বিভিন্ন গোষ্ঠীতে বিভিন্ন স্তর এবং সব স্তরের পতঙ্গদের আচার-আচরণ বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষনীয়। প্রাণীজগতে পতঙ্গের সামাজিক জীবন-ধারা সমাজবদ্ধ জীবনের প্রাচীনতম দৃষ্টান্ত এবং তা যথেষ্ট উন্নতও বটে। অবশ্য, পতঙ্গের বিভিন্ন গোষ্ঠীতে এরকম জীবন-ধারার উদ্ভব হয়েছে পৃথক ও স্বাধীনভাবে। তবে নিঃসঙ্গ দশা থেকে পতঙ্গ প্রজাতিতে সমাজবদ্ধ জীবনের উদ্ভব সম্ভব হয়েছে পূর্ণাঙ্গ জীবন খানিকটা প্রলম্বিত হয়ে এবং অধিকতর অপত্যের যত্ন-আত্তির (প্যারেন্টেল কেয়ার / parental care) মাধ্যমে সামাজিক পতঙ্গের আচার-আচরণের পর্য্যালোচনায় আপনারা শুধু জীবন-ধারার বৈচিত্র্যময় তথ্যাদির খবরই জানবেন না, যে জীবন-ধারার অংশীদার হয়ে আমরা মানব প্রজাতির সদস্যরা আধিপত্য ও শ্রেষ্ঠত্ব অর্জনে সক্ষম হয়েছি সেই জীবন-ধারার প্রাসঙ্গিক কিছু গূঢ় সূত্রেরও সন্ধান পাবেন আপনারা; বুঝবেন, টিকে থাকার সহায়ক কোন পদ্ধতি একের অধিক গোষ্ঠীতে বিভিন্ন ধারায় প্রকাশ পেয়েও সমমানের কার্যাকর পদ্ধতি হতে পারে।

উদ্দেশ্য

বর্তমান এককে পতঙ্গের সামাজিক আচার-আচরণের ধরণ ও তার ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যে সমাজবদ্ধ জীবন-ধারা উন্নততম প্রাণী মনুষ্য প্রজাতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ, তার উদ্ভব ও প্রকাশ খাদ্য পতঙ্গের মত নিম্নস্তরের প্রাণীতে কিভাবে আছে সে বিষয়ে অবহিত থাকা অবশ্য প্রয়োজনীয়। বর্তমান এককের পাঠ ও অনুধাবনে আপনি জানবেন ঃ-

- নিঃসঙ্গ, স্বাধীন-জীবী পতঙ্গ-প্রজাতির পাশাপাশি কতধরণের সমাজবদ্ধ জীবন-ধারার পতঙ্গ-প্রজাতি বর্তমান এবং তাদের আকার-প্রকার ও ব্যাপ্তি।
- য়্যুসোস্যাল বা পূর্ণ সমাজবদ্ধ জীবন যে সব হাইমেনোপ্টেরা বর্গের পতঙ্গে রয়েছে তাদের নাম ও পরিচিতি।
- প্রধান দুটি য়্যুসোস্যাল গোষ্ঠীর (মৌমাছি ও পিপীলিকা) প্রতিটির সামাজিক জীবনে একক ও গোষ্ঠীগত আচার-আচরণের রূপ-রেখা।
- আইসোপ্টেরা বর্গ যে উইপোকাদের নিয়ে তাদের য়্যুসোস্যাল জীবনের একক ও গোষ্ঠীগত আচার-আচরণের রূপরেখা।
- সমাজবদ্ধ পতঙ্গ-জীবনের সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য আচার-আচরণ

14.2 বিষয়বস্তুর ভূমিকা

অস্তিত্ব বজায় রাখা অর্থাৎ টিকে থাকার জন্য প্রাণিদের স্বভাব ও আচার-আচরণে শুধু পরিবেশের সঙ্গে সাযুজ্য থাকলেই চলবে না, হতে হবে স্বীয় প্রজাতির অন্যদের ও ভিন্ন প্রজাতির সবার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। অবশ্য, সামাজিক আচার-আচরণ একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে সুশৃঙ্খল আদান-প্রদান ও নির্ভরশীলতা বোঝায়। কোন সমাজে সমাজভুক্ত প্রতিটি প্রাণিকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমাজের প্রয়োজনানুগ কাজে ও বংশরক্ষায় অংশীদার হতে হয় এবং একটি সামাজিক পরিকাঠামোর মধ্যে তাল-মিল রেখে বসবাস করতে হয়। সদস্যরা তাদের স্বকীয়তা কমবেশী অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে কিন্তু সমাজের সার্বজনীন উপকারের জন্য প্রত্যেককেই কিছু সাধারণ কাজে ভাগ নিতে হয়।

সমাজবদ্ধ জীবনের প্রধান প্রধান কারণ ও সুবিধা সমূহ এরকমভাবে বলা যায় ঃ প্রত্যেক প্রাণির প্রবৃত্তিগত দুটো প্রধান 'বোধ/তাড়না' থাকে - নিজের সংরক্ষণ অর্থাৎ **আত্মরক্ষা** এবং **বংশরক্ষা**। ক্রমবর্দ্ধমান জটিলতার আবর্তে প্রাণী টিকে থাকার ও বংশরক্ষার বিবিধ উপায় খুঁজে নেয়। সামাজিক জীবন-ধারা একই সমাজভুক্ত প্রাণীদের আশ্রয়, নিরাপত্তা, খাদ্য, সংরক্ষণ, যৌনমিলন ও পরবর্তী প্রজন্ম সৃষ্টির সুযোগ জোগায়। এ বিষয়ে নিম্নোক্ত তথ্যাদি প্রণিধানযোগ্য ঃ

(1) **সামাজিক জীবনের প্রাকৃতিক আয়তন** - প্রজাতি ভেদে এবং সামাজিকতার স্তরের উপর নির্ভরশীল প্রাকৃতিক আয়তন কয়েকটি থেকে অনেক কয়টি নিয়ে গঠিত হতে পারে। সংখ্যাধিক্য উন্নতমানের সামাজিক প্রজাতির প্রতিটি কলোনী (colony) বা বাসার বৈশিষ্ট্য দৃষ্টান্ত মৌমাছি / উঁইপোকা কলোনী।

(2) **খাদ্যের সহজ ও সঠিক অনুসন্ধান** - কলোনীর বহু সদস্যই খাদ্যান্বেষণ, খাদ্য-সংগ্রহ ও বাসস্থানে খাদ্য তুলে আনার ব্যাপারে নিযুক্ত থাকে। খাদ্য-উৎসের সন্ধান পেলে নানাভাবে তা অন্য সদস্যদের 'জানায়'।

(3) **পতঙ্গভুক থেকে আত্মরক্ষা** - কলোনীর কিছু সদস্য এ ব্যাপারে বিশেষ 'পারদর্শী'। এরা কলোনীর সৈনিক বা প্রহরী জাতের (soldier/guard)। এদের দেহের গড়ন এ কাজের উপযোগী।

(4) **প্রজনন ক্রিয়ায় উদ্দীপনা** - এক লিঙ্গের সদস্যরা কলোনীর বিপরীত লিঙ্গের সদস্যদের এ কাজে উদ্দীপিত করে। মৌমাছি কলোনীর রাণীর আকাশে যৌনবিহারকালে বহু পুরুষ-সদস্য অনুগামী হয় এবং আকাশেই যৌনমিলন ঘটে।

(5) **যোগাযোগের নানা উপায়** - উন্নত মানের সামাজিক পতঙ্গে এসবের বহুল প্রকাশ ঘটে। ফেরোমোন (pheromone) নামক বিপরীত লিঙ্গের পক্ষে আকর্ষক রস বা সেন্ট-ট্রেইল (scent trail) নামক সাধারণ দেহগ্রহের রস দ্বারা; ডানার কম্পন তরঙ্গের তারতম্য বা বিবিধ শারীরিক মুদ্রা (বী-ড্যান্স / bee dance) দ্বারা যোগাযোগ ও 'ভাব-বিনিময়' সামাজিক পতঙ্গের গোষ্ঠী বিশেষে কার্যকর করা হয়। এসব পতঙ্গের প্রতি বাসার নিজস্ব 'গন্ধ' থাকে (একই রকমের উদ্ভিদাংশ খায় বাসার সদস্যরা যার দরুণ এরকম হতে পারে)।

14.3 পতঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধতা ও সমাজ জীবনের বিবর্তন

প্রাণির বিবর্তনে অস্তিত্ব রক্ষার সহায়ক আচার-আচরণ রক্ষিত হয় এবং বংশ-পরম্পরায় সঞ্চালিত হয়। পতঙ্গে এ জাতীয় বৈশিষ্ট্যসমূহ পুরোপুরি প্রবৃত্তিগত (ইন্‌স্টিংটিভ/instinctive) । সব চাইতে বেশী পুরোনো অথচ যথেষ্ট উন্নত সামাজিক জীবন দেখা যায় পতঙ্গেই যাদের উদ্ভব অন্ততঃ ত্রিশ কোটি বছর আগে। প্রকৃত সামাজিক জীবন অবশ্য পতঙ্গে নির্দিষ্ট কয়েকটি গোষ্ঠীতেই সীমাবদ্ধ এবং এদের মধ্যে তার উদ্ভব ঘটেছে পৃথক ও স্বাধীনভাবে। পূর্ণাঙ্গ দশায় জীবন ক্রমশঃ দীর্ঘায়িত হওয়াতে এবং পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি পূর্ণাঙ্গদের যত্ন নেবার মাত্রার (প্যারেন্টাল কেয়ার /parental care) বৃদ্ধি পতঙ্গে সামাজিক জীবন বিকাশে সহায়ক হয়েছে। কোন একটি প্রজন্ম নির্ভরশীল থাকে পিতা-মাতার উপর, পরে পিতা-মাতা নির্ভরশীল হয় প্রজন্মের উপর এবং এভাবেই সমাজবদ্ধ জীবনে বংশ-পরম্পরার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে।

এবারে আমরা পতঙ্গে বিভিন্ন মানের গোষ্ঠীবদ্ধতা যা বস্তুতঃ ওদের সমাজ-বিবর্তনের বিভিন্ন ধাপ তার সংক্ষিপ্ত পর্য্যালোচনা কোরবো। এর থেকে আপনারা জানবেন কিভাবে কোন ধারায় পতঙ্গে সামাজিকতার উন্মেষ ঘটেছে এবং উল্লেখযোগ্য আচার-আচরণগুলো কেমন ও কিভাবে বিবর্তিত হয়েছে। প্রধান ধাপগুলোর উল্লেখে বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া হোল ঃ-

(A) একক দশা অর্থাৎ গোষ্ঠীবদ্ধতাবিহীন পতঙ্গ - সাধারণ, আদিম ধাপ ঃ পতঙ্গের বেশীরভাগ প্রজাতিকেই এ দশার অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এসব প্রজাতির স্ত্রী ও পুরুষ কেবলমাত্র যৌনমিলনের জন্য আবশ্যিকভাবে একত্রিত হয়। অতঃপর স্ত্রী ডিম পাড়ে এবং সরে যায় বা মারা যায়; ডিম বা প্রজন্মের দিকে ফিরেও তাকায় না। কোন প্রজাতির স্ত্রী অবশ্য ডিম পাড়ে স্বভাব-বশে এমন জায়গা বেছে যেখানে বা যার কাছাকাছি খাদ্যের কিঞ্চিৎ প্রাকৃতিক ব্যবস্থা থাকে; ডিম ফুটে বেরিয়ে অপরিণত দশা যাতে তা খেয়ে বড় হতে পারে। ডিগার ওয়াস্প (Digger Wasp) নামক বোলতা প্রজাতির স্ত্রী পুরানো, পড়ে-থাকা কাঠে গর্ত করে ডিম পাড়ে ও খাবার ভরে দেয়। সলিটারী বী (solitary bee) একজাতের মৌমাছি; এদের কয়েকটি গণভুক্ত (genus) প্রজাতির স্ত্রী-মৌমাছিরা প্যারেন্টেল কেয়ার (parental care) অর্থাৎ পিতৃ-মাতৃ সুলভ যত্ন বা তদারকির খানিকটা দেখায়। এদের এন্থোফোরা (Anthophora) গণের মৌমাছিরা লম্বালম্বি গর্ত খুঁড়ে বাসা বানায়। এসব গর্তের একটিতে স্ত্রী বাস করে এবং অন্যগুলো তার দেওয়া ডিমে ভর্তি থাকে। ডিম থেকে শুককীট বের হলে স্ত্রী তাদের লালন করে।

(B) বিচরণশীল বা গ্রিগোরিয়ান বা সঙ্গপ্রিয় (gregarious) পতঙ্গ ঃ এরা সাধারণতঃ দলবদ্ধ হয়ে থাকে, কিন্তু সামাজিক নাও হতে পারে; বিশেষতঃ যেসব ক্ষেত্রে এক সদস্য অন্যর উপর নির্ভরশীল নয়।

নানা কারণে প্রজাতির সদস্যদের দলবদ্ধ হওয়া বা জমায়েৎ ঘটে। মাটিতে পড়ে থাকা কোন কাঠের খুঁটির নীচের দিকে আর্দ্রতা বেশী। সেখানে তাই খুব ভীড় করে থাকে। উড লাউসে (wood louse) এ ধরণের জমায়েত কিন্তু পারস্পরিক কোন লেন-দেন বা সক্রিয়তা (ইন্টার অ্যাকশান / interaction) থাকে না (wood-louse) প্রকৃতপক্ষে একপ্রকার স্থলনিবাসী crustacea শ্রেণীভুক্ত সন্ধীপদ প্রাণী)।

(C) সাব্-সোস্যাল (sub-social) বা অর্ধসমাজবদ্ধ সামাজিক পতঙ্গ ঃ পতঙ্গে পূর্ণ সামাজিক জীবন উদ্ভবের পূর্ববর্তী এ ধাপের স্ত্রী-সদস্যরা ডিম পেড়ে অবশ্যই অপরিণতদের জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করে রাখে এবং শূককীট ও অন্যান্যদের যত্ন সহকারে লালন-পালন করে। স্ত্রী গুবরে পোকা (ডাং বীট্‌ল্ / dung beetle)

গোবরের অংশ গোলাকার বলের আকারে বানিয়ে নেয় ও তা গড়িয়ে নিয়ে নিজের গর্তে জমা করে। তারপর ঐ গর্তে কিছু খাবার জোগান দিয়ে স্ত্রী তাতে ডিম পাড়ে ও সরে যায়। ডিম ফুটে শুককীট বেরিয়ে সঞ্চিত খাবার খায় ও ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে চলে। কোন কোন প্রজাতিতে এসব কাজের সময় পুরুষ পতঙ্গ পাহারা দেয়, অপর প্রজাতির আবার স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েই গর্ত খুঁড়ে খাদ্য-সম্পৃক্ত গোবরের তাল জমা করে। এসব গর্তে ডিম ফুলে শুককীট না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ উভয়েই পাহারায় থাকে।

একটি স্ত্রী ইয়ারউইগ (earwig) পতঙ্গ ডিম পেড়ে তার এবং তা থেকে সৃষ্ট নিম্ফ (nymph) নামক অপরিণত দশাকে পাহারা দেয়। এ ধরণের আচরণ দেখা যায় ঝিঁঝিঁপোকা (ক্রিকেট /cricket) পতঙ্গে, ওয়েব-স্পিনার (web spinner) ও বুক লাউস (book louse) পতঙ্গে।

(D) সোস্যাল (social) বা পূর্ণ সমাজবদ্ধ / সামাজিক জীবন-যাপনকারী পতঙ্গ : প্রকৃত সমাজবদ্ধ জীবন (ট্রু সোস্যাল লাইফ / true social life; য়ু-সোস্যাল লাইফ/Eusocial life) কেবলমাত্র দুটি বর্গের পতঙ্গে দেখা যায় - আইসপ্টেরা বর্গ (order Isoptera) যার অধীন উইপোকা (হোয়াইট এ্যান্ট / White ant; টার্মাইট / termite) এবং হাইমেনোপ্টেরা বর্গ যার অধীন পিপীলিকা, বোলতা, মৌমাছি, ভীমরুল প্রভৃতি (ant, wasp, honey bee, hornet)।

অনুন্নত জাতের উইপোকা গোষ্ঠী এবং ডানাহীন ক্রিপ্টোসার্কিড (cryptocercid) আরশোলার মধ্যে প্রবল মিল - উভয়েই কাঠ খায় এবং কাঠ হজমের জন্য স্বীয় পৌষ্টিক নালীর সেলুলেজ উৎসেচকের (cellulase enzyme) উৎস সিম্বায়ন্ট প্রোটোজোয়া (symbiont protozoa) প্রাণির উপর নির্ভরশীল। এ প্রোটোজোয়া উইপোকাতে বংশ-পরম্পরায় সঞ্চালিত হয়ে থাকে পায়ুদেশের ট্রোফালাক্সিস (trophallaxis) নামক এক ধরণের বিনিময় বা আদান-প্রদান প্রক্রিয়ায় যা সমাজবদ্ধ পতঙ্গে মুখাত একে অন্যের সঙ্গে খাদ্যবস্তু সঞ্চালনের গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া। উইপোকা মনে করা হয় একজাতের সমাজবদ্ধ আরশোলার মত যারা সিম্বায়োন্ট বিনিময় করতে পরস্পরে মিলিত হোত এবং এ আচরণ থেকেই উদ্ভূত হোল উইপোকার পূর্ণাঙ্গ সামাজিক জীবন, সম্ভবত দুটো পথ ধরে - (1) সম-সমাজবদ্ধ জীবনধারা / প্যারাসোস্যাল সীকোয়েন্স (parasocial sequence) যার শুরু সহায়তাপ্রবণ সাম্প্রদায়িক আচার-আচরণের ভিত্তিতে এবং অধিকাংশ প্রকৃত সমাজবদ্ধ বা সোস্যাল (social) মৌমাছি গোষ্ঠীতে দেখা যায়। এর উন্নতদশার প্রথম প্রকাশ কোয়াসি-সোস্যাল (quasi-social) বা সহ-সমাজবদ্ধ গোষ্ঠীতে যেখানে প্রজন্মের লালন-পালনগত আচার-আচরণে কিছু বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এর পরবর্তী জীবন ধারার প্রকাশ যে গোষ্ঠীতে তাতে প্রজননে অক্ষম শ্রমিক শ্রেণী থাকে এবং ধারাটি সেমিসোস্যাল (semisocial) বা উপসমাজবদ্ধ জীবন-ধারা নামে চিহ্নিত। সর্বশেষ জীবন ধারার নাম য়ুসোস্যাল (Eusocial) বা ট্রু-সোস্যাল (True Social) জীবনধারা যাতে দুই বা ততোধিক প্রজন্মের মধ্যে সহযোগিতার বিকাশ ঘটে।

(2) অবস্তন সমাজবদ্ধ জীবন-ধারার (সাবসোস্যাল সীকোয়েন্স / Subsocial sequence) উন্নীত হওয়ার নিদর্শন মেলে পিপীলিকা, সমাজবদ্ধ বোলতা ও মৌমাছির কয়েকটি প্রজাতিতে। উন্নত এ জীবন-ধারার প্রথম দশায় স্ত্রী-পতঙ্গ প্রজন্মের জন্মলগ্নে কিছুদিন তাদের সঙ্গে থেকে ডিম ফুটে শূককীট বেরোবার আগেই সরে যায় (অর্থাৎ ডিম পেড়ে তা রক্ষণাবেক্ষণ করে কিন্তু শূককীট আসার আগেই অন্যত্র চলে যায়)। এ অবস্থার পোষাকী নাম প্রিমিটিভলি সাব-সোস্যাল (premitively subsocial)। এর পরের দশার নাম মধ্যবর্তী বা ইন্টারমিডিয়েট সাব-সোস্যাল ধাপ I (Intermediate Subsocial I) যাতে স্ত্রী পতঙ্গ পরের প্রজন্মের সঙ্গে বেশ কিছুকাল

একত্রে বসবাস করে। ইন্টারমিডিয়েট সাব-সোস্যাল ধাপ 2 (Intermediate Subsocial II) তে এক প্রজন্ম পরের প্রজন্মের সঙ্গে আরো নিবিড় ও স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করে। এরপর বিকাশ ঘটে প্রজননে অক্ষম বা সক্ষম পতঙ্গ-সদস্যের গোষ্ঠী এবং তা থেকেই উদ্ভব ঘটে য়্যুসোস্যাল (Eusocial) অর্থাৎ প্রকৃত সমাজবদ্ধ জীবনের।

14.4 পূর্ণ সমাজবদ্ধ পতঙ্গে আচার-আচরণের রূপ-রেখা

(A) হাইমেনোপ্টেরা (Hymenoptera) বর্গভুক্ত পতঙ্গে ঃ

প্রকৃত সমাজবদ্ধ জীবন হাইমেনোপ্টেরা বর্গভুক্ত পতঙ্গের তিনটি মাত্র গোষ্ঠীতে দেখা যায় যথা - (1) ওয়াস্প (wasp) বা বোলতা ও সমজাতের পতঙ্গ, (2) পিপীলিকায় এবং (3) মৌমাছিতে। এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য তথ্যাদির সংক্ষিপ্ত রূপ-রেখা নিম্নোক্তরূপ ঃ-

(1) **ওয়াস্প (wasp) বা বোলতা ও সমজাতীয় পতঙ্গের আচরণ-বিধি ঃ** বোলতা পতঙ্গসমূহ তিনটি পরিবারে বিভক্ত যথা -শীত-প্রধান অঞ্চলের একক জীবনে অভ্যস্ত বোলতাদের নিয়ে গঠিত য়্যুমেনিডি (Eumenidae) পরিবার; বিবিধমানের সমাজ-জীবনে অভ্যস্ত প্রধানতঃ এশিয়া মহাদেশ নিবাসী বোলতাদের নিয়ে গঠিত ভেস্পিডি (vespidae) পরিবার; এবং মাটিতে বাসা বানিয়ে থাকে কিন্তু বিভিন্ন অঞ্চলে মেলে এমন অল্প-সংখ্যক প্রজাতির বোলতাদের নিয়ে গঠিত স্ফেকিডি (Sphecidae) পরিবার। একক জীবন-ধারা থেকে সমাজবদ্ধ জীবনধারায় উত্তরণ ঘটে বোলতা পতঙ্গে। - স্ফেকয়েড বোলতায় অর্ধ-সমাজবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত কয়েকটি প্রজাতির দেখা মেলে কিন্তু ভেস্পয়েড বোলতার অনেক প্রজাতিই পূর্ণ সমাজবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত। একক দশায় অনেক বোলতায় গণ-সঞ্চয় (মাস প্রভিশানিং / mass provisioning) অভ্যাস দেখা যায় অর্থাৎ এরা বাসা তৈরী করে তাতে খাবার ভরে দেয় যথেষ্ট পরিমাণে যাতে পরবর্তী প্রজন্ম অপরিণত দশায় তা খেয়ে পূর্ণতা লাভে সমর্থ হয়। অপর কিছু প্রজাতিতে প্রোগ্রেসিভ প্রভিশানিং (progressive provisioning) নামক কিঞ্চিৎ উন্নতমানের অভ্যাস দেখা যায় যাতে পূর্ণাঙ্গ দশা বাসায় উপস্থিত থেকে অপরিণতদের প্রয়োজনমত খাবার জোগায়।

ভেস্পয়েড বোলতার উল্লেখযোগ্য সমাজবদ্ধ প্রজাতিসমূহ ভেস্পা, ভেস্পুলা ও পলিস্টেস (**Vespa, Vespula, Polistes**) গণভুক্ত এবং এদের ইংরেজী চলতি নাম পটার ওয়াস্প / পেপার ওয়াস্প বা ফ্রেঞ্চ ওয়াস্প / ইয়েলো জ্যাকেট / হর্নেট প্রভৃতি (potter wasp/paper wasp or french ওয়াস্প / yellow jacket / hornet)। সর্ববৃহৎ ভারতীয় বোলতার বৈজ্ঞানিক নাম ভেস্পা ম্যাগ্নিফিকা (**vespa magnifica**)। অধিকাংশ বোলতা প্রজাতি আহৃত কাঠের দানার সঙ্গে নিজের লালা (saliva / স্যালাইভা) মিশিয়ে মণ্ড বানায় ও তাকে পাতলা কাগজের আকারে বদলে নেয় (বোলতার এভাবে তৈয়ারী পাতলা কাগজের মত মণ্ডের পাতকে বোলতার কাগজ (ওয়াস্প-পেপার / wasp paper) বলা হয়)। এ দিয়ে ঘর-বাড়ির দেয়ালে বা কার্নিশে প্রকোষ্ঠযুক্ত বাসা (চাক) বানায়। ফ্রেঞ্চ ওয়াস্প বা পলিস্টেস (Polistes) গণের বোলতার বাসায় কিছু ষট্‌কোণী প্রকোষ্ঠ থাকে যাতে অপরিণত দশা লালিত হয়। গ্রীষ্মকালেই বোলতা সর্বাধিক সক্রিয় থাকে, শীতে প্রায় নিষ্ক্রিয় থাকে।

পূর্ণ সমাজবদ্ধ বোলতার চাকে মুখ্যতঃ দু'জাতের পূর্ণাঙ্গ বোলতা থাকে - প্রজননে সক্ষম, ডিম দিতে সক্ষম স্ত্রী-বোলতা এবং এসব কাজে অক্ষম কিন্তু বাকী সব কাজের ভাগীদার শ্রমিক-বোলতা। পুরুষ বোলতার জীবন

স্বল্পকালের। কোন বোলতার বাসাকে কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত দুটি শ্রেণীর যে কোন একটির অন্তর্ভুক্ত করা যায় : (1) প্লিওমেট্রোটিক শ্রেণীর (Pleometrotic state) বাসা যা দীর্ঘস্থায়ী এবং যার শ্রমিকরা অন্যাজাতের তুলনায় সংখ্যায় খুব বেশী নয় এবং আকার-প্রকারে খুব স্পষ্টভাবে চিহ্নিত হয় না; পূর্ণগঠিত এসব বাসা থেকে যখন বোলতা ঝাঁক বেঁধে বেরোয় (সোয়ার্মিং / swarming) তখন ডিম্ববাহী স্ত্রী-বোলতার সঙ্গে শ্রমিক বোলতাও থাকে। শীত-প্রধান অঞ্চলের বোলতার চাক সবই অপর শ্রেণীভুক্ত যার নাম (2) হ্যাপ্লোমেট্রোটিক (haplometrotic) এবং যার বৈশিষ্ট্য - মাত্র একটি ঋতুকাল অবধি স্থায়িত্ব এবং একটি চাক বা বাসায় একটিমাত্র স্ত্রী-বোলতা (রাণী / কুইন Queen) প্রতিষ্ঠিত। এখানে শ্রমিকরা আকার-প্রকারে স্পষ্টভাবে চিহ্নিত। বোলতা - শ্রমিক মৌমাছি শ্রমিকের মত সবাই যৌনাঙ্গ-বিহীন ও প্রজননে অক্ষম নয়; রাণী মারা গেলে বা শ্রমিক-সংখ্যা হ্রাস পেলে শ্রমিকে প্রজনন ক্ষমতা সক্রিয় হতে পারে। যদিও এরকম শ্রমিক-জাত বোলতা সবাই পুরুষ-বোলতা হবে (বোলতায় মৌমাছির মত শ্রমিক-দশা পুরোপুরি পাকাপাকিভাবে বন্ধ্যা নয়)।

চাকের প্রতিটি ষট্‌কোণী প্রকোষ্ঠে রাণী নিষিক্ত ডিম পাড়ে এবং তা থেকে শূককীট দশার সৃষ্টি হয়। বাড়ন্ত শূককীটকে প্রাণিজ খাদ্য চিবিয়ে নরম করে শ্রমিক বোলতা খাওয়ায়; গাছ থেকে আহৃত চিনি - সম্পৃক্ত খাবারও দেয়। কোন চাকে শরৎকালে যে প্রজন্ম পূর্ণাঙ্গ-দশা পায় তারা সব স্ত্রী বা পুরুষ হয় এবং স্ত্রী যৌন-মিলন সম্পূর্ণ করে রাণীতে পরিণত হয়। শীত পড়তেই চাকের পুরুষ ও শ্রমিক সব মারা যায় এবং শুধু রাণীরা পরবর্তী বসন্তকাল পর্যন্ত টিকে থাকে। বোলতার চাকে মৌমাছি-চাকের মত শ্রমিকদের মধ্যে উন্নতমানের কর্ম-বিভাজন দেখা যায় না।

(2) **মৌমাছির আচরণ-বিধি :** বম্বিনি উপ-পরিবারভুক্ত (subfamily Bombinae) মৌমাছিরা মুখ্যতঃ উত্তর গোলার্ধের নাতিশীতোষ্ণ দেশসমূহের পাহাড়ী এলাকায় পরিব্যাপ্ত (ভারতের সমতলে এদের দেখা যায় না) এবং বাম্বেল / হাম্বেল-বী (Bumble/Humble bee) নামে পরিচিত। এদের মধ্যে বোলতার সমতুল-মানের সামাজিক জীবন দেখা যায়। এদের কোন বাসার অধিকাংশই শরৎ-কাল নাগাদ মারা যায়। কিছু স্ত্রী শীত-ঘুমের মারফৎ পরবর্তী বসন্তকাল পর্যন্ত কাটিয়ে তারপর সক্রিয় হয় ও নতুন নতুন বাসা বানায় যার অধিকাংশ সদস্যই শ্রমিক (স্ত্রী থেকে আকারে কিঞ্চিৎ খাটো)। প্রত্যেক রাণীই নিজের, পছন্দমত স্থানে বাসা বানায় - উল্লেখযোগ্য এক প্রজাতিকে দেখা যায় মাটির নীচে বাসা বানাতে যাতে থাকে শেওলা বা মিহি ঘাস এবং প্রায় দু'ফুট লম্বা টানেলের মত প্রবেশ-পথ দ্বারা তা উন্মুক্ত রাখা হয়। কার্ডার বী (Carder bee) নামক এক জাতের বাম্বেল বী বিচিত্র রীতিতে বাসা বানায় - জমিতে ঘন-সংবদ্ধ ঘাসের আড়ালে ঘাস, শেওলা, খড়-কুটো ইত্যাদি পা ও চোয়াল দিয়ে দলা পাকিয়ে। রাণী তারপর সংগ্রহ করে অনেক ফুল-রেণু এবং তা চটকে গোলাকার প্রকোষ্ঠ রচনা করে ও মোম-জাতীয় পদার্থ দ্বারা তা ঢেকে দেয়; এর মধ্যে রাণী তার প্রথম দফার ডিম পাড়ে। রাণী মোম দ্বারা একটি মধু-ভাণ্ড (হানি পট / honey pot) বানিয়ে তা তার প্রকোষ্ঠে সংযোজন করে। এ ভান্ড মধু ভর্তি থাকে যা রাণী ডিম পাড়ার পরবর্তী সময়ে খায়। রাণী তার বাসার প্রকোষ্ঠ সংখ্যা বাড়ায়। তিন সপ্তাহের মধ্যেই প্রথম দফার ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ শ্রমিক গঠিত হয় এবং তারা বাসার সংরক্ষণ, খাদ্য-সংগ্রহ ইত্যাদির দায়িত্ব গ্রহণ করে। 'বম্বাস' **(Bombus)** প্রজাতি অসম প্রকোষ্ঠের বাসা বানায় এবং বিশেষ বৈচিত্রের নিদর্শন মেলে সেই আচরণে যেখানে অন্য প্রজাতির রাণী বম্বাস রাণীকে হুল ফুটিয়ে মেরে তার স্থান দখল করে নেয় এবং বাসার বম্বাস শ্রমিকরা অজান্তে নতুন রাণীর ডিমজাত অপরিণত দশাদের লালন করে।

বিবিধ স্তরের সমাজবদ্ধ জীবন-যাপন করে এপিনি উপপরিবারভুক্ত (subfamily Apinae) মৌমাছি; এদের শ্রমিক, স্ত্রী (= রাণী) ও পুরুষে (= ড্রোন /drone) গঠন এবং আচরণগত বিভেদ খুবই সুস্পষ্ট। অবশ্য পূর্ণ সমাজবদ্ধ দশা দেখা যায় বিশ্বের বর্ণিত দশহাজার মৌমাছি প্রজাতির মাত্র পাঁচশো প্রজাতির মধ্যে। এদের কিছু আবার সাময়িক বাসা বানায় (অর্থাৎ এক বাসায় কিছুদিন থেকে অন্যত্র গিয়ে নতুন বাসা বানায়)। এপিস গণভুক্ত (genus Apis) মৌমাছিদের বহুল পরিচিত পাঁচটি প্রজাতি যথা রক-বী / এপিস ডর্সাটা (Rock bee/ **Apis dorsata**), ইন্ডিয়ান-বী / এপিস ইন্ডিকা (Indian bee / **Apis indica**), লিটল-বী এপিস ফ্লোরিয়া (Little bee/**Apis florea**) ইউরোপীয়ান-বী / এপিস মেলিফিকা (European be / **Apis mellifica**) ও আফ্রিকান-বী / এপিস আডামসনি (African bee / **Apis adamsoni**) উন্নতমানের পূর্ণ সমাজবদ্ধ জীবন কাটায় এবং এদের সদস্যরা স্থায়ী বাসা বানায়। বহু ষট্‌কোণী প্রকোষ্ঠের মৌমাছি দেহের মোম দিয়ে বানানো এসব বাসা (মৌচাক) গাছের ডাল, বাড়ীর বাইরের দেয়ালের উপরিভাগ বা কার্নিস-সংলগ্ন উঁচু জায়গায় ঝোলানো থাকে। মৌচাকের প্রকোষ্ঠগুলো তিন রকমের - বাসাটি ঝোলানো রেখে ভালোভাবে আট্‌কাতে এক রকমের প্রকোষ্ঠ (এটা মেন্ট সেল / attachment cell), খাবার সঞ্চিত রাখার প্রকোষ্ঠ (সঞ্চয়ী প্রকোষ্ঠ বা ষ্টোরেজ সেল / storage cell) এবং অপরিণত দশা থাকার প্রকোষ্ঠ (ব্রুড সেল / brood cell); শেষেরটি (ব্রুড সেল) আবার তিন রকমের ঃ শ্রমিক-প্রকোষ্ঠ, স্ত্রী-প্রকোষ্ঠও পুরুষ-প্রকোষ্ঠ (ভিন্ন জাত ভিন্ন প্রকোষ্ঠে যাতে থাকে তার জন্যে)।

সামাজিক সংগঠনের আচরণ - কোন পরিণত ও স্থায়ী মৌচাকের পূর্ণাঙ্গ সদস্য-সংখ্যা পঞ্চাশ-আশী হাজার বা তার বেশী হতে পারে। এদের শ্রমগত বিভাজন খুবই সুস্পষ্ট এবং শারীরিক ও আচার-আচরণের পার্থক্য তার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ; এসবের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়া হল (এ বিষয়ে বর্তমান সিরিজের 11 নং এককে মৌমাছির কর্ম-ভিত্তিক অঙ্গ-সংস্থান অংশে প্রদত্ত ছবি / রেখ-চিত্র দ্রষ্টব্য) ঃ

(i) রাণী-(**কুইন / Queen**) বা স্ত্রী-মৌমাছি - প্রজননে সক্ষম স্ত্রী-মৌমাছি ডিম দেওয়া সুরু করে রাণী হিসেবে সম্পূর্ণতা লাভ করে। একটি সম্পূর্ণ ও পরিণত মৌচাকে একটিই রাণী থাকে। মৌচাক বা মৌমাছি-কলোনী তাই এক রাণীর বাসা / কলোনী (মনোগাইনিক / monogynic)। আকারে বাসার অন্য জাতের সদস্যদের চেয়ে বড় রাণীর অন্যান্য বৈশিষ্ট্যগুলোর অন্যতম - বড় মাপের উদর যার শেষ প্রান্তে থাকে ওভিপজিটর (ovipositor) শলাকা (এর সাহায্যে রাণী ঈপ্সিত যথাযথ স্থানে ডিম পাড়ে). দেহের তুলনায় ছোট মাপের ডানা এবং সুদৃঢ় পা। রাণীর কাজ তার 2-3 বছরের জীবদ্দশায় শুধু ডিম পাড়া এবং একটি রাণী মোট 6 লক্ষ পর্যন্ত ডিম দিতে সক্ষম। বাসার বাইরে রাণী একাধিক বার যায় মুখ্যতঃ যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে এবং কোন রাণী এ সময়ে কয়েকদিন ধরে কয়েকবার পুরুষ মৌমাছিদের সঙ্গে আকাশ বিহারে গিয়ে অন্ততঃ 10-12 টি পুরুষের সঙ্গে পর্যায়ক্রমে মিলিত হয়। ফলে এসবের শেষে যখন রাণী স্থায়ীভাবে মৌচাকে ফেরে তখন তার শুক্রধানী শুক্রকোষে পরিপূর্ণ থাকে। বিভিন্ন সময়ে ডিম পাড়ার কালে শুক্রধানী থেকে শুক্রকোষের নিষ্ক্রমণ ঘটিয়ে ডিমের নিষিক্তকরণ ক্রিয়ায় রাণীর 'হাত' থাকে; তাই মৌচাকে উৎপাদিত মৌমাছিদের 'জাত নিয়ন্ত্রণে' রাণীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। ডিম-জাত অপরিণত দশা প্রথম 2-3 দিন পর্যন্ত বিশেষ খাদ্য রয়েল জেলী (royal jelly) খেতে পায়; এরপর থেকে কেবলমাত্র যে কোন একটি শূককীটই এ খাবার পায় এবং রাণী-মৌমাছিতে পরিণত হয়। অন্য শূককীট যারা রয়েল জেলী থেকে বঞ্চিত তারা পরিণত হয় প্রজনন-ক্ষমতাহীন শ্রমিক-মৌমাছিতে। অনিষিক্ত (আন্‌ফার্টিলাইজড্ / unfertilized) ডিম থেকে সৃষ্ট শূককীটরা পুরুষ-মৌমাছি হয়ে পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে।

(ii) **ড্রোন (drone) বা পুরুষ-মৌমাছি** - বছরের বসন্ত ও গ্রীষ্ম ঋতুতে সাধারণতঃ এ জাতের সদস্য বা মৌচাকে জন্ম নেয় রাণীর অনিষিক্ত ডিম থেকে। আকারে শ্রমিক-মৌমাছি থেকে বড় কিন্তু স্ত্রী-মৌমাছি থেকে ছোট এরা ফুল থেকে মধু-আহরণে অসমর্থ। এদের 4-5 সপ্তাহের জীবদ্দশায় শ্রমিক-মৌমাছি এদের খাওয়ায়। স্ত্রী-মৌমাছিদের সঙ্গে যৌন-মিলনের উদ্দেশ্যে এরা বাসা ছেড়ে আকাশে ওড়ে এবং উড্ডীয়মান দশায় (aerial flight / nuptial flight) মিলনে রত হয়। যৌন-বিহারে আকাশে মিলন মৌমাছির বৈশিষ্ট্য, তাই এদের বিহার-দশা প্রকৃত নাপসিয়েল ফ্লাইট (nuptial flight)। অপর বৈশিষ্ট্য পুরুষ মৌমাছির বাইরের যৌনাঙ্গের (external genital organ) যা মিলন-কালে পুরুষ দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্ত্রী-মৌমাছির দেহে আটকে থাকে এবং মিলনে সক্ষম পুরুষ-মৌমাছি মিলনান্তে মারা যায়। এদিকে যৌন-মিলনে ব্যর্থ / অসমর্থ পুরুষ মৌমাছিদের মৌচাকে আর জায়গা মেলে না, শ্রমিকরা তাদের তাড়িয়ে দেয় এবং পরিত্যক্ত পুরুষ-মৌমাছি খেতে না খেতে পেয়ে মারা যায়।

(iii) **ওয়ার্কার (Worker) বা শ্রমিক-মৌমাছি** - এরা নিষিক্ত ডিম থেকে সৃষ্ট কিন্তু এদের জননতন্ত্র অপরিণত এবং এরা প্রজনন-ক্ষমতা বিহীন। কোন পরিণত মৌচাকে সংখ্যায় এরাই সর্বাধিক এবং যৌন মিলন ও ডিম পাড়া ব্যতীত মৌচাকের জন্য দরকারী সব কাজ এরাই ছোট ছোট দলে ভাগ হয়ে সম্পন্ন করে। কোন কোন গোষ্ঠীর মৌমাছিতে ডিম দিতে সক্ষম এমন শ্রমিকও দেখা যায় (দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ও সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে)। প্রজনন-ক্ষমতাহীন, বন্ধ্যা শ্রমিক বাইরে গিয়ে ঘুরে-ফিরে খাবার সংগ্রহ করে আনা, চাককে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, দেহজাত মোম দিয়ে চাক বানানো / বাড়ানো, অপরিণতদের যত্ন নেওয়া ও খাওয়ানো, বাসার আভ্যন্তরীণ পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা এবং তাপ ও আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণে রাখা, সোয়ার্মিং বা বাইরে গেলে পরিবর্তিত বাসার জন্যে উপযুক্ত নতুন স্থান বাছা প্রভৃতি বিবিধ দরকারী কাজ করে যার ফলে কোন পরিণত বাসা সুন্দরভাবে সক্রিয় থাকে। শ্রমিকের জীবদ্দশা সাধারণতঃ 5-6 সপ্তাহের; শীতকালে শ্রমিক পূর্ণাঙ্গ দশা পেলে শীতের সময়ে নির্জীব / নিষ্ক্রিয় থেকে কাটিয়ে দেয় এবং এদের জীবদ্দশা 6 মাস বা তার বেশী সময়ের হতে পারে। শ্রমিক মৌমাছির কাজের ধারায় একটি পদ্ধতি লক্ষণীয়। প্রথমে এরা বাসায় থেকে আভ্যন্তরীণ কাজ কর্মেই নিযুক্ত থাকে (**হাইভ-বী/ Hive bee** দশা) এবং এতে 'পরিপক্কতা' লাভ করে **ফিল্ড-বী / field bee** দশায় যায় অর্থাৎ বাইরের কাজে নিযুক্ত হয়। কাজের ধরণ অনুযায়ী তিনভাগে এদের ভাগ করা চলে - ওয়াটার ক্যারিয়ার বী (Water carrier bee) বা বাসায় জল-সংগ্রহ করে আনয়নকারী শ্রমিক এবং পরাগ বা পুষ্পমধু সংগ্রহ করে আনয়নকারী দুরকমের শ্রমিক। বাসার মাত্র কয়েকটি (তিন, চারটি) 'প্রাচীনতম' বা 'বয়সে জ্যেষ্ঠ' শ্রমিক এসব কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। খাদ্যান্বেষী শ্রমিক কয়েক কিলোমিটার দূরে পর্যন্ত চলে যায় এবং পরিবেশের উল্লেখযোগ্য গঠন। সূর্যের অবস্থিতি, প্রাকৃতিক উপাদান যা যোগাযোগের সহায়ক প্রভৃতির উপর ভিত্তি করে নিজেদের যথাযথ পরিচালিত করে। অবশ্য মৌমাছিদের নিজস্ব যোগাযোগ পদ্ধতি আছে যা ওরা বী-ড্যান্সের (Bee dance) মাধ্যমে অথবা ফেরোমেন নামক দেহজাত রসের আকর্ষক গন্ধের সাহায্যে কার্যকর করে।

a) **যোগাযোগ রক্ষার আচরণ** - সমাজবদ্ধ পতঙ্গে একই প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে যোগাযোগ রেখে চলা প্রয়োজনীয় এবং এ বিষয়ে মৌমাছি-প্রজাতিদের ব্যবস্থাসমূহ খুবই আকর্ষণীয়। বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী কার্ল ভন ফ্রিস্ক (Carl von Frisk) মৌমাছিদের পারস্পরিক যোগাযোগ দেহ-ভঙ্গীমার বিচিত্র আচরণ-বিধির যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হন। দেহ-ভঙ্গীমার হের-ফের ঘটিয়ে শ্রমিকদের মধ্যে যে যোগাযোগ ঘটে ও "তথ্যের" বিনিময় হয় তার নাম দেন বী-ল্যাঙ্গুয়েজ (Bee language) এবং ভঙ্গিমা-সমষ্টিকে উল্লেখ করেন বী-ড্যান্স (Bee

dance) নামে। বাইরে গিয়ে খাদ্য-উৎসের হদিশ করে আসা শ্রমিক বাসার শ্রমিকদের কাছে মুখ্যতঃ দু ধরণের ভঙ্গীমা বা "নৃত্য" প্রদর্শন করে; উৎস দূরের হলে উদরাংশ নাচিয়ে অর্থাৎ টেইল ওয়াগিং (tail wagging) করা হয়, কাছের হলে ঘূর্ণন নাচ বা রাউন্ড ড্যান্স (round dance) করে জানানো হয়। সাধারণতঃ উৎস বাসা থেকে 50 মিটার বা তার বেশী দূরের হলে শ্রমিক অর্ধ-বৃত্তাকারে (বাংলা ৪/ ইংরেজী 8) ঘুরে ঘুরে ওয়াগিং ড্যান্স করতে থাকে এবং এ থেকে উৎস কোন দিকে তার ইঙ্গিতও মেলে। যদি এ নাচ ভূমির সঙ্গে সমান্তরাল (হোরাইজোন্টাল প্লেন \ Horizontal plane) হয় তাহলে নাচের সরলরেখার দিকটাই হয় উৎসের দিক। যদি তা ভূমির সঙ্গে লম্বালম্বি রেখার (ভার্টিকেল প্লেন \ Vertical plane) হয় তাহলে সূর্যের সঙ্গে তার অবস্থিতির কৌণিক সম্পর্কই উৎসের দিশারী হতে পারে। অবশ্য এর জন্যে সূর্য্যকে আকাশে প্রকাশিত থাকতে হবে এমন প্রয়োজন নেই (মেঘাচ্ছন্ন আকাশে সূর্যের অবস্থিতি দেখা যায় না) কারণ মৌমাছি সূর্য-নির্গত অতি-বেগুনী রশ্মিতে সংবেদনশীল; তা থেকেই উৎসের অবস্থিতি সম্পর্কে দরকারী ইঙ্গিত মেলে। অন্য এক নিরিক্ষায় দেখা যায় এ ব্যাপারে ডানাজোড়ার বিভিন্ন মাত্রার কম্পনের দ্বারা সৃষ্ট শব্দও সহায়ক হয়। শব্দের তীব্রতা খাদ্যের গুণাগুণ ও খাদ্য-উৎসের অবস্থিতির নির্দেশক হতে পারে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা চলে বী-ড্যান্সের **গতির হার** খাদ্য-উৎসের পরিমাণের সঙ্গে সরাসরি সমানুপাতিক-পরিমাণ বেশী হলে **গতির হার** হবে বেশী, পরিমাণ কম হলে **গতির হার** হবে কম।

b) **আরো কিছু আচার-আচরণ** - i) একক রাণী-ভিত্তিক মৌমাছি-বাসায় রাণীর 'সুস্থতা ও কার্য্যকারিতা' তদারকি শ্রমিকদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সুস্থদেহী রাণী মাঝে মাঝে তার দেহ থেকে গন্ধযুক্ত রসের নিঃসরণ ঘটায় (এ রসকে বলা হয় কুইন সাবস্ট্যান্স / Queen suntance) যা তার তদারকী শ্রমিকরা (ধাত্রী শ্রমিক / nursing worker) খেয়ে ফেলে। সাধারণ শ্রমিকরা এই ধাত্রী শ্রমিকদের সঙ্গে প্রায়ই ট্রোফ্যালাক্সিস (Trophallaxis) পদ্ধতিতে খাদ্য বিনিময় করে এবং কুইন সাবস্ট্যান্সের অক্ষুন্নতা সম্পর্কে অবহিত হয়। কিন্তু রাণী অসুস্থ / অকেজো হলে কুইন সাবস্ট্যান্সের পরিমাণ কমে বা বন্ধ হয়ে যায়। তখনই শ্রমিকরা 'সজাগ' হয় এবং নতুন রাণীর লালন করে তাকে বাসায় প্রতিষ্ঠা করতে উদ্যোগী হয়। কোন মৌচাক দীর্ঘ সময় ধরে সক্রিয় রাখতে এ কর্ম ধারা খুবই দরকারী এবং পুরানো, অকেজো রাণী বদলে বাসায় নতুন রাণীর প্রতিষ্ঠার পদ্ধতিটিকে বলা হয় সুপারসিডিউর (Supersedure)। ii) প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যায় যে কোন মৌচাকে মৌমাছি সংখ্যা বেশী হলে বাসার রাণী কিছু পুরুষ এবং বহু শ্রমিক মৌমাছিসহ বাসা ছেড়ে উড়ে দূরে চলে যায় ও নতুন বাসার পত্তন করে। পুরাতন বাসায় পড়ে থাকে কিছু তদারকী শ্রমিক এবং অপরিণত দশার রাণী ও শ্রমিক। এদের মধ্যে প্রথম যে রাণী পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে সেটি তীক্ষ্ণ, সরু শব্দ করতে থাকে (বোদ্ধা / বিশেষজ্ঞের মতে, বাসায় অন্যান্য অপরিণতদের মধ্যে রাণী হবে এমন অপরিণতদের প্রতি ক্রোধ ও হিংসার প্রকাশ এই শব্দ) এবং যে কটি রাণী পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে তাদের এক এক করে পরিণত রাণী হুল ফুটিয়ে মেরে ফেলে। এভাবে সে বাসায় রাণী হিসেবে তার 'অস্তিত্ব ও আধিপত্য' বজায় রাখে। iii) মৌমাছির এপিস ইন্ডিকা প্রজাতিতে অন্য চাক থেকে মধু অপহরণ করার প্রবণতা খুব বেশী. বছরের যে সময়ে ফুলের প্রস্ফুটন কমে বা ফুলে তার মধুর পরিমাণ কমে তখন আহরণকারী শ্রমিকরা অনেক পরিশ্রমেও প্রয়োজনমত মধুর জোগান পায় না। এরকম অভাবের সময়ে বা ডার্থ পিরিয়ডে (Dearth period) মৌমাছি -শ্রমিকদের মিষ্টি বা মুদীর দোকানে বেশী দেখা যায়। সঙ্গে সঙ্গে ওরা 'কমজোর' মৌচাকও খুঁজে বেড়ায় এবং তার সন্ধান পেলে বাসার শ্রমিকদের প্রতিরোধ ভেঙ্গে ফেলে বা তাদের 'ফাঁকি দিয়ে' বাসার সঞ্চিত মধু নিয়ে যায়। অপহৃত বাসার পরাজিত শ্রমিকরা কখনো, কখনো এতটাই কাবু হয় যে

শেষ দশায় বাধা দেওয়া তো দূরের কথা, বিজয়ী শ্রমিকদের সাথে ওরা নিজেরাও বাসার মধু বয়ে ওদের বাসায় রেখে আসে।

iv) মৌমাছি ও অন্যান্য হাইমেনোপ্টেরা বর্গভুক্ত সমাজবদ্ধ পতঙ্গে অনিষিক্ত ডিম থেকে সৃষ্ট হওয়ায় পুরুষেরা হ্যাপ্লয়েড (haploid) দশা কিন্তু নিষিক্ত ডিম থেকে সৃষ্ট হওয়ায় স্ত্রী ও শ্রমিকদের ডিপ্লয়েড (Diploid) দশা যা এককথায় হ্যাপ্লো-ডিপ্লয়েডি (Haplo-Diploidy) বলে অভিহিত উল্লেখযোগ্য কারক বা ফ্যাক্টর (Factor) হিসেবে পরিগণিত। এর দরুণ হাইমেনোপ্টেরা বর্গের সমাজবদ্ধ পতঙ্গে একই বাসার 'বোন' সম্পর্কের সদস্যদের মধ্যে (মৌমাছিতে রাণী ও সমকালীন শ্রমিক মৌমাছি) জিন'গত (gene based) মিল সবচাইতে বেশী; 'মা' ও 'কন্যা'র (রাণী ও তার ডিম থেকে উৎপন্ন স্ত্রী) চাইতেও বেশী। তাই মৌমাছিতে অলট্রুইজম (Altruism) অর্থাৎ ঘনিষ্ঠজনের জন্য সব দিয়ে কিছু করার প্রবণতা / প্রবৃত্তি বর্তমান। বাসার রাণী'র সঙ্গে সমকালীন শ্রমিকদের উৎপাদনগত দিক থেকে 'বোন' সম্পর্ক, তাই এই রাণী / কোন শ্রমিকের বিপদে অন্য শ্রমিকরা মরণপণ সাহায্য করে (বিপদ কোন আক্রমণকারী হলে শ্রমিকরা হুল ফোটায় যা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় ও প্রোথিত দশায় ক্রিয়াশীল থেকে অধিকতর কার্যাকর হয়)।

3) **পিপীলিকার আচরণ-বিধি** ঃ পিপীলিকায় সমাজবদ্ধ জীবনের ধরণ-ধারণ আমাদের মত যথেষ্ট উন্নতমানের ও জটিল। বলা হয় - মেরুদন্ডীর মধ্যে সমাজবদ্ধ প্রাণী-গোষ্ঠী হিসাবে মানুষ যে স্তরে, অমেরুদন্ডীর মধ্যে পিপীলিকার স্থানও সে স্তরে। এ পৃথিবীর ভালো জানা প্রায় ছ'হাজার পিপীলিকা-প্রজাতির ৭৭% সমাজবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত এবং এরকম কোন একটি প্রজাতির সদস্যদের আকার, গঠন ও আচার-আচরণের ভিত্তিতে সর্বাধিক উনত্রিশ রকমের জাত ও উপজাতে (কাষ্ট / সাবকাষ্ট, caste/subcaste) ভাগ করা যায়। সে বিচারে বহুরূপ-দশা (পলিমর্ফিজম / Polymorphism) পিপীলিকা-প্রজাতিতে সর্বাধিক। প্রধান কয়েকটি জাত বা কাষ্টভুক্ত (caste) সদস্যদের বৈশিষ্ট্য মুখ্যতঃ এরকম - i) **কুইন বা গাইনি (Queen/gyne)** জাতের পিপীলিকা; এরা প্রজননে সক্ষম বড় আকারের স্ত্রী (যদিও ডানাহীন দশায় পর্যবসিত) এবং এদের পা ও শুঙ্গ সুগঠিত, ঈষৎ হ্রস্ব। চোয়ালজোড়া সুদৃঢ়। গাইনি পিপীলিকা আবার দু'ভাগে ভাগ করা যায় - **মাইক্রোগাইনি (microgyne)** যারা আকারে অপেক্ষাকৃত ছোট এবং **ম্যাক্রোগাইনি (macrogyne)** যারা আকারে বড়। একটু পুরানো হলে স্ত্রী সাধারণতঃ ডানাবিহীন হয় এবং ওদের উদরের মাপ যায় বেড়ে। একটি পিপীলিকা-বাসায় একাধিক রাণী থাকে; তাই এদের বাসা পলিগাইনিক (polygynic) বাসা। রাণী-পিপীলিকার আয়ু আঠারো বছর পর্যন্ত হতে পারে। কিছু প্রজাতির শ্রমিক বাসার অবস্থা বিশেষে (রাণী ডিম দিতে আর সক্ষম না হলে বা রাণী মারা গেলে) স্বীয় জননতন্ত্র সক্রিয় করে নেয় ও ডিম পাড়ে; এসব শ্রমিককে বলা হয় গাইনিকয়েড (Gynaecoid)।

ii) **পুরুষ** বা **এনার (Aner)** - ছোট মাপের ডানাযুক্ত এবং প্রজনন কাজের অংশীদার এরা। আকারের ভিত্তিতে এদেরও দু'ভাগে ভাগ করা যায় অনেক প্রজাতিতে; ছোট চেহারার পুরুষ-পিপীলিকার নাম **মাইক্রেনার (micraner)** এবং বড় চেহারার পুরুষ - পিপীলিকার নাম **ম্যাক্রেনার (Macraner)**। iii) **শ্রমিক বা এরগেট - (Erget)** পিপীলিকা; এরা আসলে প্রজনন-ক্ষমতাহীন অগঠিত যৌনাঙ্গযুক্ত স্ত্রী-পিপীলিকা এবং অনেক ক্ষেত্রেই এদেরও কয়েকটি উপজাতিতে (subcaste) ভাগ করা যায় - অপেক্ষাকৃত বড় চেহারার ম্যাক্রেগেট (macrergate) শ্রমিক বা ওয়ার্কার মেজর **(worker major)** এবং ছোট মাপের **মাইক্রেগেট (micrergate)** শ্রমিক বা **ওয়ার্কার মাইনর (worker minor)**। সংখ্যায় একটি বাসায় শ্রমিকের সংখ্যা সর্বাধিক। বাসা সংরক্ষণ সাফাই,

সারাই ও বাড়ানো, বাসার অন্য জাতের সদস্যদের সব দশার যথাযথ লালন-পালন, বাসার জন্যে খাদ্য-সংগ্রহ ও খাদ্য-সঞ্চয় প্রভৃতি যাবতীয় কাজ করে। সদা-ব্যস্ত শ্রমিকদের আচরণবিধি তাই খুব বৈচিত্র্যময়। **iv) সৈনিক / সোল্‌জার বা ডাইনার্গেট - (Soldier/Dinnergate)** পিপীলিকা যারা বাসার লড়াকু সদস্য (আসলে বড় চেহারার শক্ত বড় চোয়াল ও মস্তক-মণ্ডিত শ্রমিক পিপীলিকা), ডানাবিহীন এবং প্রধান কাজ শত্রুদের রোখা বা অন্য প্রজাতির পিপীলিকার বাসা আক্রমণ করা, শক্ত খাবার গুড়ো করা প্রভৃতি।

এবার আমরা পিপীলিকাদের আচার-আচরণের বৈষম্য ও বৈচিত্র্যের কিছু উল্লেখযোগ্য নমুনা সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কোরবো -

a) **বাসা নির্মাণের আচার - আচরণ :** পিপীলিকার বাসাকে ইংরেজীতে বলা হয় ফর্মিকেরিয়াম / মির্মিকেরিয়াম (Formicarium / Myrmecarium) . ডরাইলিনি (Dorylinae) নামক অর্ধ-পরিবারভুক্ত চক্ষুহীন পিপীলিকারা কোন বাসা বানায় না। জীবনভোর সার বেঁধে ঘুরে বেড়ায় এবং প্রয়োজনে পাথর বা পড়ে থাকা গাছের টুকরো, ঝরা পাতার স্তূপ প্রভৃতির আড়ালে সাময়িক বিশ্রাম নেয়। এদের কিছু প্রজাতির সদস্যরা অন্য পিপীলিকা প্রজাতির স্থায়ী বাসা থেকে তাদের তাড়িয়ে দিয়ে ওখানেও সাময়িক বিশ্রাম নিয়ে থাকে। একই বাসার বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পিপীলিকা - প্রজাতির ভাগাভাগি করে থাকা বা কোন নির্দিষ্ট স্থানে খুব কাছাকাছি নিজেদের পৃথক বাসা বানিয়ে থাকার অভ্যাসও প্রায়ই দেখা যায় (এ ধরণের গায়ে-গায়ে-লাগা বাসার সমষ্টিকে বলা হয় জটিল বাসা - কম্পাউণ্ড নেস্ট / Compound nest) - একত্রে থাকার এসব অভ্যাসের পোষাকী নাম প্লেসিওবায়োসিস (plesiobiosis) এবং দলবদ্ধ অবস্থানে যারা বেশী 'সুযোগ সন্ধানী' তারা অন্যদের 'অজান্তে' কিছু সুযোগ-সুবিধা বিশেষতঃ সংগৃহীত খাবার আদায় করে নেয়।

অনেক পিপীলিকা-প্রজাতিই মাটির নীচে বাসা বানায় যাতে থাকে অনেক প্রকোষ্ঠ ও সংযোগকারী সরু পথ। অনেক ক্ষেত্রে এসবে থাকে 'ছত্রাক-চাষের' জন্য বিশেষ অংশ। ছোট-বড় বা ছড়ানো মাটি-কণার ঢিপি এরকম অনেক বাসারই বহিরাংশ। লম্বালম্বিভাবে বিন্যস্ত বাসা 70 সেন্টিমিটার পর্যন্ত মাটির গভীরে যেতে পারে। আবার এমনও বাসা গঠিত হয় যা পাথরের আড়ালে আড়াআড়িভাবে ছড়ানো প্রকোষ্ঠ ও টানেলের সমষ্টিমাত্র। গাছের বিভিন্ন অংশে নানাভাবে পিপীলিকা বাসা বানায় এবং ওসবের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দু-তিন ধরণের বাসার একটু বর্ণনা দেওয়া প্রাসঙ্গিক যেহেতু তা সংশ্লিষ্ট পিপীলিকা-প্রজাতির শ্রমিকদের আচার-আচরণকে বুঝতে সাহায্য করে: - 1) ভারতীয় রেড ট্রি অ্যান্ট /(Indian Red Tree Ant) আম বা দেবদারু গাছে পাতার ধার পরস্পর সংবদ্ধ করে পাতার গোলাকৃতির বাসা বানায় যাতে থাকে নানা মাপের টানেলের মত ছোট বড় ফাঁক এবং ওসবে বাস করে অপরিণত দশা ও পূর্ণাঙ্গ দশার সদস্যরা। এরকম বাসা বানানোর কাজটি কৌশলগত দিক থেকে বেশ আকর্ষণীয় - একটি পাতার একধারে শ্রমিকরা সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ও নিজের শরীরকে পার্শ্ববর্তী পাতার দিকে ঠেলে দেয়; একাই নাগাল পেলে সেই পাতা কামড়ে কাছে টেনে আনে। একা যদি নাগাল না পায় তাহলে অন্য শ্রমিকের 'কোমর' কামড়ে তার সামনের অংশ ঐ পাতার দিকে ঠেলে দেয় এবং দুজনে যুক্তভাবে যথাসম্ভব প্রলম্বিত হয়ে ওই পাতা কামড়ে কাছে টেনে আনে (প্রয়োজনে এরকম পদ্ধতিতে তিন নম্বর বা তার বেশী শ্রমিকও সামিল হতে পারে)। এখন যে পাতা টেনে কাছে আনা হোল তার ধারে দাড়ানো থাকে অন্য শ্রমিক-পিপীলিকা যার মুখে থাকে একটি শূককীট (নিজেদেরই কোন শূককীট যার দেহ থেকে নিঃসৃত হয় রেশম সুতোর মত রস) এবং ঐ শূককীট নিঃসৃত 'সুতো' দিয়ে সংবদ্ধ পাতা দুটো এবার পুরোপুরি জোড়া লাগানো হয়। এভাবে পাশাপাশি আরো পাতা জোড়া দিয়ে শ্রমিকরা বড় মাপের পাতার গোলকার বাসা বানায়। 2) গাছের কাণ্ডের শক্ত অংশ

শ্রমিক-পিপীলিকা এখানে-সেখানে কামড়ে নষ্ট করে ও জায়গাটা ফাঁপা হয়; অনেক সময় অন্য কারণেও কাণ্ডের অংশ-বিশেষ ফাঁপা হতে পারে। গাছ-নিবাসী কিছু পিপীলিকা প্রজাতি ওসবে বসবাস করে, ফাঁপা অংশের দেয়ালে এখানে-সেখানে ফুটো করে যাতায়াতের পথ করে নেয়। 3) বড় আকারের পুরানো, গোলাকার বলের মত স্ফীতি উদ্ভিদ-দেহের বিভিন্নাংশে দেখা যায়; নানা মাপের এসব স্ফীতি কলাকোষের হঠাৎ বৃদ্ধির দরুণ ঘটে দূষিত কোন জৈবিক-পদার্থ কোনভাবে ওখানে ক্রিয়াশীল হয় এ কারণে (সাধারণতঃ গল-মিজ নামক একপ্রকার ছোট মাপের পতঙ্গের আক্রমণে এরকম ঘটে); এসব স্ফীতিকে গল-স্ফীতি (gall) বলা যায় এবং কিছু পিপীলিকা এসবের মধ্যে ঢুকে সুড়ঙ্গ ও প্রকোষ্ঠ বানিয়ে বাসা নির্মাণ করে। অনুরূপভাবে কিছু পিপীলিকা স্ফীত বাল্ব (bulb) নামক বিশেষ উদ্ভিদাংশে বাসা বানিয়ে থাকে। 4) গাছে পিপীলিকার অন্য এক প্রকারের ফোলানো বা উদ্ভিদাংশের দেহ-সংলগ্ন বহু আবরক পাতের বুননে তৈরী কার্টন নেস্টও (carton nest) উল্লেখযোগ্য। সংশ্লিষ্ট প্রজাতির পিপীলিকা-শ্রমিকরা নীচ থেকে মাটির দানা সংগ্রহ করে গাছের নির্দিষ্ট স্থানে এনে শূককীট-দেহ নিঃসৃত রেশম-গ্রন্থির রসের সঙ্গে মিশিয়ে প্রথমে ছোট ছোট ঢেলার পিণ্ড বানায়; তারপর তার প্রতিটিকে ওরা পা ও চোয়াল দ্বারা চেপে কাগজের মত পাতলা পাতে পরিণত করে এবং গাছের নির্দিষ্ট স্থান ঢেকে ওই পাতগুলো পরস্পর-সংবদ্ধ করে বিভিন্ন আকার ও মাপের বাসা বানায় (এগুলোকে অনেকে পেপার নেস্ট /paper nest বলে উল্লেখ করে)। 5) কিছু প্রজাতির পিপীলিকা শ্রমিকরা অপেক্ষাকৃত নির্জন ও ছায়াচ্ছন্ন স্থানে চারপাশের খড়-কুটো সংগ্রহ করে মাটির ওপরেই ওসবের বড় ঢিপি বানায় এবং তার ফাঁকে ফাঁকে বাস করে; বড় মাপের এরকম ঢিপি তিন মিটারের চেয়েও বেশী উঁচু হতে পারে।

b) **জাত-উপজাত গঠনে ও নতুন বাসার পত্তনে আচার-আচরণ ঃ** পিপীলিকা নির্মিত বাসা সাধারণতঃ স্থায়ী ধরণের এবং প্রায় ফি-বছরই আকারে তা অল্প হলেও আকারে বাড়ানো হয়। পরিণত এরকম একটি বাসার সদস্য-সংখ্যা কয়েক হাজার থেকে পাঁচ লক্ষ পর্যন্ত হতে পারে। এসব বাসায় পিপীলিকা ছাড়াও অন্য প্রাণী যেমন মাকড়সা, কয়েকধরণের পতঙ্গ বিশেষত বীট্‌ল্ (beetle) পতঙ্গ, ক্রাস্টেশিয়া শ্রেণীর (Crustacea) প্রাণী প্রভৃতি থাকে। এরা 'অতিথি' বা অ্যান্ট গেস্ট (ant guest) ও মির্মিকোফিল (myrmecophile) এবং চার ধরণের হতে পারে - 1) **সিনেকথ্রান্স (synechthrans)**, বাসার মৃত প্রাণী / বর্জ্য বস্তু খেয়ে বাসা সাফ করে (স্ক্যাভেঞ্জার / scavenger জাতীয়), 2) **সিনেকীটস্ (synoeketes)**, বাসার উপেক্ষিত / অপ্রয়োজনীয় 'অতিথি' প্রাণী, 3) **সিমফিল্‌স্ (symphiles)**, ঈপ্সিত 'অতিথি' প্রাণী যাদের পিপীলিকা যত্ন করে রাখে এবং তাদের দেহজাতরস 'সুখাদ্য' হিসাবে খায়, 4) পরজীবী (parasitic) ঃ পিপীলিকায় সমাজবদ্ধ এবং অতি ঘনিষ্ঠ সিমবায়োসিস **(symbiosis)-সহাবস্থান** বা সোস্যাল সিমবায়োসিস দেখা যায় - দুটো পৃথক প্রজাতি বা গণভুক্ত পিপীলিকা একটি বড় বাসার দুটি অংশে তাদের অপরিণতদের আলাদা রেখে বসবাস করে; কোন বড় বাসার কাছ ঘেঁষে অন্য প্রজাতি তার ছোট বাসায় থাকে ও বড় বাসার সদস্যদের পরিত্যক্ত খাবার খায় কিংবা ঐ বাসার কোন খাবার নিয়ে ঘরে-ফেরা সদস্যকে একলা ধরে খাবার কেড়ে নেয়; কখনো কখনো অন্য প্রজাতির রাণী বাসায় ঢুকে তার রাণীকে চুপিসাড়ে মেরে নিজেই তাঁর জায়গার দখল নেয় এবং বাসার শ্রমিকরা ধীরে ধীরে তা মেনে নেয়। একসময়ে বাসাটা পুরোপুরি আগন্তুক রাণী ও তার বংশধর অধ্যুষিত হয়।

প্রকৃতিতে পারিপার্শ্বিক সব উপাদান যথাযথ মাপের হলে কাছাকাছি সব পিপীলিকা-বাসা (একই প্রজাতির) থেকে পরিণত স্ত্রী ও পুরুষ-পিপীলিকা আকাশে উড়ে যায়। কোন গাছের মাথা বা উঁচু কোন কিছুর চারধারে পুরুষরা ঝাঁক বেঁধে উড়তে থাকে এবং স্ত্রী-পিপীলিকা এসব ঝাঁকের মধ্যে ঢুকে যায়। স্ত্রী ও পুরুষ-পিপীলিকার

যৌনমিলন ঘটে এবং ঐ সংবদ্ধ দশায় স্ত্রী ও পুরুষ একত্রে মাটিতে নামে ও পৃথক হয়। স্ত্রী-পিপীলিকাটি এবার তার ডানাজোড়া খসায় ও ছোট একটি বাসা বানায় যাতে সে ডিম পেড়ে তার প্রথম প্রজন্মের সৃষ্টি করে। এরা সবাই রাণী এবং তাদের রাণীটিকে শুধু ডিম পাড়ার জন্যে রেখে বাসা দ্রুত বাড়ানো থেকে বাসার যাবতীয় কাজ-কর্মের দায় ওরাই বহন করে। পিপীলিকায় জাত-উপজাতের পৃথকীকরণ ঘটে এবারে - নিষিক্ত ডিম থেকে স্বাভাবিকভাবে গঠিত হয় স্ত্রী-পিপীলিকার অপরিণত দশা যার পরবর্তী গঠন পূর্ণমাত্রার হলে (বিশেষ পুষ্টি ও মাতৃজ বিশেষ ফেরোমোন প্রভাবের দরুণ) সে হয় পূর্ণাঙ্গ, পরিণত স্ত্রী - পিপীলিকা; অন্যথায় সে হয় শ্রমিক-পিপীলিকা। বাসার প্রয়োজনে অপেক্ষাকৃত 'কম-বয়স্কা' রাণীরা কখনো কখনো ছোট ছোট ডিম পাড়ে যা থেকে সৃষ্ট হয় শুধু শ্রমিক-পিপীলিকা।

c) খাদ্যাভ্যাস ভিত্তিক আচার-আচরণ : বর্তমান সময়ে যত পিপীলিকা-গোষ্ঠী ও তাদের আচার-আচরণের বৈচিত্র্য আমরা জানি তা প্রধানতঃ গড়ে উঠেছে দীর্ঘ সময় ধরে বংশ-পরম্পরায় খাদ্য-সংগ্রহ প্রচেষ্টা ও খাদ্যাভ্যাসের হের-ফের অর্থাৎ বিভিন্নতা থেকে। ডোরাইলিনি (Dorylinae) উপপরিবারের ড্রাইভার-পিপীলিকারা শিকারী জীবন যাপন করে। এসব পিপীলিকা এবং পনারিনী ও মির্মিসিনি (Ponerinae / Myrmecinae) উপপরিবারের পিপীলিকারা মুখ্যত মাংসাশী। বাকী সব পিপীলিকা গোষ্ঠীর খাদ্য উদ্ভিদাংশ এবং কোন কোন ক্ষেত্রে এফিড, স্কেল ইনসেক্ট (aphid, scale insect) প্রভৃতি পতঙ্গের দেহ-নিঃসৃত হানি-ড্যু (honey-dew) নামক স্যাকারিন-সমৃদ্ধ রস। মির্মিসিনির কিছু প্রজাতির শ্রমিক-পিপীলিকারা শস্য-দানা সংগ্রহ করে এবং ক্ষেত্রবিশেষে দানার অংকুর খেয়ে রোদে শুকিয়ে দানা সঞ্চিত রাখে ভবিষ্যতের খাদ্য-ভান্ডার হিসাবে। এসব পিপীলিকাদের হার্ভেস্টিং অ্যান্ট (Harvesting ant) বলা হয় এবং এদের এট্টিনি (Attini) গোষ্ঠীর পিপীলিকারা মাটির নীচে নিজেদের বিশেষ প্রকোষ্ঠে খাদ্য হিসাবে ছত্রাকের চাষ করে। গাছের পাতা কেটে ওদের শ্রমিকরা বাসায় আনে এবং তা টুকরো করে স্বীয় দেহের বর্জ্য-পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে কম্পোস্টের মত দলা পাকিয়ে প্রকোষ্ঠে রাখে যাতে পচনশীল এসব জৈবপদার্থে ছত্রাক গজায় ও দ্রুত বৃদ্ধিলাভ করে ছত্রাকের বাগানে (fungus garden) পরিণত হয় ছত্রাকের অংশবিশেষ সংশ্লিষ্ট পিপীলিকার প্রিয় খাদ্য (এট্টিনি গোষ্ঠীর এই শ্রমিক-পিপীলিকারা পাতা কাটে একটি বিশেষ নিয়মে - প্রতি পিপীলিকা নিজের পা কম্পাসের মত চারপাশে ঘুরিয়ে ঐ মাপের পাতার অংশ কাটে)।

হানি-ড্যু ক্ষরণকারী পতঙ্গদের উপকৃত পিপীলিকা শ্রমিকরা নানাভাবে সংরক্ষণ দেয়। এমনকি, শ্রমিকরা শীতের আগে এফিডের ডিম সংগ্রহ করে তাদের বাসায় এনে রাখে এবং ঐ ডিম থেকে পূর্ণাঙ্গ এফিড সৃষ্টি হলে তা সংগ্রহ করে বাসার কাছে উদ্ভিদ-দেহে রেখে দেয় যাতে প্রয়োজনমত হানি-ড্যু পাওয়া যায় (এফিড-জাতীয় পতঙ্গ যারা হানি-ড্যু জোগায় তাদের পিপীলিকা-ধেনু বা অ্যান্ট-কাউ / ant cow বলা হয়; পিপীলিকা-শ্রমিক মাঝে মাঝে এদের 'দোহন / তোষণ' করে হানি-ড্যু নামক 'দুধ' বার করে খায়)। কিছু পিপীলিকা প্রজাতির (হানি অ্যান্ট / মধু পিপীলিকা প্রজাতি) শ্রমিক সংগৃহীত পুষ্প মধু, হানি ড্যু প্রভৃতি তরল খাদ্য অসম্ভব রকমে ঠেসে উদরে ভর্তি করে এবং এমনভাবে যে পাতলা পর্দা দ্বারা গঠিত উদর বহুগুণ বেড়ে যায় আকারে এবং তার শক্ত প্লেট বা পাতাগুলো আর পরস্পর সংলগ্ন থাকে না, বিচ্ছিন্ন দশায় থাকে। উদরে সঞ্চিত খাবার শ্রমিকরা শুধু নিজেরাই খায় না বাসার সবাইকে প্রয়োজনমত রিগার্জিটেট (regirgitate) বা উগ্‌রে বার করার পদ্ধতিতে খাওয়ায়। এরা তাই বাসার খাদ্য-ভান্ডার এবং বাসার রিপ্লিট শ্রমিক (replete worker) বা হানি পট অ্যান্ট (honey pot ant) নামে অভিহিত।

বর্তমান প্রসঙ্গে শেষ কথা বলতে হয় স্লেভ-মেকিং পিপীলিকাদের নিয়ে (slave making ants) যারা অন্ততঃ চারটি গণের অন্তর্ভুক্ত, পুরো উত্তর গোলার্ধ জুড়ে পরিব্যাপ্ত। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার ব্লাড-রেড অ্যান্ট (blood-red ant) স্বীয় গণভুক্ত অন্য কয়েকটি প্রজাতিকে অনায়াসে দাসে পরিণত করে। ব্লাড-রেড অ্যান্টের এক শ্রমিক দল চিহ্নিত প্রজাতির বাসায় হানা দেয় এবং তা থেকে শূককীট সংগ্রহ করে অক্ষত দশায় রেখে নিজেদের বাসায় এনে রাখে। আক্রান্ত বাসার শ্রমিকরা বাধা না দিলে তাদের উপেক্ষা করে / এড়িয়ে যায় আক্রমণকারী শ্রমিকরা। আহৃত শুককীটদের কিছু খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, বাকীরা লালিত হয় এবং পূর্ণাঙ্গ শ্রমিকে পরিণত হয় এবং 'দাস' হিসাবে মালিক প্রজাতির শ্রমিকদের সঙ্গে বাসার কাজ-কর্মে অংশ নেয়। এরকম দাস-শ্রমিকদের উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল আমাজন অ্যান্টরা (Amazon ants) যাদের শ্রমিকরা রাণী ও পুরুষ-পিপীলিকাদের মত কাজ করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, তাই এদের অবলিগেট স্লেভ-মেকার (obligate slave-maker) বলা হয়।

d) **কিছু একক ভিত্তিক ও যোগাযোগের আচার-আচরণ** - এবারে আমরা পিপীলিকাদের কিছু একক ভিত্তিক কাজের কথা আলোচনা করছি। এ বিষয়ে শ্রমিক-পিপীলিকার নিজ দেহ পরিষ্কার করার ধরণটি (প্রসাধনী) উল্লেখযোগ্য এবং বাঁ-পাশে আঁকা ছক 'দ্বারা' সম্পূর্ণভাবে তা দেখানো হয়েছে। পিপীলিকা-শ্রমিক দেহ নানা কাজে লিপ্ত থাকে; তাই তার দেহের নানা স্থানে 'ময়লা' লাগে (অবাঞ্ছিত পরাগরেণু, ধুলি/ মাটি কণা, আক্রান্ত প্রাণীর দেহ-রস বা রোম,আঁশ প্রভৃতি)। এসবের নিরন্তর সাফাই জরুরী যা পিপীলিকা থেকে থেকে থমকে গিয়ে ঘাড় বেঁকিয়ে অ্যান্টেনা, পা ইত্যাদি নাড়িয়ে দেহের বিভিন্নাংশ ঘষে ঘষে পরিষ্কার করে। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি পিপীলিকা অপর পিপীলিকার দেহ থেকে ময়লা তুলে নায় (সোস্যাল গ্রুমিং / social grooming)। পরস্পর যোগাযোগ

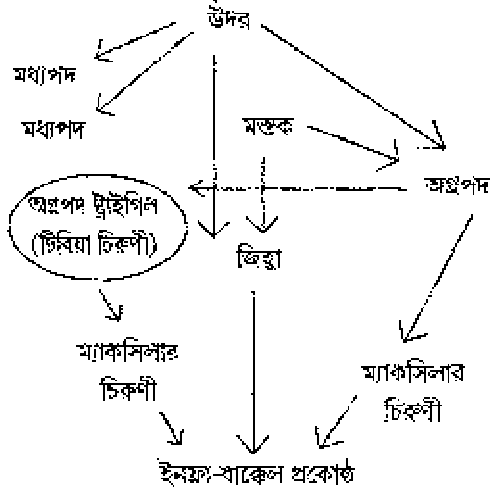

দর্শনেন্দ্রিয় বড় ভূমিকা পালন করে কিন্তু এ বিষয়ে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য গন্ধ রেখা / সেন্ট-ট্রেইল (scent-trail), এলার্ম-ট্রেইল (alarm-trail) প্রভৃতি যার কারণ পিপীলিকা-দেহের বিভিন্ন অংশ বা গ্রন্থি-নিঃসৃত রসের গন্ধ-বিশেষ (চোয়ালের গ্রন্থি, মেটাপ্লুরাল গ্রন্থি, বিষ-গ্রন্থি, পভন গ্রন্থি, দ্যুফোর গ্রন্থি ও পায়ুদেশের গ্রন্থি)। এসবের ক্রিয়া প্রজাতি-ভিত্তিক এমনকি বাসাভিত্তিকও হতে পারে অর্থাৎ কোন প্রজাতির সেন্ট-ট্রেইল তার সদস্যদের মধ্যেই ফলপ্রসু, কোন বাসার সেন্ট-ট্রেইল বাসার সদস্যদের মধ্যেই ফলপ্রসূ। একটি সাধারণ দৃষ্টান্তঃ কোন বাসার শ্রমিকরা বাসা থেকে লাইন করে গায়ে-গায়ে লেগে যখন খাবারের খোঁজে এদিক-সেদিক ঘুরে বেড়ায় তখন ওদের চলার পথের একটুখানি আঙ্গুল দিয়ে ঘষে দিলে দেখা যায়, বাধা পেয়ে শ্রমিকরা নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তারপর ওদের একসঙ্গে মিলিত হয়ে লাইন গঠন করে চলা সুরু করতে অনেক সময় লাগে (গন্ধময় ট্রেইলের খানিকটা ঘষায় মুছে গেছে, নতুন করে ট্রেইল বানিয়ে নিয়ে ওদের চলা সুরু করতে হবে)। এলার্ম ট্রেইল পিপীলিকাদের বিপদ / জরুরী দশা সচেতন করে আক্রমণমুখী বা রক্ষণমুখী করে। পিপীলিকার শুঙ্গ বা অ্যান্টেনাজোড়া সদাচঞ্চল ও স্পর্শ-গন্ধ-সুবেদী অংশমন্ডিত; এদের সাহায্যেই উল্লিখিত ট্রেইলজনিত কাজ সম্পন্ন করে।

(B) আইসোপ্‌টেরা (Isoptera) বর্গভুক্ত পতঙ্গ ঃ

আইসোপ্‌টেরা (Isoptera) বর্গ গঠিত হয়েছে উইপোকাদের নিয়ে যাদের ইংরেজী পরিভাষায় আমরা বলি হোয়াইট অ্যান্ট বা টার্মাইট (white ant / termite) । এদের এক হাজারের অধিক জানা প্রজাতি সমাজবদ্ধ জীবন যাপন করে। পিপীলিকা ও মৌমাছিদের মত এদের মধ্যেও জাত-উপজাত ব্যবস্থা ব্যাপক ও জটিল এবং আচার-আচরণ খুবই বৈচিত্র্যময়। উল্লেখযোগ্য উইপোকার প্রজাতিরা যে সব গণভুক্ত (genus) তাদের নাম - মাইক্রোটার্মিস, ওডোন্টোটার্মিস, টার্মিস (**Microtermes, Odontotermes, Termes**) প্রভৃতি। এবারে আমরা উইপোকা সমাজে ধরণ-ধারণ ও আচরণাদির প্রয়োজনীয় আলোচনা করছি।

(a) জাত-উপজাতের ধরণ ও তাদের আচার-আচরণ ঃ উইপোকা প্রজাতি একাধিক চেহারার সদস্যদের নিয়ে গঠিত অর্থাৎ মৌমাছি ও পিপীলিকার মত সামাজিক পতঙ্গের ন্যায় বহুরূপী বা পলিমর্ফিক (polymorphic)। এরাও নানা ধরণের জটিল বাসা বানায়; তার সংরক্ষণ পরিণত ও অপরিণতদের প্রতিপালন ইত্যাদি বিবিধ কাজের দায় বাসার সদস্যরা ভাগ করে নেয় এবং তদনুসারে তাদের শারীরিক গঠন ও কর্মদক্ষতা থাকে যা ওদের বিভিন্ন জাত ও উপজাতে বিভক্ত করার পক্ষে আমাদের সহায়ক। পিপীলিকার সঙ্গে উইপোকার এ ব্যাপারে একটি প্রধান পার্থক্য এই যে উইপোকার প্রধান দু ধরণের জাতের প্রতিটিতে স্ত্রী এবং পুরুষ উভয়ই থাকে। জাত-উপজাতের রূপ-রেখা নিম্নোক্তভাবে ছকবদ্ধ করে দেখানো যায় ঃ

উইপোকা কলোনী বা উপনিবেশ

- (I) ফার্টাইল (Fertile) বা বা প্রজননে সক্ষম জাত
  - (a) ম্যাক্রোপ্‌টেরাস বা বড়-ডানার উইপোকা
  - (b) ব্র্যাকিপ্‌টেরাস বা ছোট-ডানার উইপোকা
  - (c) আপ্‌টেরাস বা ডানাহীন উইপোকা
- (II) স্টেরাইল (Sterile) বা প্রজননে অক্ষম জাত
  - (d) শ্রমিক
  - (e) সৈনিক
  - (f) নাসুটে

এবারে এদের বৈশিষ্ট্য, কর্মধারা ও আচরণবিধি নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করা যায় -

I. ফার্টাইল কাস্ট (Fertile Caste) বা প্রজননে সক্ষম জাতসমূহ-এর অন্তর্ভুক্ত বাসার পূর্ণগঠিত প্রজনন-ক্রিয়ায় অংশগ্রহণে সক্ষম সবরকমের স্ত্রী ও পুরুষ-উইপোকা। এদের বিভাজন করা হয় এভাবে - (a) **ম্যাক্রোপ্‌টেরাস (Macropterous)** বা বড় ডানার উইপোকা ঃ স্বাভাবিক, সুগঠিত ডানাযুক্ত এরা স্ত্রী হলে হয় প্রকৃত রাণী বা ট্রু-কুইন (true queen) এবং পুরুষ হলে হয় প্রকৃত রাজা বা ট্রু-কিং (true king); এদের প্রাইমারী রিপ্রোডাকটিভস্ (Primary reproductives) বলা হয়। দেহ বর্ণ হলুদ বাদামী বা কালচে, সুগঠিত দুজোড়া ডানা দেহের চেয়েও বেশী দীর্ঘ; বড় ও দূরে-থাকা পুঞ্জাক্ষিজোড়া বর্তমান। একসময়ে এরা ডানা খসিয়ে ফেলে ও বাসার রয়েল চেম্বারে (Royal Chamber) বা রাজকীয় প্রকোষ্ঠে থাকতে সুরু করে। (b) **ব্র্যাকিপ্‌টেরাস বা ছোট ডানার উইপোকা ঃ**

এদের কখনো কখনো বলা হয় সাপ্লিমেন্টারী / সাবষ্টিটিউট / নিওটেনিক (Supplementary/Substitute/Neo-tenic) রাজা ও রাণী (King / Queen); দেহ বর্ণ ফিকে; ডানাজোড়া খুব ছোট পাতের মত, পুঞ্জাক্ষিজোড়াও ছোট। (খ) **আপ্টেরাস (Apterous)** বা **ডানাহীন উঁইপোকা** ঃ এরা শ্রমিকের মত বদলী রাজা বা রাণী উঁইপোকা এবং অনগ্রসর প্রজাতির বৈশিষ্ট্য; ডানাবিহীন এবং অক্ষির অংশ প্রায় নেই; মস্তিষ্ক ও জননতন্ত্র সুগঠিত নয়।

II. ষ্টেরাইল কাষ্ট (Sterile Caste) বা **প্রজননে অক্ষম (বন্ধ্যা) জাতসমূহ**-এদের ডানা নেই এবং জননাঙ্গ অপরিণত। এদের অন্তর্ভুক্ত উঁইপোকার জাত-উপজাতের সদস্যরা প্রজননক্রিয়ায় অংশগ্রহণে অক্ষম কিন্তু বাসা চালু রাখা এবং আর যেসব কাজ রয়েছে তার সবই করা। এদের বিভাজন এইরকম - (a) **শ্রমিক / ওয়ার্কার (worker)** কোন বাসায় সব থেকে বেশী সংখ্যায় এ জাতের সদস্যরা। অপরিণতদের সংরক্ষণ ও লালন-পালন, রাণীকে খাওয়ানো তাকে নজরে রাখা, বাসা বাড়ানো, সাফাই করা, বাইরে থেকে খাবার জোগাড় করে আনা প্রভৃতি ও অন্যান্য কাজ শ্রমিকরাই বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে করে। ওদের দেহ প্রায় বর্ণহীন, চোখ খুব ছোট এবং আকার অনুযায়ী দুটি বা তিনটি উপজাতিতে ভাগ করা যায়। খুব অনগ্রসর গোষ্ঠীর উঁইপোকা শ্রমিকদের বলা হয় ফল্স্ ওয়ার্কার বা সিউডেগেট (False worker/Pseudergates) । b) **সৈনিক (Soldier)** ঃ এরা বিশেষভাবে গঠিত উঁইপোকা; সুগঠিত, বর্ণময় দেহ আকারে অপেক্ষাকৃত বড় যাতে মস্তক ও চোয়ালজোড়া অনেক বড় ও শক্ত; কোন কোন প্রজাতিতে তিন চার রকমের সৈনিক দেখা যায় (দেহ ছোট, মাঝারি বা বড় মাপের)। (c) **নাসুটে (Nasute) উঁইপোকা** ঃ অগ্রসরগণ য়্যুটার্মিস য়ের (*Eutermes* genus) প্রজাতিতে সাধারণ সৈনিক উঁইপোকা মেলে না, তার বদলে এই শুঁড়ওয়ালী নাসুটে বা প্রোবোসিডিয়ান (proboscidean) উঁইপোকাদের দেখা যায়; ছোট মাপের ক্ষীণ চোয়ালযুক্ত ওরা এবং এদের মস্তক সামনের দিকে সরু শুড়ের মত প্রলম্বিত থাকে; এর নাম রষ্ট্রাম এবং এতে একটি গ্রন্থির নল উন্মুক্ত হয়। নাসুটে সৈনিকরা শত্রুর দিকে এই গ্রন্থির রস প্রক্ষেপ করে তাকে কাবু করে; তাছাড়া শ্রমিকরা পাথর বা সিমেন্টে যখন বাসা বানায় তখন নাসুটেদের ঐ গ্রন্থির রস শক্ত জিনিষ নরম করে দেয়। বন্ধ্যা উঁইপোকারা 2-4 বছরের মত বাঁচে।

কোন নতুন কলোনীর (উপনিবেশের) পত্তন করতে কাছে-ভিতের বাসা থেকে ডানাওয়ালা রিপ্রোডাক্টিভরা সব একই সময়ে আকাশ-বিহারী হয় (স্ত্রী ও পুরুষ উঁইপোকা প্রায় সমান সংখ্যায় বাসা ছাড়ে) এবং সাধারণতঃ বর্ষাকালে বা বৃষ্টির অব্যবহিত পরে এই ঝাঁক বেঁধে উড়ার ঘটনা ঘটে (সোয়ার্মিং / Swarming) যা দূরে ছড়িয়ে পড়ার জন্যে। উঁইপোকার এসব উড়ান যৌন-বিহার বা নাপ্সিয়াল ফ্লাইট (Nuptial flight) নয় কারণ এদের যৌন-মিলন ঘটে মাটিতে নামার পর এবং সাধারণতঃ ডানা খসিয়ে দেবার পর। উঁইপোকার আরেকটি বৈশিষ্ট্য - ডানা খসাবার পর স্ত্রী ও পুরুষ উঁইপোকা একত্রে মাটিতে গর্ত খুঁড়ে বাসা বানায়, বিশেষ প্রকোষ্ঠে একত্রে আশ্রয় নেয় এবং একত্রে দীর্ঘ সময় বসবাস করে, পুরুষ মাঝে মাঝেই তার জীবদ্দশায় স্ত্রীর সঙ্গে যৌনমিলন করে। প্রথম বার স্ত্রী মাত্র 15-20 টি ডিম দেয় যার কিছু আবার বাবা-মা খেয়ে ফেলে; ডিম দেওয়ার হার ক্রমশঃ বাড়ে এবং পরবর্তী তিন-চার বছর পর্যন্ত সময়ে প্রতিদিন কয়েক হাজার ডিম পাড়ে। অনগ্রসর গণভুক্ত উঁইপোকাদের বাসা ছোট বাসা প্রতি সদস্য কম কিন্তু অগ্রসর অনেক প্রজাতিতে একজোড়া রাজা-রাণী থেকে কয়েক লক্ষ সদস্যের পরিণত বড় বাসা কালক্রমে তৈরী হতে পারে। গোড়ার দিকে প্রজননক্ষমতাহীন জাত-উপজাতের সদস্যই শুধু সৃষ্ট হয়। রাজা-রাণীর আয়ুষ্কাল প্রায় সমান এবং এমন বাসাও দেখা যায় যেখানে একটি রয়েল চেম্বারে বাস করে **একটিমাত্র রাজা এবং 2-3 টি রাণী**; অবশ্য এ ব্যতিক্রমী। সাধারণতঃ উঁইপোকা বাসাও মনোগাইনিক (monogynic) এবং পরিণত, বিশালদেহী, ডানাহীন, স্থবির রাণী তার রাজা-উঁইপোকাটি সহ বাসার গভীরে রয়েল চেম্বারে বাস

করে। পরিণত উইপোকা বাসার স্থায়ীত্ব উল্লেখযোগ্য – বংশ - পরম্পরায় রক্ষিত এসব বাসা 40-100 বছরের পুরানো হতে পারে। জাত-উপজাত গঠনের যে জৈবিক পদ্ধতি উইপোকায় সক্রিয় তা অন্যান্য সামাজিক পতঙ্গে সক্রিয় তা অন্যান্য সামাজিক পতঙ্গে সক্রিয় পদ্ধতি থেকে পৃথক। এক সময়ে উইপোকার জাত গঠনে সেক্স-ক্রোমোজোমের ভূমিকা প্রধান বলে গণ্য হোত (এদের শুক্রকোষের ক্রোমোজোমের ব্যাপারে সমসংখ্যার দুটো দশা - Ax যুক্ত এবং A যুক্ত কিন্তু অনিষিক্ত ডিমের শুধু Ax দশা বা ডিম্ব নিষিক্ত হবার পর স্ত্রী ও পুরুষ সমসংখ্যায় সৃষ্টি করে থাকে)। কিন্তু বর্তমানে এ ব্যাপারে ফেরোমোন, হর্মোন ও পরিবেশের প্রভাবকে কারক-উপাদানরূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। কেলোটার্মিস (*Kalotermes*) গণভুক্ত উইপোকাদের উপর নিশ্চিৎ গবেষণা করে ফেরোমোনের ভূমিকা সম্বন্ধে বিশদ আমরা জেনেছি এবং উদ্দীপক ও নিস্তেজকভাবে ক্রিয়াশীল এসব উপাদানই উইপোকার জাত-উপজাত গঠনে প্রধান ভূমিকা নেয়।

b) **বাসা নির্মাণের ধরণ ও আচার-আচরণ** - আদিম গোষ্ঠীর উইপোকারা কাঠ খায় এবং প্রকৃত বাসা বানায় না; এরা কাঠের টুকরো বা কাঠের কোন পরিকাঠামোয় গ্যালারী (সুরঙ্গপথ) বা টানেলের মত সরু পথ এলোপাথাড়ী করে খুঁড়ে তার মধ্যে থাকে। অন্যান্য উইপোকারা তাদের পাকা বাসা বানায় মাটিতে, সাধারণতঃ মাটি খুঁড়ে; এদের এসব বাসাকে বলা হয় টার্মিটেরিয়া (Termitaria; Sing Termitarium)। মনুষ্যেতর কোন প্রাণীর নির্মাণ-শৈলী যে উৎকর্ষমানের ও প্রয়োজনভিত্তিক হতে পারে, উইপোকা-নির্মিত টার্মিটেরিয়াম তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। উইপোকার বাসা পুরোপুরি মাটির নীচে সুড়ঙ্গপথ ও প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে নির্মিত হতে পারে; তার সঙ্গে আবার যুক্ত হতে পারে মাটির ঢিপি বা মাউণ্ড (Mound) যার উচ্চতা ক্ষেত্রবিশেষে নয় মিটার পর্যন্ত হতে পারে। এত উঁচু ঢিপিযুক্ত টার্মিটেরিয়ামকে টার্মাইট হিল (Termite hill) বলা হয় এবং নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে এরা প্রাকৃতিক দিনারী হতে পারে। বালুকণার সঙ্গে স্বীয় লালারস ও মল মিশিয়ে টার্মিটেরিয়ামে প্রলেপ লাগায় উইপোকারা এবং শুকিয়ে এসব এত শক্ত হয় যে কোন কোন দেশের আদিবাসীরা খুব উঁচু টার্মিটেরিয়াম থেকে উইপোকাদের সম্পূর্ণ তাড়িয়ে দিয়ে নিজেদের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহার করে।

c) **খাদ্য ও পুষ্টি গ্রহণে আচার-আচরণ** - উইপোকার খাদ্য-সামগ্রী ও তার খাদ্যনালী-জাত করায় উল্লেখযোগ্য বৈচিত্র্য দেখা যায়। ওদেরকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায় - (a) ভালো বা ক্ষয়প্রাপ্ত, জীর্ণ কাঠ বা অন্যান্য উদ্ভিদাংশ যথা ঘাস, ছত্রাক, উদ্ভিদ মাটিতে পচে প্রস্তুত হিউমাস (Humus) খাদ্যবস্তু হিসাবে গ্রহণ করা (এটা সব গোষ্ঠীর উইপোকারাই খেয়ে থাকে; বস্তুতঃ এরা কাঠ-খেকো পতঙ্গ বা মার্জিত পরিভাষায় সেলুলোজ ইটিং / Cellulose eating পতঙ্গ নামে পরিচিত), b) কোন বাসার অন্য সদস্যরা যে খাবার তৈরী করে তা গ্রহণ করা (এ ব্যবস্থার নাম সোস্যাল ফিডিং / Social feeding) এবং দুভাবে - (i) স্টোমোডিয়াল ফিডিং (Stomodeal feeding) অর্থাৎ খাদ্যনালীর অগ্রভাগে প্রস্তুত বস্তু খাওয়া এবং (ii) প্রক্টোডিয়াল ফিডিং (Proctodeal feeding) অর্থাৎ খাদ্যনালীর পশ্চাদ্‌ভাগে প্রস্তুত বস্তু খাওয়া; প্রথমটিতে খাদ্যনালীর অগ্রভাগে উগরে ভিতর দিকের খাবার আনা ও তাতে লালা-রস মিশিয়ে নেওয়া; দ্বিতীয়টিতে মলাশয়ের শক্ত/ তরল বর্জ্যবস্তু (যাতে কাঠের কণা ও অন্ত্রের ফ্ল্যাজেলাবাহী এককোষী প্রাণী থাকে) খাদ্যবস্তু রূপে পরিগণিত এবং ওরকম অভ্যাস খাদ্যনালীর মাইক্রোব - নবীকরণার্থে উপকারী। উইপোকারা অন্য সামাজিক পতঙ্গদের মত খাদ্য-সংগ্রহে ছোট ছোট দলে বিভক্ত হয়ে চারিদিক ঘুরে বেড়ায়। ঘাস, পাইন গাছের কণা প্রভৃতি ছোট করে কেটে বাসায় আনে ওরা এবং হয় এগুলো সরাসরি খাওয়া হয় কিংবা স্তূপ করে সঞ্চিত রাখা হয়। ব্ল্যাক টার্মাইট নামে কথিত শ্রীলংকার একজাতের উইপোকা বিশেষ খাবার লাইকেন (Lichen) জাতীয় উদ্ভিদ সংগ্রহে যখন বেরোয় তখন তাদের দুপাশ থেকে ঘিরে পাহারায়

থাকে বাসার সৈনিকরা। ছত্রাক গজানো উঁইপোকা বাসার একটি সাধারণ কাজ এবং তা করতে ওরা ঘাস, কাঠের টুকরো, মল-মূত্র ইত্যাদি চটকে মিশিয়ে স্পঞ্জের মত বস্তু জানায় এবং ওা স্বীয় প্রকোষ্ঠে রাখে; এতে ছত্রাক গজায়।

পিপীলিকার মত উঁইপোকারও তাদের বাসায় অন্য প্রাণীদের থাকতে দেয় (অন্যান্য পতঙ্গ) এবং সম্পর্কের ধরণে ওরকম মিলও দেখা যায়। এদের পরিভাষাগত নাম টার্মিটোফিল্‌স (Termitophiles) এবং এদের প্রতি উঁইপোকাদের আচার-আচরণ খুবই আকর্ষণীয়, অনেকটাই মির্মিকোফিল্‌সদের প্রতি পিপীলিকাদের যেমন তেমনই।

14.5 সারাংশ

বর্তমান এককটির পঠন ও অনুধাবনে জানা যায় যে বিশাল পতঙ্গ-জগতের বহু বৈচিত্র্যময় বিষয়ের মধ্যে ওদের কিয়দংশের নিঃসঙ্গ একক জীবন-যাপন দশা থেকে সমাজবদ্ধ জীবনে উত্তরণ পৃথকভাবে বিবর্তিত হওয়া এমন এক দশা যা ওদের অন্য প্রাণী-গোষ্ঠীর তুলনায় পরিবেশে স্বীয় প্রাধান্য বিস্তারের সহায়ক। সমাজবদ্ধ হবার সুরু থেকে তার পূর্ণতা প্রাপ্তি পর্য্যন্ত সংশ্লিষ্ট পতঙ্গ-গোষ্ঠীতে এর দরুণ বিকাশ ঘটেছে এমন সব রীতি-নীতি ও আচার-আচরণের যা নিঃসঙ্গ বা অন্যভাবের একক জীবনের পতঙ্গের থেকে সম্পূর্ণ আল ।। আমরা এসবের যে বিবরণ পৃষ্ঠাগুলোতে দিয়েছি তার সারাংশ সব বিষয়টি এক নজরে দেখে নেওয়ার জন্যে নীচে লিপিবদ্ধ করছি ঃ 1) সমাজবদ্ধ পতঙ্গের আকর্ষণীয় আচার-আচরণ এসব প্রধান বিষয়গুলোকে কেন্দ্র করে যেমন a) সামাজিক জীবনের প্রাকৃতিক আয়তন, b) একসঙ্গে অনেকে থাকার জন্যে বাসা বানানো ও খাদ্যের সন্ধান, সংগ্রহ, সঞ্চয় ও পারস্পরিক আদান-প্রদানে 'মিলে-মিশে' ব্যবস্থা, c) পতঙ্গভুক ও অন্যান্য শত্রু থেকে আত্মরক্ষা, d) যোগাযোগের নানা ধরণ, e) প্রজনন-ক্রিয়া এবং সমাজবদ্ধ প্রজাতির বহুরূপ-বিকাশ অর্থাৎ জাত-উপজাতে বিভাজন প্রভৃতি।

2) সমাজবদ্ধ জীবন পতঙ্গে প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন ধাপের মধ্য দিয়ে স্বাধীনভাবে বিবর্তিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ দশায় আয়ুষ্কালের বৃদ্ধি এবং পরবর্তী প্রজন্মের প্রতি পূর্ণাঙ্গদের যত্ন নেবার (প্যারেন্টাল কেয়ার) মাত্রার বৃদ্ধি ও দুয়ে মিলে পতঙ্গে সমাজজীবনের বিকাশ ঘটিয়েছে। এ বিষয়ে পতঙ্গে বিবর্তনের মধ্যবর্তী প্রধান ধাপগুলো হোল - a) বিচরণশীল য গ্রিগেরিয়াস (সঙ্গপ্রিয়) (gregarious) পতঙ্গ ও পতঙ্গ-সদৃশ, প্রাণী উড লাউস নামক (wood louse) পতঙ্গ সদৃশ ক্রাস্টেশিয়া, শ্রেণীভুক্ত প্রাণী মাটিতে পড়ে থাকা কোন কাঠের খুঁটির নীচের দিকে ভীড় করে; পঙ্গপালের বিচরণশীল দশা। (b) সাব-সোস্যাল বা অর্ধ-সামাজিক দশার পতঙ্গ যারা ডিম পেড়ে অপরিণতদের জন্যে খাবারের ব্যবস্থা করে তাদের লালন-পালনও করে দৃঃ স্ত্রী গুবরে পোকা (ডাং বীট্‌ল্‌)।

পূর্ণ/প্রকৃত সমাজবদ্ধ জীবন (আধুনিক পরিভাষায় যাকে আমরা বলি য়্যু-সোস্যাল লাইফ) দেখা যায় কেবলমাত্র দুটি বর্গের পতঙ্গে - হাইমেনোপ্টেরা বর্গ ও আইসোপ্টেরা বর্গ (Hymenoptera/Isoptera)।

3) আইসোপ্টেরা উঁইপোকাদের বর্গ যারা ডানাহীন ক্রিপ্টোসার্কিড (Cryptocercid) আরশোলার মত কাঠ খায় যা হজমের কারক সেলুলোজ উৎসেচক (cellulase) ওদের পৌষ্টিক নালীতে থাকা এক ধরণের সিমবায়ন্ট প্রোটোজোয়া থেকে মেলে এবং এসব প্রোটোজোয়া পায়ুদেশের খাদ্য-বিনিময় প্রক্রিয়ায় পরস্পরের

মধ্যে বংশানুক্রমে সঞ্চালিত হয়ে থাকে। এরকম আবশ্যিক এক প্রক্রিয়া থেকে উইপোকাতে সামাজিকতা বিকাশলাভ করে দুটো ধারায় - a) সমসমাজবদ্ধ জীবনধারায় প্যারাসোস্যাল সিকোয়েন্সে (Parasocial sequence) যার উন্নততর মানে কোয়াসি-সোস্যাল (quasi-social) জীবনধারায় এবং পরে সেমিসোস্যাল (semi-social) জীবনধারায়; b) সাব-সোস্যাল জীবনধারার প্রথম ধাপ প্রিমিটিভলি সাব-সোস্যাল ও পরের ধাপ ইন্টারমিডিয়েট সাব-সোস্যাল ধাপ বা সাব-সোস্যাল I; এর পরের ধাপে (সাব-সোস্যাল II) এক প্রজন্ম পরের প্রজন্মের সঙ্গে আরো নিবিড় ও স্থায়ী সম্পর্ক স্থাপন করে। বিবর্তনের এই ধাপগুলোর পর্যায়ক্রমিক বিকাশের সংক্ষিপ্তসার ঃ

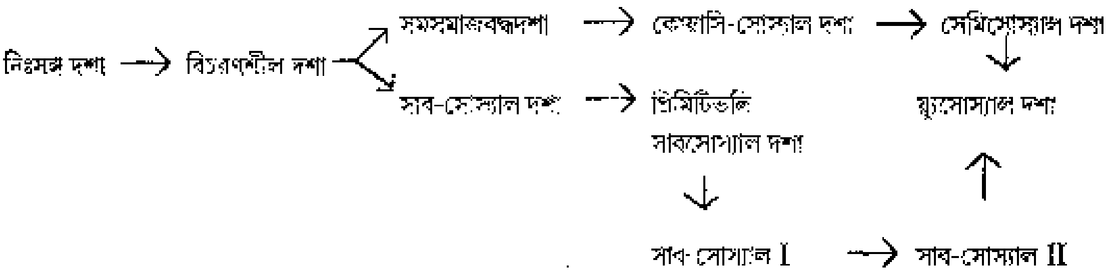

4) হাইমেনোপ্টেরার মাত্র তিনটি গোষ্ঠী যথা বোলতা (ওয়াস্প / wasp) ও সমজাতের পতঙ্গ, পিপীলিকা ও মৌমাছি পূর্ণমানের য়্যুসোসাল জীবন-যাপন করে। অবশ্য বোলতা ও সমতুল পতঙ্গ তিনটি পরিবারে বিভক্ত - য়্যুমেনিডি (Eumenidae) বোলতা বিবিধ স্তরের সমাজ-জীবনে অভ্যস্ত, স্ফেকিডি (Sphecidae) বোলতা মাটিতে বাসা বানায় ও অর্ধ-সমাজবদ্ধ জীবনে অভ্যস্ত এবং ভেস্পিডি (vespidae) বোলতা যাদের অধিকাংশই য়্যুসোস্যাল। একক দশার জীবনকাটায় এমন বোলতা প্রজাতিতে গণ-সঞ্চয়ের (মাস প্রভিশানিং /mass provisioning) অভ্যাস বর্তমান এবং এদের অন্য কিছু প্রজাতিতে দেখা যায় আরেকটু উন্নত মানের অভ্যাস যা প্রোগ্রেসিভ প্রভিশানিং (progressive provisioning) নামে চিহ্নিত।

5) অধিকাংশ বোলতা প্রজাতি আহৃত কাঠের দানার সঙ্গে নিজের লালা মিশিয়ে মণ্ড বানায় এবং তা দিয়ে পাতলা কাগজের মত পাত বানিয়ে (বোলতা-কাগজ /wasp-paper) ঘর-বাড়ির দেয়ালে বা কার্নিশে প্রকোষ্ঠযুক্ত বাসা তৈরী করে। বোলতা-বাসায় পুরুষ, স্ত্রী ও শ্রমিক এরকম তিনটি জাতের বোলতা থাকে এবং বাসা হয় প্লিওমেট্রোটিক (pleometrotic) অর্থাৎ স্থায়ী বাসা বা হ্যাপ্লোমেট্রোটিক (haplometrotic) অর্থাৎ মাত্র একটি ঋতু-কালের বাসা; বোলতা-বাসা মনোগাইনিক (monogynic) অর্থাৎ বাসায় একটি মাত্র সক্রিয় পূর্ণাঙ্গ-দেহী স্ত্রী থাকে।

6) বম্বিনি (Bombinae) উপপরিবারের মৌমাছি যারা চলতি পরিভাষায় বাম্বেল বী / হাম্বেল বী (bumble bee/humble bee) নামে পরিচিত বোলতার সমতুল মানের সমাজজীবনে অভ্যস্ত। কার্ডার বী নামক বাম্বেল বী'র বাসা বানানো ও তা চালু রাখার পদ্ধতি বিচিত্র ও ভিন্ন ধরণের। বম্বাস (Bombus) গণভুক্ত মৌমাছি অসম প্রকোষ্ঠের বাসা বানায় এবং ওদের রাণীকে অন্য প্রজাতির রাণী হুলের সাহায্যে মেরে নিজেকে বাসায় প্রতিষ্ঠিত করে ও ডিম পেড়ে তা থেকে নতুন প্রজন্ম বানিয়ে বাসার দখল নেয়। পূর্ণমানের সামাজিক জীবন অর্থাৎ য়্যুসোস্যাল লাইফ যাপন করে এপিনি (Apinae) উপপরিবারের মৌমাছি যার বহুল-পরিচিত দৃষ্টান্ত রক-বী বা এপিস ডর্সাটা (Rock bee/*Apis dorsata*), ইন্ডিয়ান-বী বা এপিস ইন্ডিকা (Indian bee/*A. indica*) প্রভৃতি।

7) য়্যুসোস্যাল মৌমাছি-প্রজাতি গাছের উঁচু ডালে / বাড়ির উঁচু কার্নিশে বা দেয়ালে সাধারণতঃ ঝুলিয়ে রেখে বাসা (মৌচাক) বানায়; বহু প্রকোষ্ঠের এসব বাসায় কাজের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রকোষ্ঠগুলো ব্যবহৃত হয় যেমন মৌচাক কোথাও আটকে রাখার জন্যে একসারি প্রকোষ্ঠ, সঞ্চয়ী প্রকোষ্ঠ, অপরিণত দশা রাখার প্রকোষ্ঠ (যা আবার জাতের ভেদ অনুযায়ী অন্ততঃ তিনভাগে বিভক্ত) প্রভৃতি।

মৌচাকে পরিণত দশায় 40/50 হাজারের বেশী মৌমাছি থাকতে পারে। কাজের ভিত্তিতে এরা গঠিত এবং অন্ততঃ তিনটি জাতে বিভক্ত - a) রাণী বা স্ত্রী-মৌমাছি (Queen) ডিম পাড়ে ও নতুন মৌমাছির জন্ম দেয়। একটি বাসায় একটিই সক্রিয় রাণী থাকে, b) ড্রোন বা পুরুষ-মৌমাছি (Drone), রাণীর সঙ্গে যৌন মিলনে রত হয়ে ডিমের নিষিক্তকরণ সম্পূর্ণ করে এবং ঐ কাজের শেষে তার যৌনাঙ্গ বিচ্ছিন্ন হয়ে রাণী-দেহে লেগে থাকে এবং সে মারা যায়; মৌমাছিদের যৌন-মিলন ঘটে স্ত্রী ও পুরুষ মৌমাছির ঝাঁক বেঁধে ওড়ার সময়ে (যার নাম যৌন বিহার বা নাপসিয়াল ফ্লাইট / nuptial flight) **মৌচাক এক রাণী কেন্দ্রিক বাসা বা মনোগাইনিক (monogynic)**। c) ওয়ার্কার (worker) বা শ্রমিক - মৌমাছি, সংখ্যায় সর্বাধিক, প্রজনন ছাড়া অন্য সব কাজ করে এবং ব্যতিক্রমী ক্ষেত্রে কখনো কখনো ডিম পেড়ে প্রজনন ক্রিয়া চালু রাখে।

8) বী-ল্যাঙ্গুয়েজ (Bee language) বাইরে থেকে খাবারের খোঁজ করে আসা শ্রমিক-মৌমাছিদের দেহ ভঙ্গিমা সুলভ বিভিন্ন মুদ্রার সাহায্যে যোগাযোগ করার এক প্রয়াস - রাউন্ড ডান্স ও ওয়াগেল ডান্স (round and waggle dance) এসবের মুখ্য উপাদান। বাসার সক্রিয় রাণীর দেহ-নিঃসৃত কুইন সাবষ্ট্যান্সের গন্ধ থেকে শ্রমিকরা তার সুস্থতার খবর পায় এবং এ ক্ষরণ রাণীদেহ থেকে বন্ধ হলে শ্রমিকরা তাকে মেরে খেয়ে ফেলে বাসায় নতুন রাণীকে প্রতিষ্ঠা করে (সুপারসিডিউর /supersedure পদ্ধতি) অপরিণত দশার কোন একটিকে উপযুক্তভাবে পরিচর্যা করে। এসময়ের আচার-আচরণ উল্লেখযোগ্য। মৌমাছিতে জাত-গঠন করা হয় নিষিক্ত এবং অনিষিক্ত এ দুরকম ডিম থেকে অপরিণত সৃষ্টি করে এবং তাদের রয়েল জেলী নামক বিশেষ খাবার যথেষ্ট খেতে দিয়ে বা না দিয়ে (অনিষিক্ত ডিমজাত পুরুষ, নিষিক্ত ডিম থেকে স্ত্রী বা শ্রমিক রয়েল জেলী যথেষ্ট খেয়ে বা না খেয়ে)।

9) সামাজিক জীবন-যাপনকারী আরেক গোষ্ঠী পিপীলিকা-পতঙ্গ যথেষ্ট উন্নতমানের ও জটিল জীবন কাটায়। এদের অগ্রসর প্রজাতিসমূহে জাত-উপজাত অনেক প্রায় উনত্রিশটির মত যদিও প্রধান জাত-উপজাতের সংখ্যা সাত /আটটির মত - রাণী (কুইন/Queen- দুভাগে বিভক্ত ছোটমাপের মাইক্রোগাইনি ও বড়মাপের ম্যাক্রোগাইনি), পুরুষ (এনার /Aner এবং দুরকমের - মাইক্রেনার ও ম্যাক্রেনার) ও শ্রমিক (এরগেট / Ergct এবং দুরকমের- ওয়ার্কার মেজর / ম্যাক্রোগেট ও ওয়ার্কার মাইনর /মাইক্রেগেট; বড় মাথার বিশাল চোয়ালের শ্রমিকদের সৈনিক বা ডাইনার্গেট বলা হয় কারণ এরা বাসার হয়ে আক্রমণ ও আত্মরক্ষার কাজ করে ও শক্ত দানাদার খাবার ভেঙ্গে গুঁড়ো করে যাতে অন্যরা সহজে তা খেতে পারে।

10) পিপীলিকা-বাসার নাম ফর্মিকেরিয়াম / মির্মিকেরিয়াম। কিছু শিকারী পিপীলিকা গোষ্ঠী বাদে আর সবাই স্থায়ী বাসা বানায় - মাটিতে নানা ধরণের টানেল (সুড়ঙ্গ) ও প্রকোষ্ঠ পরস্পর সংলগ্ন করে এবং প্রবেশপথের ধার ঘেঁষে ছোট-বড় মাটির দানার ঢিপি বানিয়ে কিংবা উদ্ভিদ দেহের বিভিন্ন অংশে অনুরূপ টানেলিং করে। গাছের পাতা জুড়ে অনেক পাতার সমন্বয়ে গোলাকার বাসা বানানো কিছু পিপীলিকার বৈশিষ্ট্য। ভাঙ্গা চোরা শক্ত স্থানে কিংবা জঞ্জালের স্তূপেও অনেকে বাসা করে থাকে।

11) পিপীলিকা-বাসায় অনেক অন্য ক্ষুদ্রকায় প্রাণী (অন্য পতঙ্গ/মাকড়সা) সহাবস্থান করে (এদের নাম মির্মিকোফিল্‌স /Myrmecophiles) এবং হানি-ড্যু ক্ষরণকারী এফিড ও অন্যান্য পতঙ্গ খুব যত্ন নিয়ে নিজেদের বাসায় রাখে বা ওদের বাসস্থান পাহারা দিয়ে রাখে কারণ ঐ ড্যু-রস পিপীলিকাদের খুব প্রিয় খাদ্য।

12) পিপীলিকার স্ত্রী-পুরুষের যৌন-মিলন মৌমাছিদের মত নাপ্‌সিয়াল ফ্লাইটের মধ্যে সম্পন্ন হয় এবং জাত-উপজাত সৃষ্টি-পদ্ধতি ও মৌমাছিদের মত। পিপীলিকা-বাসা কিন্তু বহু রাণী-কেন্দ্রিক বা পলিগাইনিক (Polygynic) ।

13) কিছু পিপীলিকা গোষ্ঠী মাংসাশী কিন্তু অধিকাংশই উদ্ভিদাংশ-ভোজী যদিও এদের মধ্যে কিছু হানি-ড্যু নামক একজাতের পতঙ্গ-নিঃসৃত রসও খায়। হার্ভেস্টিং পিপীলিকা শস্য-দানা সংগ্রহ করে খায়। বিশেষ পদ্ধতিতে তাদের সঞ্চয়ও করে বাসায় এবং এদের এট্টিনি (Attini) জাতের পিপীলিকারা বাসার বিশেষ প্রকোষ্ঠে ছত্রাকের ও 'চাষ' করে কারণ ছত্রাক এদের প্রিয় খাদ্য। হানি-অ্যান্ট নামক পিপীলিকাদের বেশ কিছু শ্রমিক পুষ্প-মধু; হানি-ড্যু প্রভৃতি দিয়ে তাদের উদর মাত্রাতিরিক্ত ভাবে পূর্ণ করে (এরা হানি-পট শ্রমিক এবং বাসার খাদ্য-ভান্ডার) রিগার্জিটেট প্রক্রিয়া অর্থাৎ উগরে উদর থেকে তা বার করে বাসার অন্য সদস্যদের খেতে দেয়। মৌমাছির চেয়েও পিপীলিকা-শ্রমিকরা নিজ দেহ পরিষ্কার রাখার ব্যাপারে বেশী সচেতন। পরস্পরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষায় পিপীলিকার প্রধান উপায় সেন্ট-ট্রেইল ও এলার্ম ট্রেইল যা তাদের দেহ-নিঃসৃত প্রজাতি/বাসা ভিত্তিক বিশেষ গন্ধযুক্ত গ্রন্থিরস।

14) উইপোকাদের জাত-উপজাতের ধরণ মৌমাছি ও পিপীলিকাদের চেয়ে একটু আলাদা; অন্ততঃ ছটি জাত-উপজাতে বিভক্ত কোন উইপোকা প্রজাতির সদস্যরা তিনরকমের প্রজননে-সক্ষম জাত ও নিয়ে গঠিত এবং নুটো প্রধান অংশেই স্ত্রী ও পুরুষ উভয়ই কোনভাবে না কোনভাবে বর্তমান। ওদের মধ্যে লক্ষণীয় রাণী উইপোকা যা কোন বাসার একেল চেম্বারে একাধিক পুরুষ সহ দীর্ঘদিন বাস করে এবং সে হিসাবে উইপোকা বাসাও সাধারণতঃ মনোগাইনিক। পুরানো রাণীর উদর আভ্যন্তরীণ জননাঙ্গের মাত্রাহীন বৃদ্ধির জন্য বিশাল মাপের হয় এবং রাণী প্রায় স্থবিরত্ব প্রাপ্ত হয়। উইপোকার বাসায় সাধারণ চেহারার সৈনিক জাত নেই; বদলে যারা সৈনিক তাদের নাসুটে (Nasute) উইপোকা বলা হয়; এদের মাথা শুঁড়ের মত প্রলম্বিত এবং ছিদ্রযুক্ত যা দিয়ে বিশেষ গ্রন্থিরস ওরা শত্রুর দিকে ছুঁড়ে তাকে কাবু করে (এ রস শক্ত জিনিষ নরম করে দেয়)। উইপোকার যৌন-মিলন উড্ডীয়মান দশায় ঘটে না যদি ও ঝাঁক বেঁধে ওড়ায় এদের তুলনা নেই অর্থাৎ ওদের ফ্লাইটগুলো সোয়ার্মিং মাত্র, নাপ্‌সিয়াল ফ্লাইট নয়।

15) মাটিতে ছোট-বড় নানা মাপের ঢিপি বানিয়ে মাটি খুঁড়ে টানেল ও প্রকোষ্ঠের বাসা বানানো উইপোকার বৈশিষ্ট্য। এসবের দেয়ালে ওরা লালারস, মল ও বালু/ মাটি কণার মিশ্রিত প্রলেপ লাগায় যা শুকিয়ে গেলে দেয়াল সিমেন্টের মত শক্ত হয়। এদের বাসা দীর্ঘস্থায়ী, 40-100 বৎসর পর্যন্ত কয়েক প্রজন্ম ওতে বাস করে। কিছু উইপোকা পাথর /সিমেন্টের গঠনেও বাসা বানাতে পারে। কাঠজাত জিনিষে উইপোকারা পাকা বাসা বানায় না যদিও তাতে টানেলিং করে (সুড়ঙ্গ খোঁড়া) সাময়িকভাবে থাকা আমরা দেখি। এদের স্থায়ী বাসার নাম টার্মিটেরিয়াম (Termitarium) ।

16) কাঠ-খেকোর জাত উইপোকার পাকস্থলীতে সেলুলোজ হজম করার এনজাইম ক্ষরণকারী প্রোটোজোয়া প্রাণী সিমবায়ন্টরূপে থাকে এবং সব সদস্যে ও বংশ পরম্পরায় এসব এককোষীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে এক বিশেষ খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি ওদের মধ্যে দেখা যায় যার নাম সোস্যাল ফিডিং ব্যবস্থা।

14.6 সর্বশেষ প্রশ্নাবলী

1) অল্পকথায় নিম্নোক্ত প্রসঙ্গ / শব্দের ব্যাখ্যা দিন ঃ

a) নাপ্সিয়াল ফ্লাইট
b) গ্রিগেরিয়াস পতঙ্গ
c) টার্মিটেরিয়াম
d) ড্রোন মৌমাছি
e) রাউন্ড ড্যান্স ও টেইল-ওয়াগিং ড্যান্স
f) প্লেসিওবায়োসিস

2) পিপীলিকার গ্রুমিং (grooming) বলতে কি বোঝায়? কিভাবে একটি শ্রমিক-পিপীলিকা তা সম্পন্ন করে?

3) সংক্ষেপে বিবিধ মির্মিকোফিল্সদের (Myrmecophiles) বিষয়ে আলোচনা করুন।

4) শ্রমিক পিপীলিকা গাছে যেসব বাসা বানায় তার মধ্যে অন্তত দুটি আকর্ষণীয় ধরণের বাসার নাম ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন (সচিত্র)।

5) উইপোকাতে সমাজবদ্ধ জীবনের বিভিন্ন ধাপের দেখা মেলে এবং দুটো পথ বেয়ে নিঃসঙ্গ, একক দশা থেকে য়্যুসোস্যাল লাইফে উত্তরণ ঘটেছে তাদের - সংক্ষেপে এ বক্তব্যের ব্যাখ্যা করুন।

6) সমাজবদ্ধ জীবনের সুযোগ-সুবিধা কি এবং কেন - অল্পকথায় বলুন।

14.7 উত্তরমালা

সূত্র-নির্দেশ -

(1a) য়ের জন্য মৌমাছি / পিপীলিকার যৌন-মিলন সংক্রান্ত অংশটুকু দেখুন। উইপোকাতে এ ঘটে না, তারও উল্লেখ দরকার; (1b) য়ের উত্তর দেখুন 14.3-আ অংশে; (1c) য়ের উত্তর পাবেন 14.4- আ অংশে, উইপোকার বাসস্থানের ব্যাখ্যায়; (1d) য়ের উত্তর দেখুন 14.4-A 2 অংশে, জাত-উপজাতের বিবরণে। (1e) য়ের উত্তর দেখুন 14.4-A 2 অংশে মৌমাছি শ্রমিকদের যোগাযোগ বিধির বিবরণে; (1f)য়ের উত্তর দেখুন 14.4-A 3 অংশে, পিপীলিকাদের বাসা নির্মাণের আচার-আচরণের বিবরণে। (2) য়ের উত্তর দেখুন 14.4-A 3 য়ে যেখানে পিপীলিকার একক ভিত্তিক আচার-আচরণ বলা হয়েছে (প্রসঙ্গত সোস্যাল গ্রুমিংয়ের উল্লেখ করবেন); (3-4)14.4 -A 3 দেখুন; (5) 14.3-D দেখুন (6) 14.2 দেখুন এবং অন্যান্য অংশ থেকেও সংগ্রহ করুন।

অনুশীলনী 2 : 14.4 য়ে বর্ণিত বিবরণ যা মুখ্যত পূর্ণ সমাজবদ্ধ জীবনের (অর্থাৎ য়্যুসোস্যাল) পতঙ্গদের জীবন-ধারা ও আচার আচরণ নিয়ে লেখা তা ভালো করে পড়ে নিম্নোক্ত প্রশ্নাবলীর যথোচিত উত্তর দিন ঃ-

(1) অল্প কথায় ব্যাখ্যা করুন ঃ-

(a) মাস প্রভিশনিং (Mass provisioning), (b) ট্রোফ্যালাকসিস (Trophallaxis)

(c) সেন্ট-ট্রেইল (Scent trail) (d) কার্টন নেষ্ট (Carton nest)

(e) সোস্যাল ফিডিং (Social feeding) (f) বী-ল্যাঙ্গয়েজ (Bee-language)

[উত্তর সূত্রঃ -পর্যায়ক্রমে দেখুন এসব পতঙ্গের বিবরণ যথা - বোলতা, মৌমাছি ও পিপীলিকা, পিপীলিকা, পিপীলিকা, মৌমাছি - তার মধ্যে প্রয়োজনীয় উত্তর পাবেন]

(2) তিন সারি দেখানো হয়েছে। প্রথম দুটোতে ক্রমিক সংখ্যা বা অক্ষর দ্বারা চিহ্নিত করে পাশাপাশি রাখা হয়েছে শব্দের সম্ভার। এসব থেকে প্রথম সারির কোন শব্দ দ্বিতীয় সারির কোন শব্দের সঙ্গে সাযুজ্য (matching) তা ক্রমিক সংখ্যা/অক্ষর সাজিয়ে তৃতীয় স্তরে লিখে জানান (প্রথমটা নমুনা-উত্তর) ঃ-

প্রথম সারি	দ্বিতীয় সারি	তৃতীয় সারি (উত্তর লেখার সারি)
(1) রয়েল জেলী	(a) শ্রমিক মৌমাছি	(উঃ) 1 -h
(2) সুপার সিডিউর	(b) রাণী মৌমাছির সংখ্যা মৌচাকে	(উঃ)
(3) টেইল ওয়াগিং	(c) প্ল্যান্ট লাইস	(উঃ)
(4) নাসুটি সৈনিক	(d) উইপোকা	(উঃ)
(5) হানি-ড্যু	(e) পিপীলিকা	(উঃ)
(6) মির্মিকোফিল্স	(f) পিপীলিকা	(উঃ)
(7) মোল্ড	(g) উইপোকা	(উঃ)
(8) ফর্মিকেরিয়াম	(h) স্ত্রী-মৌমাছি (রাণী)	(উঃ)

চিত্র - পরিচিতি

রেখ-চিত্র 1a-1b ঃ রেড-ট্রি-অ্যান্ট ইকোফাইলা গাছের পাতা টেনে পরস্পর সংবদ্ধ করে নিচ্ছে ও অন্যরা শূককীট মুখে করে তার দেহনিঃসৃত রস রেশম-সূতোর মত ব্যবহার করে পাতাগুলোকে স্থায়ীভাবে আটকে দিয়ে বড় গোলাকৃতির পাতার বাসা বানাচ্ছে।

রেখ-চিত্র 2a-2b ঃ পাথরের টুকরোর নীচেই মাটিতে অগভীর করে চারপাশে ছড়ানো টানেল (অর্থাৎ সুরঙ্গ)করে বানানো পিপীলিকার বাসা (2a পাথর চাপা অবস্থায় পাশ থেকে আঁকা, 2b পাথর সরিয়ে উপর থেকে আঁকা)।

রেখ-চিত্র 3 ঃ মাটি খুঁড়ে বাইরে ঢিপি বানায় যে পিপীলিকা তার বাসা গর্তমুখ থেকে নীচে কিছুটা গভীরে যায় ছড়ানো টানেল (সুরঙ্গ) ও প্রকোষ্ঠ নিয়ে।

রেখ-চিত্র 4 ঃ গাছের ডাল ঘিরে মাটির কণা ও দেহ-নিঃসৃত রস মিশিয়ে পাতলা কাগজের মত ছোট ছোট পাত তৈরী করে তার আবরণে বানানো কার্টন / পেপার নেষ্ট।

রেখ-চিত্র 5 ঃ গাছের কাণ্ডের ভেতরকার কলা নষ্ট করে খোঁড়ল বানিয়ে বাসা করে কিছু পিপীলিকা; এখানে সেখানে ফুটো করে খোঁড়লের বাসায় যাতায়াতের সহজ ব্যবস্থা করে নেয় ওরা।

রেখ-চিত্র 6 ঃ মাটির ভেতরে বাসা করে যেসব পিপীলিকা তাদের কিছু বাসার বিশেষ প্রকোষ্ঠে ওদের ভক্ষ্য ছত্রাক-বিশেষের উৎপাদনের ব্যবস্থা রাখে; এমনি কয়েকটি প্রকোষ্ঠে সম্পূর্ণ বিকশিত ছত্রাক প্রকোষ্ঠ ও ছত্রাক-খেকো আট্টা (*Atta*) গণভুক্ত পিপীলিকা-বাসার রেখ-চিত্র।

রেখ-চিত্র 7a-7d ঃ হানি-অ্যান্ট পিপীলিকারা ফুল থেকে মধু বা এফিড থেকে হানি-ডু সংগ্রহ করে স্বীয় উদরে ভর্তি করে চলে; পর্দার মত নমনীয় ঢাকনা দিয়ে তৈরী উদর রবারের মত বেড়ে চলে। উদরের আকার হয় বিশাল এবং তার উপর ও নীচের দিকের শক্ত সরু পাতগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে দূরে দূরে স্থিত হয়। এরকম স্ফীতোদর দশা খাদ্য-সঞ্চিত রাখার একটি ব্যবস্থা এবং এরকম পিপীলিকাদের হানি-পট পিপীলিকা বলা হয় (7a)। এরা বাসার ভেতরে প্রশস্ত স্থানের সিলিংয়ে (অর্থাৎ ছাতের ভিতর দিকে) একত্রে সংলগ্ন থাকে (7b - 7c) এবং থেকে থেকে নীচে নামে যখন ক্ষুধার্ত অন্য সদস্যরা এদের কাছে খাবার চায় এবং ওরা খাবার উগরে (রিগার্জিটেট / regurgitate করে) খাওয়ায় (7d)।

(N.B.- পিপীলিকা - সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় রেখ-চিত্রের জন্যে 11 নম্বর এককে প্রদত্ত পতঙ্গদের রেখ-চিত্র সমূহ দেখুন)

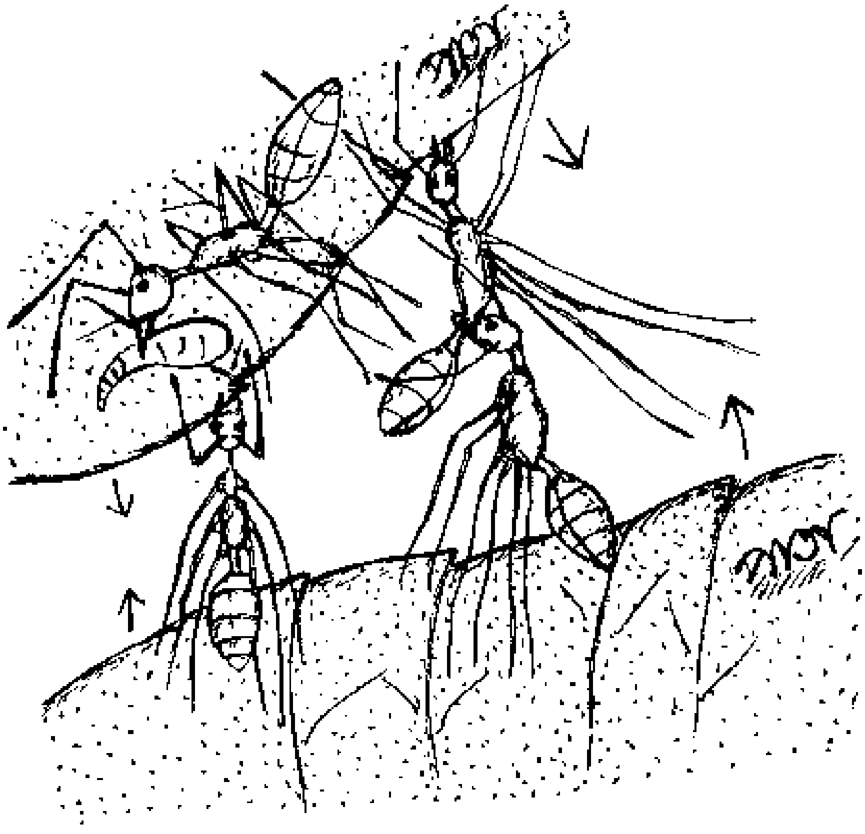

1a

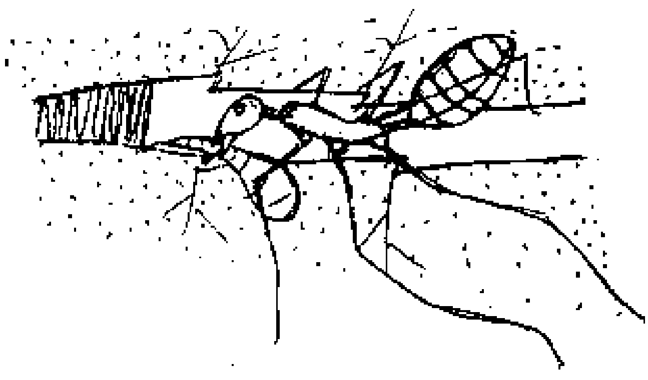

1b

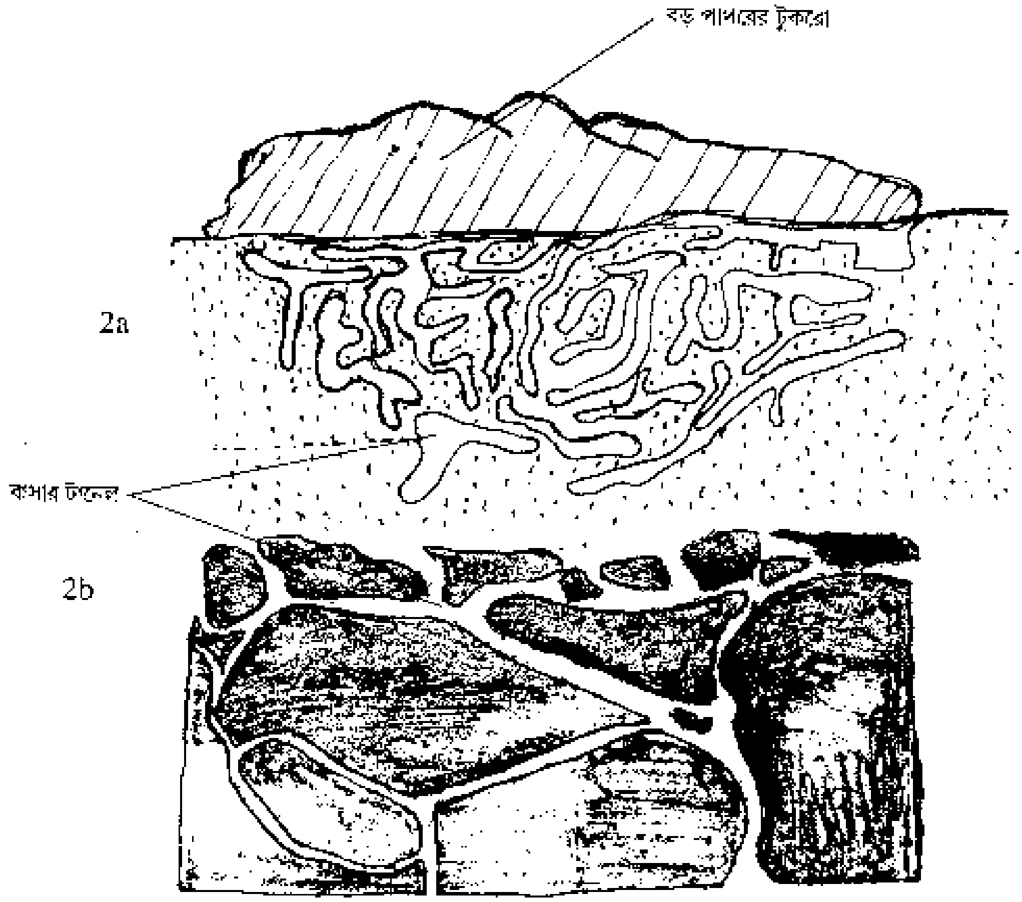

2a & 2b

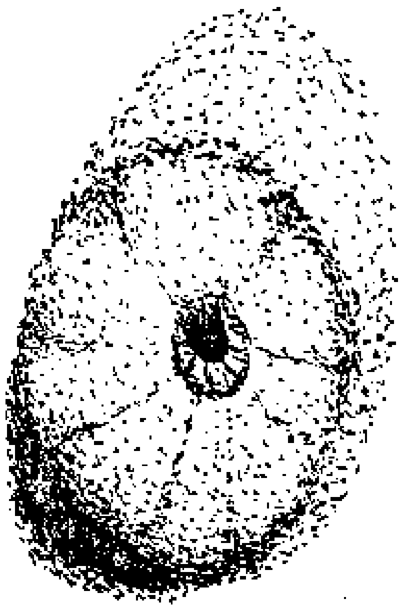

3

4

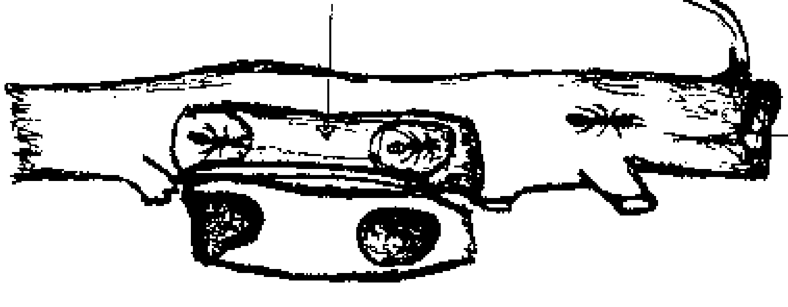

5

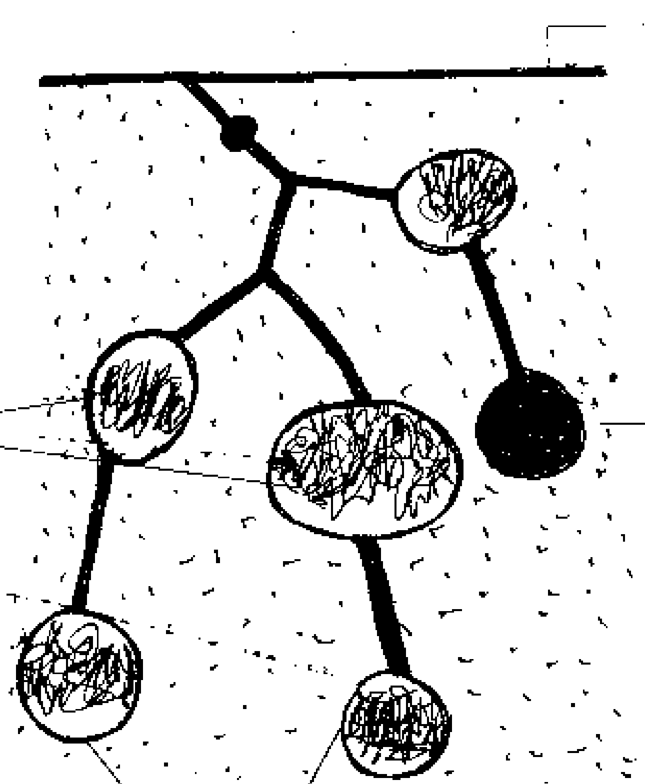

6

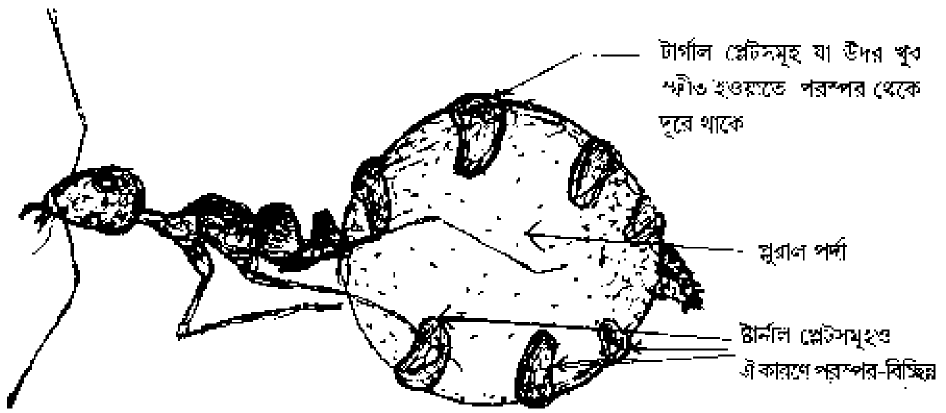
টার্গাল প্লেটসমূহ যা উদর খুব স্ফীত হওয়াতে পরস্পর থেকে দূরে থাকে
প্লুরাল পর্দা
স্টার্নাল প্লেটসমূহও ঐ কারণে পরস্পর-বিচ্ছিন্ন

7a

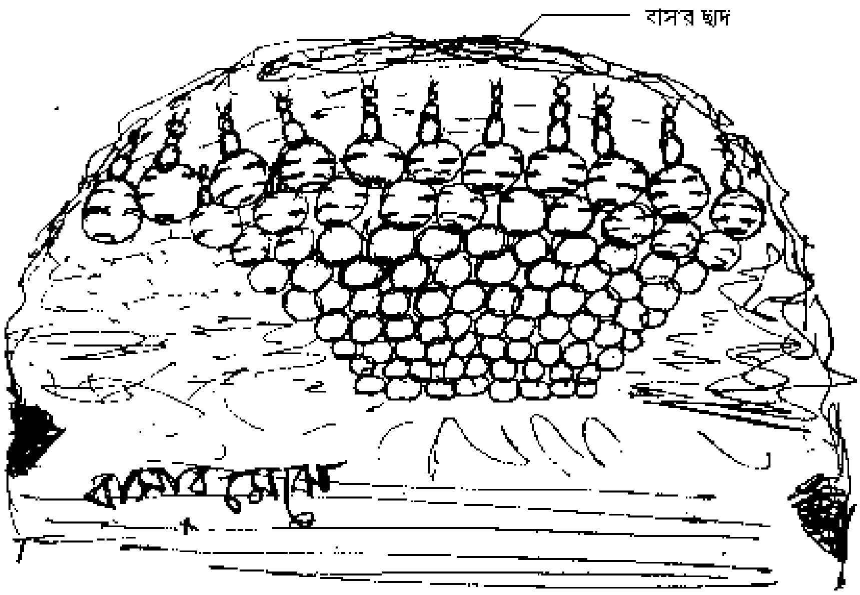
বাসার ছাদ
বাসার মেঝে

7b

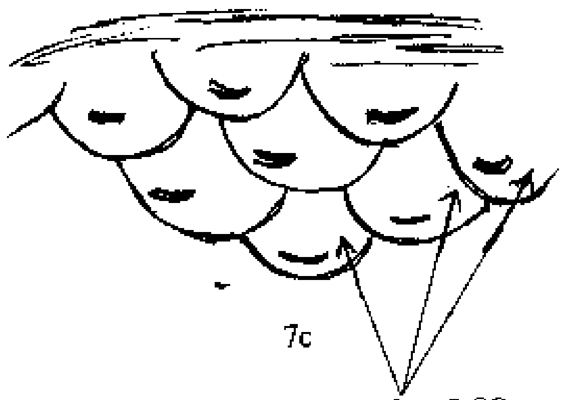

7c

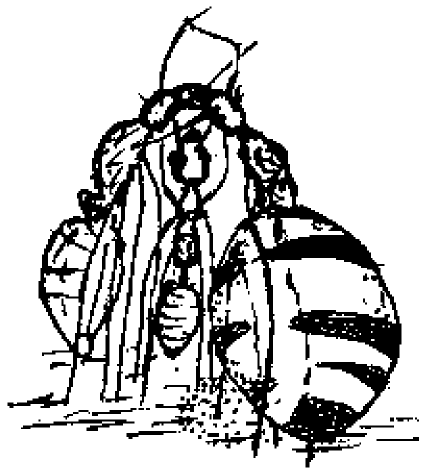

7d

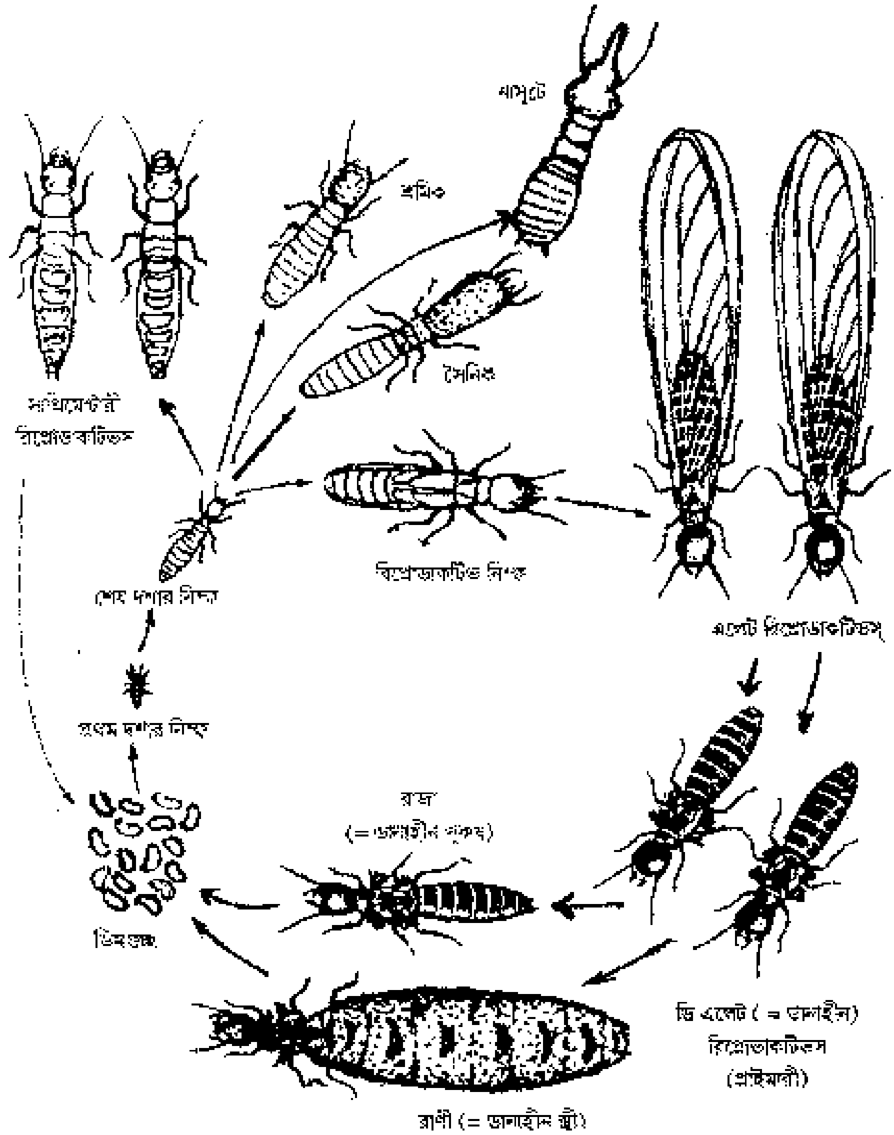

চিত্র নং -14.8 : উইপোকায় জাত-উপজাতের চেহারা ও সম্ভাব্য পারস্পরিক সম্পর্ক (ডিম জাত 'দশা' থেকে)।

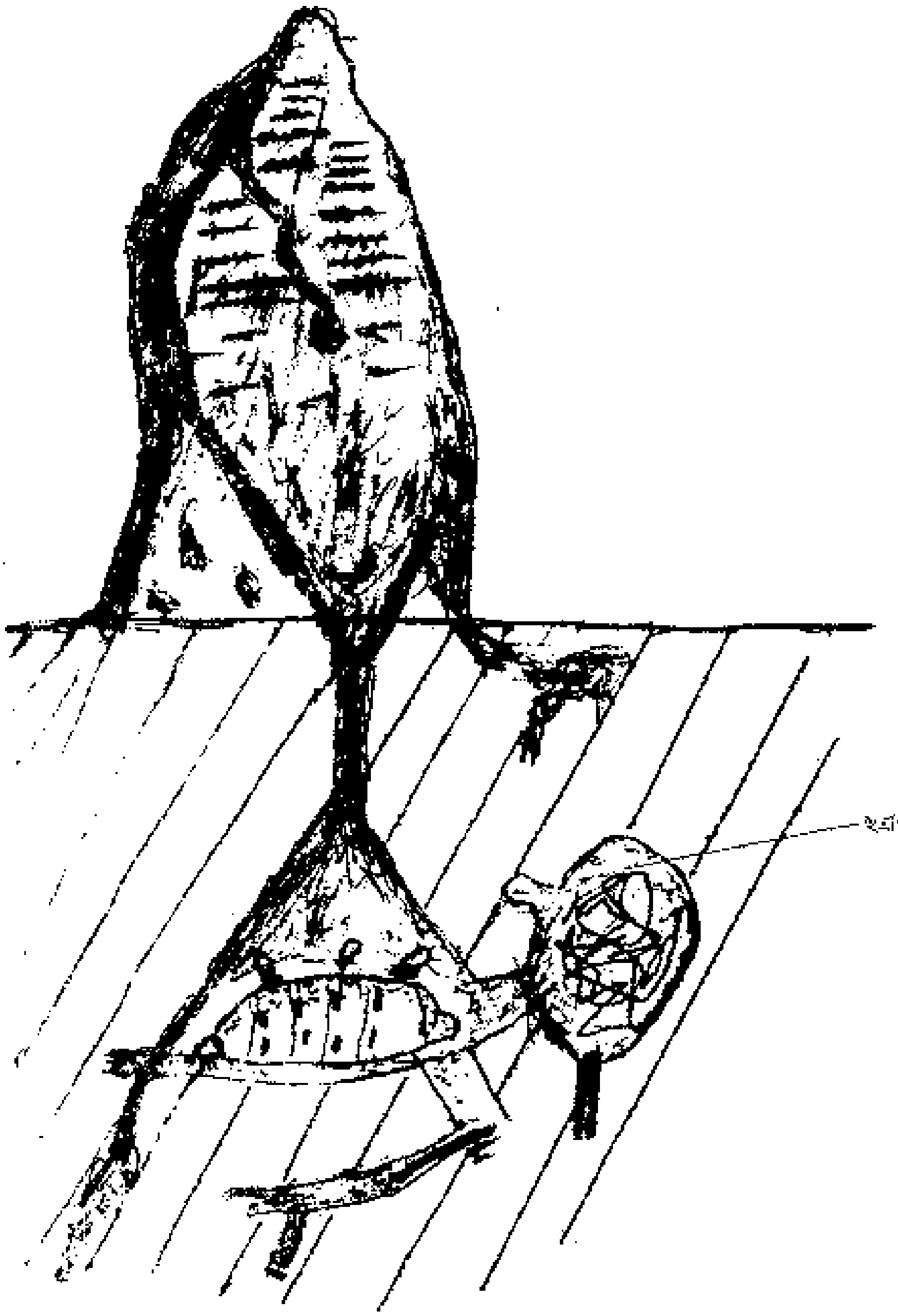

চিত্র নং -14.9 : টার্মিটেরিয়াম -মোউন্ডসহ মাটির গভীরে উঁইপোকা বাসা : ডানাহীন, বিশালভাবে স্ফীতোদরা পরিণত রাণী তার রাজা (কিং) ও শ্রমিক 'উঁইপোকা সহ' রয়েল চেম্বারে প্রতিষ্ঠিত (আনুমানিক ছেদ করে বাসার সম্ভাব্য চেহারা দেখানো হয়েছে।)

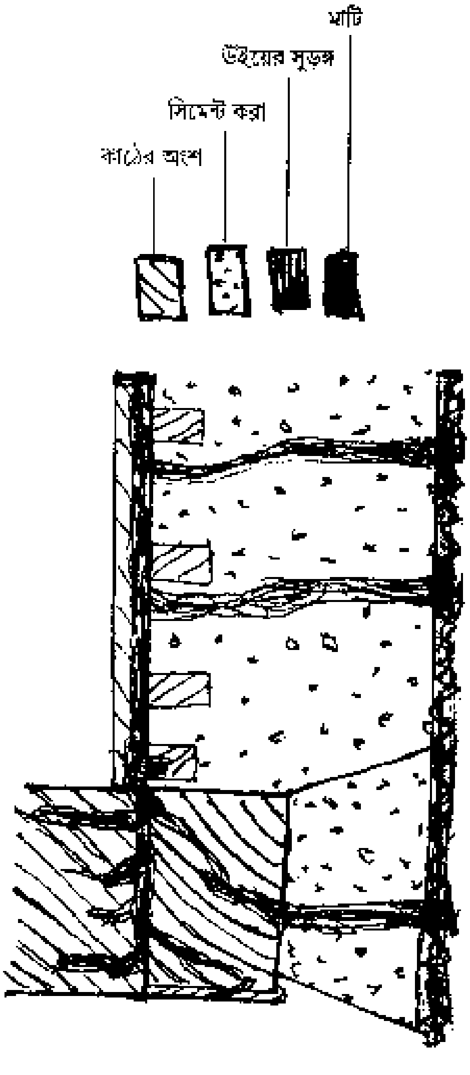

চিত্র নং -14.9a ঃ কাঠ সিমেন্টের কোন জিনিষে কি করে মাটির উঁইয়ের বাসা প্রসারিত তা দেখানো হয়েছে।